ডাক্তারকে টাকা না দিয়ে

সুজাতা মুখোপাধ্যায়

দীপ প্রকাশন।। কলকাতা ৭০০ ০০৬

ডাক্তারকে টাকা না দিয়ে

DACKTERKA TAKA NA DIYE

by *Sujata Mukhopadhaya*

[illegible] PUB[illegible]

[illegible].B.R.L.F. NO.

[illegible] NO. (R.R.R.L.F./GEN.) 73831

প্রকাশক : শংকর মণ্ডল

দীপ প্রকাশন, ২০৯এ বিধান সরণি কলকাতা ৭০০ ০০৬

বর্ণসংস্থাপন : আই. ই. আর. ই. ২০৯এ বিধান সরণি কলকাতা ৭০০ ০০৬

মুদ্রক : লক্ষ্মীনারায়ণ প্রেস ২০৯এ বিধান সরণি কলকাতা ৭০০ ০০৬

দাম : ৯০ টাকা

মা ও বাবা-কে

লেখকের কলমে

নার্সিংহোম চালাতে গিয়ে অনেককিছু চোখে পড়ে প্রতিদিন। ঘনিষ্ঠ কেউ অসুস্থ হলে কী ভীষণ অসহায় হয়ে পড়ে তাঁর আত্মীয়স্বজন। প্রতি মুহূর্তে কত অসংখ্য প্রশ্ন জাগে তাঁদের মনে। যার সবগুলিই হয়তো তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। ফলে ব্যস্ত ডাক্তারের পক্ষে সবসময় সব প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্ভব হয় না। চিকিৎসার দৃষ্টিকোণ থেকে হয়তো জবাব দেওয়া জরুরিও নয়। তবু বাড়ির লোকের মন মানে না।

এ ব্যাপারে ভুক্তভোগী আমি, আপনি সবাই। মনে পড়ে, বাবা যখন ভর্তি হয়েছিলেন নার্সিংহোমে, দিনরাত তাঁর পাশে থেকেছি, প্রতি মুহূর্তে জানতে পেরেছি কী হচ্ছে না হচ্ছে। তবু দিনের শেষে মনে এসেছে আরও কত প্রশ্ন। মনে মনে অশান্তিতে ভুগেছি।

এই বইতে ৬০টি বিভিন্ন অসুখের উপর আমার মনে আসা প্রশ্নগুলিরই জবাব দিয়েছেন বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার। যত লেখা এগিয়েছে ততই মনে হয়েছে প্রায় সময়ই রোগের সৃষ্টি এবং বাড়বৃদ্ধি আমাদের নিজেদের দোষেই। কোন অসুখে কী করা উচিত, কী করা উচিত নয়, কী খাওয়া উচিত, কী উচিত নয় বা কীভাবে ঠেকিয়ে রাখা যায় রোগকে, দুরারোগ্য অসুখের মোকাবিলাই বা কীভাবে করতে হবে ইত্যাদি বিষয় সঠিকভাবে জানা না থাকার জন্যই হয়তো যত বিপত্তি। ভয় পেয়েছি। আবার আশ্বস্তও হয়েছি। আমার অনুভূতি পাঠকের মনকে ছুঁয়ে গেলে কিছুটা সার্থকতা পাবে এই বই।

যাঁর উৎসাহ ছাড়া এই বই লেখার কথা মাথাতেই আসত না, আনন্দবাজার পত্রিকার সেই শ্রীগৌতম ভট্টাচার্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা দীপ প্রকাশনর শ্রীশংকর মণ্ডলকেও। অজানা, অচেনা একজনকে দিয়ে বই লেখানোর সাহস দেখিয়েছেন বলে। হাজারো কাজের ফাঁকে হয়তো বই লেখার অবকাশই পেতাম না। সেই অবকাশ আমাকে করে দিয়েছেন সেভিয়ার নার্সিংহোমের প্রতিটি সদস্য, আমার কাজের প্রায় অর্ধেক নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়ে। এঁদের সঙ্গে সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে সেভিয়ার কর্তৃপক্ষকেও। দীর্ঘ দু'মাস ধরে আমার ফাঁকিবাজি তাঁরা সহ্য করেছেন।

বই লেখার কাজে যে সব ডাক্তার সরাসরি সাহায্য করেছেন, যাঁরা ছিলেন নেপথ্যে এবং যাঁরা চেয়েছেন বইটি লেখা না হোক, তাঁদের প্রত্যেককে আমার ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ বিশেষ করে অধ্যাপক (ডাঃ) সুকুমার মুখোপাধ্যায়কে। তিনি তাঁর অতি মূল্যবান সময় ব্যয় করে বইটি পড়েছেন, কিছু ক্ষেত্রে সংশোধন করেছেন এবং লিখে দিয়েছেন মুখবন্ধ।

শুধুমাত্র বন্ধুত্বের খাতিরে বইয়ের অনেক হিজিবিজি ঠিক করে দিয়েছেন সীমা মজুমদার, তাঁকে ধন্যবাদ না জানালে কাজ সম্পূর্ণ হবে না।

সেভিয়ার নার্সিং হোম
২, ডাঃ সুরেশ সরকার রোড
কলকাতা - ৭০০ ০১৪

সুজাতা মুখোপাধ্যায়
দূরভাষা : ৯৮৩১০-৬৬৩৭২

Dr. Sukumar Mukherjee
MD(Cal), FRCP(Lond), FRCP(Edin)
Prof. & Head (Ex.), Medical College, Calcutta
Consultant Physician :
Calcutta Medical Research Institute
Kothari Medical Centre, Calcutta

Resi. : 1/1A, Tara Road, Calcutta - 700 026 ✆ : 466-3259
Clinic : 56, Lenin Sarani, Calcutta - 700 013 ✆ : 244-8012
11, Theatre Road, Calcutta - 700 071 ✆ : 282-7971

ডাঃ সুকুমার মুখোপাধ্যায়ের কলমে

আজকের দিনে সম্পূর্ণ চিকিৎসা ব্যবস্থাটাই বদলে গেছে। রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নতির ফলে মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে। উন্নত হয়েছে জীবনযাত্রার মান। এর সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে স্বাস্থ্য সচেতনতা। কী থেকে কী হয় তার অনেকটাই আজ পত্রপত্রিকা এবং দূরদর্শন মারফত মানুষের জানা। ফলে দায়িত্ব বেড়েছে ডাক্তারদেরও। শুধু ব্যবস্থাপত্র লিখে দেওয়া নয়, রোগী এবং তাঁর বাড়ির লোকের অজস্র প্রশ্নের জবাব দেওয়াও আজ কাজের মধ্যে পড়ে। কেন রোগ হল, কী তার প্রতিকার, রোগটি প্রতিরোধ করা যায় কি না, কী খেতে হবে, কেমন হবে জীবনযাত্রা ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বুঝিয়ে বলতে পারলে ভাল। কিন্তু অনেক সময়ই তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলে ফাটল ধরে রোগী-ডাক্তারর সম্পর্কে। আবার কখন ডাক্তারের কাছে আসা উচিত সেটা ঠিক ভাবে জানা না থাকায় অনেক সময় এমন অবস্থায় রোগী এসে উপস্থিত হন, যখন রোগ আয়ত্তের বাইরে। অথচ সময়ে সাবধান হলে এমনটি হওয়ার কথা ছিল না।

এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে বহুবার মনে হয়েছে এসব নিয়ে বাংলা ভাষায় যদি একটি বই থাকত, রোগী ডাক্তার উভয়েরই বোধহয় খুব উপকার হত। ডঃ সুজাতা মুখোপাধ্যায়ের লেখা বইটি যখন হাতে পেলাম, মনে হল, এবার খানিকটা সমস্যার সমাধান হবে। ডাক্তারের সময় বাঁচবে। রোগীর মনের অশান্তি দূর হবে। ভাল লেগেছে বইটির ভাষা, বিষয়বৈচিত্র্য এবং প্রশ্নোত্তরের ধরন। সচরাচর এই ধরনের প্রশ্নেরই মুখোমুখি হতে হয় আমাদের। আমার ধারণা, ডাক্তার এবং সাধারণ মানুষ সবার কাছেই বইটি সমাদৃত হবে।

ডাঃ সুকুমার মুখার্জী

সূচীপত্র

গর্ভাবস্থায় ম্যালেরিয়ার ওষুধ খাওয়া যায়

অধ্যাপক (ডাঃ) অমিতাভ নন্দী

দূরভাষ : ২৪১-৪৯০০

প্রঃ মশা যেখানে বেশি থাকে সেখানে ম্যালেরিয়া কম হয়?

উঃ কথাটা কিছুটা সত্যি। কারণ মশা বেশি হয় যেখানে পচা ডোবা, খোলা নর্দমা ইত্যাদি বেশি থাকে। ম্যালেরিয়ার মশা নোংরা জলে জন্মায় না। অতএব এই সমস্ত এলাকায় ম্যালেরিয়া হওয়ার সম্ভাবনা একটু কম। তবে সেখানেও পরিষ্কার জমা জলে ম্যালেরিয়ার মশা জন্মাতে পারে এবং অন্য জায়গা থেকে কেউ রোগ নিয়ে এসে উপস্থিত হলে রোগ ছড়াতে পারে। তা হলেও ম্যালেরিয়াপ্রবণ এলাকার তুলনায় সংখ্যাটা কমই হবে।

প্রঃ নার্সিংহোম বা হাসপাতালে যেখানে ম্যালেরিয়া ওয়ার্ড নেই, সাধারণ রোগীর পাশে ম্যালেরিয়া রোগী রাখলে কি রোগ ছড়াতে পারে?

উঃ ম্যালেরিয়া ছোঁয়াচে নয়। এর ছড়ানোর ব্যাপারটা একটু অন্যরকম ভাবে হয়। ম্যালেরিয়া হওয়ার ৪-৬ দিন পরে মশা কামড়ালে মশার শরীরে ম্যালেরিয়ার জীবাণু যায়। চিকিৎসা শুরু হয়ে গেলে সে সম্ভাবনাও কমে যায় অনেকখানি। তার ৭-১০ দিন পরে সেই মশা সুস্থ মানুষকে সংক্রামিত করতে পারে। ম্যালেরিয়ার মশা কামড়ালেই ম্যালেরিয়া হবে তা নয়। মানুষটির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জোরদার হলে হবে না। হলেও রোগ দেখা দিতে দিতে ১—৬ সপ্তাহ সময় লেগে যাবে। অতএব নার্সিংহোম বা হাসপাতালে এসে ম্যালেরিয়া হয়েছে মানে রোগ সেখান থেকেই ছড়িয়েছে সব সময় এরকম নাও হতে পারে। তা সত্ত্বেও নার্সিংহোম, হাসপাতাল মশামুক্ত রাখা এবং ম্যালেরিয়া রোগীকে সন্ধের পর থেকে মশারির নীচে রাখা দরকার। আলাদা ম্যালেরিয়া ওয়ার্ডের কোনও প্রয়োজন নেই।

প্রঃ কী সাবধানতা মেনে চললে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ করা যাবে?

উঃ সে তো সবাই জানে এখন। বাড়ির চারপাশে জল জমতে না দেওয়া। চৌবাচ্চা থাকলে ৭দিনে অন্তত একবার শুকিয়ে নেওয়া। সন্ধে হতেই ঘরে মশার ধূপ জ্বেলে দেওয়া। দরজা জানলা বন্ধ রাখা বা জাল লাগানো। মশারির নীচে শোয়া এবং খেয়াল রাখা

শরীরের কোনও অংশ যাতে মশারির গায়ে লেগে না থাকে এবং যে কোনও রকমের জ্বর হলে ম্যালেরিয়ার পরীক্ষা করানো।

প্রঃ মরসুম শুরু হওয়ামাত্র ক্লোরোকুইন খেতে শুরু করলেও তো ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ করা যায়?

উঃ আগে থেকে ক্লোরোকুইন খেতে শুরু করলে ম্যালেরিয়ার তীব্রতা কমিয়ে রাখা যায়, প্রতিরোধ করা যায় না। এছাড়া এর কতগুলি খারাপ দিকও আছে। যেমন এদের ম্যালেরিয়া হলে প্রথমদিকে উপসর্গ এবং রক্তে জীবাণু এত কম মাত্রায় থাকে যে রোগ ধরা পড়তে দেরি হয়। জীবাণু ক্লোরোকুইনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তৈরি করে। ফলে রোগ হলে এই ওষুধে আর কাজ হয় না এবং বেশি দিন ধরে ক্লোরোকুইন খেতে থাকলে চোখের ক্ষতি হয়।

প্রঃ কিন্তু জঙ্গলে বেড়াতে যাওয়ার আগে তো সাবধানতা হিসেবে ওষুধ খেতে বলা হয়?

উ· না, খেতে বলা হয় না। জঙ্গল এবং প্রতিরোধী ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়াপ্রবণএলাকা যেমন, ওড়িষ্যা, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরবঙ্গ ইত্যাদি জায়গায় বেড়াতে গেলে এবং সেখানে যদি ৭ দিনের বেশি থাকার কথা থাকে, সাবধানতা হিসাবে সঙ্গে মেফলোকুইন অথবা কুইনাইন নিয়ে যেতে বলা হয়। পৌঁছনোর ৭-৮ দিনের মাথায় জ্বর হলে প্রতি কেজি ওজনের জন্য ১৫ মিলিগ্রাম মেফলোকুইন খেতে হয়। অথবা হিসেবে মতো কুইনাইন। অবশ্য রক্ত পরীক্ষা করার সুবিধে থাকলে আগে পরীক্ষা করে নিয়ে তবেই ওষুধ খাওয়া উচিত।

প্রঃ মেফলোকুইন বেশি দিন ধরে খেলে মানসিক সমস্যা দেখা দিতে পারে?

উঃ শুধু মানসিক সমস্যা নয়, হার্ট এবং কিডনিও খারাপ হতে পারে। তবে ডাক্তারের পরামর্শ মতো সঠিক মাত্রায় খেলে তেমন ভয়ের কিছু নেই। সামান্য সমস্যা দেখা দিলেও তা সহজ আয়ত্তে আনা যায়।

প্রঃ ম্যালেরিয়ার রক্ত পরীক্ষার সঠিক নিয়ম কী? জ্বর এবং কাঁপুনি থাকাকালীন রক্ত পরীক্ষা না করালে ম্যালেরিয়ার জীবাণু ধরা পড়ে না?

উঃ এরকম কোনও কথা নেই। যে কোনও অবস্থায় রক্ত পরীক্ষা করলেই জীবাণুর হদিশ পাওয়া যায়।

প্রঃ ম্যালেরিয়া হয়েছে অথচ রক্ত পরীক্ষায় ধরা পড়ল না এরকমও তো হয়?

উঃ রোগ প্রাথমিক অবস্থায় থাকলে অনেক সময় রক্তে জীবাণুর সংখ্যা এত কম থাকে যে তা ধরা নাও পড়তে পারে, সেজন্য পরপর তিনদিন রক্তপরীক্ষা করার নিয়ম। ল্যাবরেটরির গোলযোগে কিছু ক্ষেত্রে ভুল হতে পারে। আগে থেকে ম্যালেরিয়ার ওষুধ খেতে থাকলেও অনেক সময় জীবাণু ধরা পড়ে না।

প্রঃ এর ফলে রোগীর অবস্থা খারাপ হয়ে যেতে পারে তো?

উঃ ৩ দিন পরপর রক্ত পরীক্ষা করিয়েও ম্যালেরিয়া ধরা পড়ল না, এরকম সম্ভাবনা খুব কম। তাছাড়া পূর্ণবয়স্ক সুস্থ মানুষের ক্ষেত্রে ম্যালেরিয়া জটিল হতে ৫-৭ দিন সময় লাগে। তার মধ্যে রোগনির্ণয় এবং চিকিৎসা শুরু হয়ে যায়। বিপদ হয় শিশু, গর্ভবতী মহিলা, অসুস্থ এবং বয়স্ক মানুষের বেলায়। এদের ক্ষেত্রে রোগ শুরু হওয়ার ২-৩ দিনের মধ্যে অবস্থা খারাপ হয়ে যেতে পারে। কাজেই রোগ ধরা পড়ছে না

অথচ প্রাথমিক উপসর্গে কিছু পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে এরকম অবস্থা হলে রোগ ধরা পড়ুক বা না পড়ুক ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা চালু করে দেওয়া দরকার।

প্র: প্রাথমিক উপসর্গ মানে তো কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসা?

উ: সব সময় কাঁপুনি থাকে না। জ্বরের ধরনেও রকম ফের হয়। কারোর ক্ষেত্রে খুব বেশি, কারোর ক্ষেত্রে ঘুসঘুসে। জ্বর দিনের মধ্যে দু-তিন বার বাড়তে কমতে পারে। কখনও এক দু দিন বাদে বাদে জ্বর আসে। বমি বমি ভাব বা বমি, মাথা ব্যথা ইত্যাদিও থাকতে পারে।

প্র: কী করে বোঝা যাবে রোগীর অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে?

উ: বেশ কিছু লক্ষণ আছে, তার মধ্যে একটিও যদি কারোর মধ্যে দেখা যায় বুঝতে হবে রোগীর অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে। যেমন-

(১) খুব বেশি জ্বর ১০৫°—১০৬° কি তারও বেশি
(২) রক্তে জীবাণুর সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকা
(৩) প্রস্রাবের পরিমাণ কমে আসা বা বন্ধ হয়ে যাওয়া, হলুদ বা চায়ের লিকারের মতো রংয়ের প্রস্রাব হওয়া
(৪) রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ ৭ গ্রামের নীচে নেমে যাওয়া
(৫) শরীরের কোথাও রক্তপাত, যেমন দাঁতে, চোখে, প্রস্রাবে, পায়খানায় বা কাশির সঙ্গে
(৬) শ্বাসকষ্ট
(৭) হঠাৎ করে ঘাম দেওয়া বা হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া
(৮) রক্ত চাপ কমতে থাকা, নাড়ির গতি ক্ষীণ হয়ে আসা
(৯) অত্যধিক বমি
(১০) ভুল বকা
(১১) তরকা
(১২) অজ্ঞান হয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

প্র: ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়াতেই কি রোগীর অবস্থা খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি?

উ: হ্যাঁ।

প্র: মালিগন্যান্ট এবং সাধারণ ম্যালেরিয়া একসঙ্গে থাকলে কি অবস্থা আরও জটিল হয়?

উ: দু'ধরনের ম্যালেরিয়া একসঙ্গে থাকার সম্ভাবনা খুবই কম। থাকলে চিকিৎসা করা একটু জটিল হয়ে পড়ে।

প্র: ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া হলেই কি সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করা দরকার?

উ: না। তবে জটিলতা দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে ভর্তি করা উচিত।

প্র: ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ায় তো মৃত্যুর হার খুব বেশি। তা কি অবস্থা জটিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নেওয়া হয় না বলে?

উ: সেটা একটা বড় কারণ। এছাড়া রক্তে ফ্যালসিফেরাম জীবাণুর সংখ্যা দ্রুত বাড়তে শুরু করলে শরীরের প্রায় প্রতিটি প্রত্যঙ্গে তার প্রভাব পড়ে। অনেক সময় পুরো ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটে যায় যে চিকিৎসা সত্ত্বেও রোগীর মৃত্যু এড়ানো যায় না।

প্রঃ রক্তে জীবাণুর সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে, সেটা কীভাবে বোঝা যাবে?

উঃ রক্ত পরীক্ষা করে। তবে এই পরীক্ষা সব জায়গায় হয় না। স্কুল অব ট্রপিকাল মেডিসিন এবং সেন্টার ফর ট্রপিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড প্যারাসাইটোলজি থেকে করতে হবে।

প্রঃ গর্ভাবস্থায় ম্যালেরিয়ার ওষুধ খেলে গর্ভপাত হয়ে যায়?

উঃ গর্ভাবস্থায় ক্ষতি হতে পারে প্রাইমাকুইন, সালফাডক্সিন, পাইরিমিথামিন, মেফলোকুইন, আরটিমিসিনিন, টেট্রাসাইক্লিন, ডক্সিসাইক্লিন ইত্যাদি ওষুধ খেলে, কিন্তু কুইনিন বা ক্লোরোকুইন স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা যায়। এ নিয়ে দোনামনা করলে বরং বিপদের সম্ভাবনা বেশি। ম্যালেরিয়া হলে গর্ভবতী মায়ের অনেকসময় পেটে ব্যথা হয়। কিন্তু সেটা ওষুধের জন্য নয়, ম্যালেরিয়ার জন্য।

টাইফয়েড প্যারাটাইফয়েড এড়াতে জল ফুটিয়ে খান

অধ্যাপক (ডাঃ) পঞ্চানন মৌলিক

দূরভাষ : ৯৮৩০০-৫৭৬৭৮

প্রঃ গলব্লাডারের সমস্যা থাকলে নাকি টাইফয়েড হওয়ার প্রবণতা থাকে?

উঃ ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। টাইফয়েড হওয়ার পর সম্পূর্ণ চিকিৎসা না হলে অনেক সময় ব্যাকটেরিয়া গল ব্লাডার অথবা কোলনে বাসা বেঁধে এদের মাধ্যমে রোগ ছড়াতে পারে।

প্র. কীভাবে?

উঃ মলমূত্রের মাধ্যমে।

প্রঃ মলমূত্রের মাধ্যমে? তবে যে শুনেছি দূষিত জল এবং খাবার থেকে টাইফয়েড হয়?

উঃ ঠিক শুনেছেন। জীবাণু বহনকারী মলমূত্রের মাধ্যমে দূষিত জলই টাইফয়েড ছড়ায়। নানাভাবে ব্যাপারটা ঘটে। প্রথমত, বর্ষাকালে বা বন্যার সময় চতুর্দিক জলে ভেসে যায়। সব একাকার হয়ে যাওয়ার দরুণ জল দূষিত হয়ে পড়ে। এই জল পরিশোধন না করে রান্না, খাওয়া বা বাসন পত্র ধোওয়ার কাজে ব্যবহার করলে জীবাণু সরাসরি শরীরে এসে ঢোকে। শহরাঞ্চলে মাটির নীচে খাওয়ার জলের পাইপ আর আবর্জনা ধুয়ে আসা নোংরা জলের পাইপ পাশাপাশি বয়ে চলে। সঠিক নজরদারির অভাবে পাইপ ফুটো হয় নোংরা জল এবং খাবার জল মিশে যেতে পারে। ফলে পানীয় জলে মিশে যায় জীবাণু। তৃতীয় কারণ রাস্তায় বাসনকোসন দূষিত গঙ্গা জলেব ফোয়ারায় ধোয়া। রাস্তার হোটেল রেস্টুরেণ্টে এই সব বাসনে করেই খাবার দেওয়ার চল। অফিস কাছারি বা বহুতল বাড়ির দীর্ঘকাল অপরিশোধিত জলের ট্যাঙ্কও অনেক সময় টাইফয়েড জীবাণুর বাড়বৃদ্ধির জায়গা হয়ে দাঁড়ায়।

প্রঃ কীভাবে তাহলে এই পরিস্থিতি ঠেকানো যাবে?

উঃ জল খুব ভালো ভাবে ফুটিয়ে খেতে হবে। নোংবা জলে স্নান করা, বাসন পত্র ধোয়া চলবে না। অতএব রাস্তার খাবারও খাওয়া যাবে না। যাদের সামর্থ্য আছে তাঁরা বাইরের মিনারেল ওয়াটার খেতে পারেন। অথবা বাড়ি থেকে ফোটানো জল নিয়ে বেরোতে পারেন।

প্র: রাস্তার গরম খাবার খেলে নাকি সমস্যা হয় না?

উ: গরম ধোঁয়া ওঠা খাবারে সমস্যা কম হয় কিন্তু নোংরা জলে ধোয়া বাসনপত্রের মাধ্যমেও জীবাণু আসতে পারে। রাস্তায় খেতে হলে বাসনপত্রও গরম জলে ধুয়ে নিতে হবে। যে সমস্ত খাবার হাত দিয়ে পরিবেশন করা হয় যেমন, ফুচকা, আলুকাবলি ইত্যাদি একদম খাওয়া চলবে না।

প্র: কিন্তু এই যে বছর বছর বন্যা হয়, এর মধ্যে কি স্বাস্থ্যবিধি মেনে জীবন ধারণ করা সম্ভব?

উ: খুবই অসুবিধে। তবে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে জল ফুটিয়ে খেতে হবে।

প্র: শুধু ফুটিয়ে নিলেই কি জল পানের যোগ্য হবে?

উ: পুকুর বা খোলা কুয়ো থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করা হলে তাতে ফিটকিরি দিয়ে সারারাত রেখে দিতে হবে। তারপর ছেঁকে নিয়ে ফোটানোর পর মেশাতে হবে হ্যালোজেন ট্যাবলেট অথবা এক চিমটে ব্লিচিং পাউডার। তার আধঘণ্টা বাদে সেই জল খাওয়ার উপযুক্ত হবে। যাঁরা বাড়িতে ফিল্টার ব্যবহার করেন তাঁদের উচিত জল ফুটিয়ে তবে ফিল্টার করা। অথবা ফিল্টার করার পর হ্যালোজেন মেশানো। এবং নিয়মিত ফিল্টার ক্যান্ডেল পরিষ্কার করা। কারণ ফিল্টার কেবল জলে অদ্রবণীয় পদার্থ এবং কিছু ব্যাকটিরিয়াকে আলাদা করতে পারে। এবং অপরিষ্কৃত ক্যান্ডেল বেশি দিন ব্যবহার করলে সেখান থেকে নানা ধরনের জীবাণু সংক্রমণ হতে পারে।

প্র: টাইফয়েড থেকে পেপটিক আলসার হতে পারে?

উ: সঠিক চিকিৎসা না হলে ২-৩ সপ্তাহ পরে অন্ত্রে ঘা হতে পারে। রক্তবমি, কালো পায়খানাও হতে পারে। তবে আজকাল সাধারণত রোগ অতদূর পৌঁছয় না।

প্র: কিন্তু টাইফয়েড নাকি সহজে ধরা পড়ে না?

উ: প্রথম সপ্তাহে ব্লাড কালচার, দ্বিতীয় সপ্তাহে ভিডাল টেস্ট এবং তৃতীয় সপ্তাহে পায়খানা পরীক্ষা করে রোগ ধরা পড়ার কথা। কিছু ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকের উপসর্গ চেনার ক্ষমতা সে ক্ষেত্রে কাজে আসে। তবে কিছু আধুনিক পদ্ধতি যেমন ব্যাকটেক পদ্ধতিতে ব্লাড কালচার করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রথম ৩ দিনের মধ্যে রোগ ধরে ফেলা সম্ভব।

প্র: কী উপসর্গ দেখলে বোঝা যাবে রোগটা টাইফয়েড?

উ: উপসর্গ শুরু হয় অল্প জ্বর এবং কপাল ব্যথা দিয়ে। এরপর ৭-১০ দিনের মাথায় জ্বর বাড়তে বাড়তে ১০৪-১০৫° র মতো হয়। সময়ের সঙ্গে জ্বরের বৃদ্ধির যদি গ্রাফ টানা যায় সেটা অনেকটা সিঁড়ির মতো দেখতে হয়। এর সঙ্গে থাকে কোষ্ঠবদ্ধতা, খিধে না হওয়া, বমি বমি ভাব বা বমি। ৫ দিনের মাথায় শরীরে র‍্যাশ বেরোতে পারে। প্রথমে পেটে। মুখেও বেরোতে পারে। সাধারণভাবে জ্বরের জন্য হৃৎস্পন্দন যতখানি বাড়ার কথা তার থেকে কম বাড়ে। যেমন, ১০২° জ্বরের জন্য হৃৎস্পন্দন হওয়া উচিত ১১০ এর কাছাকাছি। এক্ষেত্রে হয় ৯০ এর আশপাশে। ৬-৭ দিনের মাথায় পিলে বড় হয়। দ্বিতীয় সপ্তাহে হৃৎস্পন্দন স্বাভাবিক নিয়ম মানতে শুরু করে। জ্বর ১০১-১০৪° র মতো থাকে। জিভে পুরু আস্তরণ, গায়ে র‍্যাস এবং পিলের

সঙ্গে লিভারও বড় হয়ে যায়। কোষ্ঠবদ্ধতা চলে গিয়ে এবার শুরু হয় ডায়েরিয়া। সঠিক চিকিৎসা না হলে তৃতীয় সপ্তাহ থেকে রোগীর অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায়। ডিহাইড্রেশন, জ্বর, রক্তচাপ কমে যাওয়া, ভুল বকা ইত্যাদি শুরু হয়। রোগী আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে পারে। ভুল বকতে শুরু করবে। মিশে যাবে বিছানার সঙ্গে। এ সময় পেটে ঘা হয়ে সেখান থেকে রক্তপাত শুরু হয়ে যেতে পারে।

প্র: উপসর্গের উপর ভিত্তি করেই কি চিকিৎসা শুরু হয়?

উ: টাইফয়েডের চিকিৎসায় ধৈর্যের প্রয়োজন। প্রথম ৬-৭ দিন জ্বর এবং অন্যান্য উপসর্গ কমার জন্য ওষুধপত্র দিয়ে রাখলে কোনও ক্ষতি হয় না। এর সঙ্গে ভিটামিন। যদি মনে হয় টাইফয়েড হয়েছে ব্লাড কালচার করতে বলা হয়। তার রিপোর্ট আসতে ৩ থেকে ৭ দিন লাগে। অনেকেই ধৈর্য ধরতে পারেন না। অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দেন। কিন্তু এরকম করা ঠিক নয়। উপসর্গের সঙ্গে রক্ত পরীক্ষার (ব্লাড কালচার নয়) রিপোর্ট মিলিয়ে মনে সন্দেহ হলেও ভিজল টেস্ট এবং ব্লাড কালচারের রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করা উচিত। জ্বর শুরু হওয়ার ৭ দিনের মাথায় ভিডাল টেস্ট করা হয়। ১০ দিনের মাথায় করা হয় স্টুল এবং ইউরিন কালচার। সাধারণ ভাবে ৭-৮ দিনের মাথায় কিছু হদিশ পাওয়া যায়। না পাওয়া গেলে এই সময় উপসর্গের ভিত্তিতে টাইফয়েডের চিকিৎসা শুরু করা যায়।

প্র: টাইফয়েড জটিল অবস্থায় পৌঁছলে কি তাকে প্যারাটাইফয়েড বলে?

উ: না, কোন ধরনের জীবাণু সংক্রমণ হয়েছে তার উপর নির্ভর করে রোগটা টাইফয়েড না প্যারাটাইফয়েড। প্যারাটাইফয়েডের জটিলতা বরং একটু কম।

প্র: দু'টি রোগের উপসর্গই কি এক?

উ: প্রায় এক।

প্র: আর চিকিৎসা?

উ: চিকিৎসাও এক।

প্র: আজকাল শুনছি পুরনো টাইফয়েডের ওষুধে অনেক সময় রোগ ঠিক হয় না?

উ: মাল্টি ড্রাগ রেজিসট্যান্ট টাইফয়েড হলে অনেক সময় প্রচলিত ওষুধে কাজ হবে না।

প্র: সেটা বোঝা যাবে কীভাবে?

উ: টাইফয়েডের চিকিৎসা সাধারণত হয় ক্লোরামফেনিকল বা সিপ্রোফ্লক্সাসিন দিয়ে। এতে কাজ না হলে দুটি ভাবনা আসে— (১) রোগটা আদৌ টাইফয়েড কিনা, (২) নাকি মাল্টি ড্রাগ রেজিসট্যান্ট টাইফয়েড দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যে ব্লাড স্টুল এবং ইউরিন কালচারের রিপোর্ট হাতে এসে যাবে। কাজেই কোন অ্যান্টিবায়োটিকে কাজ হবে সেটা বুঝতে পারা যায়।

প্র: তাহলে তো ভিডাল টেস্ট এবং কালচাব রিপোর্ট পাওয়ার পরই চিকিৎসা শুরু করা ভাল?

উ: সে তো সবসময়ই ভাল। তবে নানা জিনিস কাজ কবে এর ভেতরে। (১) হয়তো রোগী এলই রোগ শুরু হওয়ার ৫-৭ দিন বাদে, (২) ভিডাল টেস্ট এবং কালচার

করে তেমন কিছু পাওয়া গেল না, (৩) রোগী এবং বাড়ির লোক খুব অধৈর্য, ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে অনেক সময় সপ্তাহ খানেকের মধ্যে চিকিৎসা শুরু করে দিতে হয়।

প্রঃ টাইফয়েডে খাওয়া দাওয়ার কিছু বিধি নিষেধ আছে?

উঃ জ্বর শুরু হওয়ার পর থেকেই হিসেব করে খাওয়া দাওয়া করা দরকার। অবশ্য বমিভাব, বমি এবং মাথা ব্যথার দরুন রোগী তেমন কিছু খাওয়ার অবস্থায় থাকে না। বমি বন্ধ হওয়ার ওষুধ এবং ভিটামিনের সঙ্গে গ্লুকোজ এবং ইলেকট্রোলাইট মেশানো জল, স্যুপ, ফলের রস, হরলিক্স, ঘোল, মুড়ি, বিস্কুট, গলাভাত, মাছ, পেঁপে বা আলু সেদ্ধ ইত্যাদি খাওয়ানো উচিত। ডায়েরিয়া শুরু হলে খাওয়ার ব্যাপারে আরও সতর্ক হওয়া দরকার। অবস্থা খারাপ হলে স্যালাইন চালানো হয়। মুখে গ্লুকোজের জল বা হরলিক্স ছাড়া আর কিছুই দেওয়া যায় না।

প্রঃ আর সেরে যাওয়ার পর?

উঃ রোগ সারার পর সুস্থ হতে মোটামুটি ১০ থেকে ১৫ দিন সময় লাগে। এসময় হাল্‌কা সহজপাচ্য খাবার অল্প অল্প করে খাওয়ানো দরকার। একেবারে সেদ্ধ খাবার না হলেও চলবে। তবে তেলমশলা কম দেওয়া বাঞ্ছনীয়। জল খেতে হবে বেশি করে। প্রয়োজন বুঝলে গ্লুকোজ, ফলের রস ইত্যাদিও দেওযা যাবে। তবে শরীব বুঝে। অনেকের ফলের রসে অম্বল হয়। গ্লুকোজ বেশি খেলে কারও আবাব পেট ফাঁপে। মোট কথা শরীরে সহ্য হবে এমন পুষ্টিকর অথচ হাল্‌কা খাবার খাওযাতে হবে।

যক্ষ্মা হলে ভালমন্দ খাওয়ার দরকার নেই

অধ্যাপক (ডাঃ) সুজিত মিত্র

দূরভাষ : ২৪৭ ৩০০০

প্র : হাঁচি, কাশি এমনকি অসুস্থ মানুষ কথা বললে বা গান গাইলেও যক্ষ্মা রোগ ছড়িয়ে পড়ে?

উ: ফুসফুসে যক্ষ্মা থাকলে হাঁচি কাশি, কথা বলা বা গান গাওয়ার মাধ্যমে জীবাণু বাতাসে চলে আসে। সংক্রামিত করে ধারে কাছের মানুষকে।

প্র: তাহলে তো খুব মুশকিল। বাসে, ট্রামে, রাস্তাঘাটে এত অসংখ্য মানুষের সঙ্গে ঘেঁসাঘেঁসি করে চলতে হয়?

উ: সংক্রামিত হলেই আপনি অসুস্থ হবেন ব্যাপারটা ঠিক এরকম নয়। বাতাসে, খাবারে, জলে সর্বত্র লক্ষ লক্ষ জীবাণু ঘুরে বেড়ায়। সেরকম হলে তো বেঁচে থাকারই কথা নয়।

প্র: অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা তো থাকে?

উ: প্রতিরোধশক্তি জোরদার হলে অনেক সংক্রমণই এড়িয়ে যেতে পারে শরীর।

প্র: প্রতিরোধ শক্তি কীভাবে বাড়ানো যায়?

উ: ভাল খাওয়া দাওয়া, স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন এবং বিশেষ করে যক্ষ্মার বেলায় ছোটবেলায় যদি বিসিজি ভ্যাকসিন নেওয়া থাকে বোগ হওয়ার সম্ভাবনা কম।

প্র: বি সি জি ভ্যাকসিন নেওয়া থাকা সত্ত্বেও তো যক্ষ্মা হয়?

উ: যক্ষ্মা দুধরনের প্রাইমারি বা প্রাথমিক এবং পোস্ট প্রাইমাবি বা প্রাথমিক পরবর্তী। প্রাথমিক যক্ষ্মায় জীবাণু শরীরে ঢোকার পর প্রতিরোধ শক্তি তাঁকে আটকাতে না পারলে যক্ষ্মা মারাত্মক ভাবে দেখা দেয়। প্রাথমিক যক্ষ্মা সেরে গেলে পরবর্তী কালে যদি আবার যক্ষ্মা হয় তাকে বলা হয় প্রাথমিক পরবর্তী যক্ষ্মা। এবং তার চরিত্র সম্পূর্ণ আলাদা। প্রাথমিক যক্ষ্মা ফুসফুস ছাড়াও শরীরের প্রায় প্রতিটি প্রত্যঙ্গে যেমন গলা, পেট, হাড় ইত্যাদিতে যক্ষ্মার বীজ ছড়িয়ে দেয়। প্রতিরোধ সক্রিয় হলে তখন তখন তার রূপ

প্রকাশ পায় না। কিন্তু কোনও কারণে সেই অংশের প্রতিরোধ শক্তি কখনও কমে গেলে সেই প্রত্যঙ্গ আক্রান্ত হতে পারে। প্রাথমিক পরবর্তী যক্ষ্মার লক্ষ্য কিন্তু ফুসফুস। বিসিজি ভ্যাকসিন প্রাথমিক যক্ষ্মার বিরুদ্ধে শরীরে প্রতিরোধ তৈরি করে। অতএব বিসিজি ভ্যাকসিন নেওয়া থাকলে যক্ষ্মা হলেও তা হবে প্রাথমিক পরবর্তী যক্ষ্মা, যা ফুসফুস ছাড়া অন্য কোনও প্রত্যঙ্গে হবে না এবং মারাত্মক রূপ নেবে না। ঠিকঠাক ওষুধ পত্র খেলে এ নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই।

প্রঃ)কিন্তু ঠিকঠাক ওষুধপত্র খেলেও সারে না এমন যক্ষ্মাও তো আছে?

উঃ হ্যাঁ, প্রচলিত প্রায় কোনও ওষুধেই সাড়া দেয়না এমন যক্ষ্মা, যাকে বলে প্রতিরোধী যক্ষ্মা বা মাল্টি ড্রাগ রেজিসট্যান্ট টিউবার কুলোসিস বা সংক্ষেপে এম ডি আর টি বি, সত্যিই ভয়াবহ। এই যক্ষ্মা হয় মূলত সঠিকভাবে ওষুধপত্র না খাওয়ার দরুণ। কোনও একটা ওষুধ হয়ত কেউ কিছুদিন খেলেন, কিন্তু যে মুহূর্তে রোগের উপসর্গ চলে গেল ওষুধ বন্ধ করে দিলেন। রোগ সারেনি। কাজেই আবার অসুস্থ হওয়ার ব্যাপার থাকবে। তখন কিন্তু শরীরে থেকে যাওয়া যক্ষ্মার জীবাণু এই ওষুধটির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তুলেছে। ফলে নতুন করে চিকিৎসা শুরু হওয়ার কিছু দিন পর যখন দেখা যাবে এই ওষুধ কাজ করছে না ততদিনে রোগ এগিয়ে গেছে অনেকখানি। সামলাতে নতুন ওষুধ দিতে হবে। এভাবে দু'এক বার চললেই প্রচলিত ওষুধগুলিব বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তৈরি হয়ে যায় শরীরে।

যেহেতু যক্ষ্মা রোগটি মানুষ থেকে মানুষে ছড়ায়, এই মানুষটির দ্বাবা যাঁরা যাঁবা সংক্রামিত হবেন সবার মধ্যেই একই সমস্যা দেখা দেবে। এদের রোগ ছড়ানোব ক্ষমতাও বেশি কারণ দীর্ঘদিন কোনও চিকিৎসাই প্রায় এদের করা যায় না।

প্রঃ তাহলে এদের পরিণতি কী? মৃত্যু?

উঃ আমাদের দেশে এর প্রকোপ বাড়ছে। এবং পরিণতি প্রায়সময় মৃত্যুই।

প্রঃ কোন ওষুধ এদের শরীরে কাজ করবে তা কি খুঁজেই পাওয়া যায় না?

উঃ কফ কালচার করে সেনসিটিভিটি পরীক্ষা করালে কোন ওষুধে এম ভি সার টিবি সারবে সেটা খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সেনসিটিভিটি পরীক্ষার সেরকম কোনও সুযোগ নেই। যাঁদের পয়সা আছে তাঁরা বাইরে থেকে করিয়ে আনতে পারেন। কিন্তু গরিবদের ক্ষেত্রে মুশকিল। আবার গরিবদের মধ্যেই এই রোগের প্রকোপ বেশি। কখনও সঠিক ওষুধপত্র না খেয়ে রোগ পুশে রাখার দরুণ। কখনও ঘিঞ্জি এলাকায় বসবাসের দরুণ একের থেকে অন্যেব সংক্রমণের ফলে।

প্রঃ সাধারণ যক্ষ্মার ক্ষেত্রে কতদিন চিকিৎসা চললে আর রোগ ছড়ায় না?

উঃ মোটামুটি ভাবে ৪ সপ্তাহ। ওষুধ শুরু হওয়ার মোটামুটি সপ্তাহ চারেক পরে কফ পরীক্ষায় জীবাণুর হদিশ না পেলে রোগীকে সবার সঙ্গে মেলামেশা করার অনুমতি দেওয়া হয়। অর্থাৎ অন্তত মাসখানেক রোগীকে আলাদা ভাবে থাকতে হয়।

প্রঃ ভাল খাওয়া দাওয়াবও তো দরকার আছে?

উঃ খাওয়া দাওয়া নিয়ে মানুষের মনে এখনও প্রচুর ভুল ধারণা আছে। যক্ষ্মা হওয়া মানেই ডিম, দুধ, মাছ, মাংস, দামি ফল খেতে হবে এমন কোনও মানে নেই। সাধারণ

গরিব মানুষ, যাঁরা শাক সবজি, ডাল, ভাত বা সস্তার চুনো মাছ, ল্যাটা মাছ, গেঁড়ি গুগলিতে অভ্যস্থ, তাঁরা যদি দু'বেলা তাই পেট পুরে খান এবং নিয়মিত ওষুধ খান— দ্রুত রোগ সেরে যাবে। অনেকে আছেন টাকায় কুলোচ্ছে না বলে দু' চারটে ওষুধ বাদ দিয়ে ডিম, দুধ, ছানা খাচ্ছেন। কিন্তু খেয়াল রাখা দরকার যক্ষ্মা রোগের মূল দাওয়াই হচ্ছে ওষুধ। সঙ্গে সহজ পাচ্য খাবার পেট ভর্তি করে খেতে হবে। তবেই সুফল পাওয়া যাবে।

প্র: আর খোলামেলা জায়গায় থাকা?

উ: খোলামেলা জায়গায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকা এই রোগে খুব জরুরি। যতটা নিজের জন্য, তার থেকেও বেশি পারিপার্শ্বিকের জন্য। সুস্থ জীবন যাপন করলে রোগ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা কমবে।

প্র: আগে যে যক্ষ্মা হলে পাহাড়ে বেড়াতে নিয়ে যেত?

উ: যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসায় দুটি জিনিসই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। (১) যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগ নির্ণয় করা এবং (২) সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা শুরু করা।

প্র: রোগ নির্ণয় মানে তো এক সরে এবং কফ পরীক্ষা?

উ: মূলত তাই। রোগীকে দেখে এবং কথাবার্তা বলে সন্দেহ হলে আমরা পরীক্ষা করি। এরপর পর পর তিনদিন কফ পরীক্ষা করা হয়। বুকের এক্সরে সব সময় দরকার হয় না। ডায়াবেটিস আছে কিনা সেটাও দেখা হয়।

প্র: মাণ্টু টেস্ট?

উ: আমাদের দেশে, যেখানে অহরহ যক্ষ্মা রোগীর সঙ্গে ওঠাবসা, মাণ্টু টেস্টের সেরকম প্রাসঙ্গিকতা নেই। যদি এমনও হয় যক্ষা বলে মাণ্টু টেস্ট পজিটিভ সন্দেহও হচ্ছে, অথচ এক্সরে এবং কফ পরীক্ষায় সেরকম কিছু পাওয়া গেল না — চিকিৎসা শুরু করা যাবে না। তবে ৩ বছরের কম বয়সী বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এই টেস্টের গুরুত্ব আছে।

প্র: যক্ষ্মা রোগীর সঙ্গে ওঠাবসা হলে শরীরে রোগ না থাকলেও মাণ্টু টেস্ট পজিটিভ হবে?

উ: শরীরে জীবাণু ঢুকলেই মাণ্টুটেস্ট পজিটিভ হবে, রোগ হোক না হোক্য

প্র: ডায়াবেটিস রোগীদের মধ্যে কি যক্ষ্মা হওয়ার প্রবণতা বেশি?

উ: হ্যাঁ, ডায়াবেটিস হলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। এবং আক্রান্ত হলে সহজে সারতেও চায় না।

প্র: এডস হলে তো আরও মারাত্মক অবস্থা?

উ: যক্ষ্মার প্রকোপ ইদানীংকালে এতখানি বেড়েছে খানিকটা এডসের কারণেও।

প্র: যক্ষা প্রতিরোধ করা যায় না? কিছু ওষুধ পত্র আছে শুনেছি যা খেলে যক্ষ্মা হয় না?

উ: মাণ্টুটেস্ট পজিটিভ হলে পশ্চিম দেশে আইসোনায়াজিড জাতীয় ওষুধ ৬ মাস থেকে ১ বছর খাওয়ানোর নিয়ম আছে আমাদের দেশে যক্ষ্মার প্রকোপ এমনিতেই এমন বেশি যে এভাবে ওষুধপত্র দেওয়া হয় না।

প্র: প্লুরিসি কি যক্ষ্মার আগের ধাপ?

উ: প্লুরা অর্থাৎ ফুসফুসের বহিরাবরণে যদি যক্ষ্মার জীবাণু সংক্রমণ হয় তাকে বলে প্লুরিসি। আর ফুসফুসে সংক্রমণ হলে বলে ফুসফুসের যক্ষ্মা। বা প্রচলিত কথায় শুধু যক্ষ্মা। আসলে শতকরা ৯০ ভাগ যক্ষ্মাই হয় ফুসফুসে। সেজন্য যক্ষ্মা বলতে সাধারণত ফুসফুসের যক্ষ্মাকেই বোঝানো হয়।

প্র: প্লুরিসির চিকিৎসাও কি যক্ষ্মার মতো?

উ: ওষুধ পত্র, খাওয়া দাওয়া যক্ষ্মারই মতো। প্লুরিসি সংক্রামক নয় তবে প্রাথমিক অবস্থায় বাচ্চাদের থেকে দূরে থাকতে বলা হয়। কিন্তু সে অর্থে আড়ালে থাকার দরকার পড়ে না।

প্র: কিন্তু অনেক সময় যে দেখা যায় প্রথমে প্লুরিসি হল তারপর তা যক্ষ্মায় দাঁড়িয়ে গেল?

উ: অনেক সময় একই সঙ্গে বা আগে পরে সংক্রমণ হতে পারে। তবে প্লুরিসির চিকিৎসা ঠিক ভাবে হলে যক্ষ্মা হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

প্র: শরীরের আর কোথায় কোথায় যক্ষ্মা সংক্রমণ হতে পারে?

উ: যে কোনও প্রত্যঙ্গে হতে পারে। শতকরা ১০ ভাগ সম্ভাবনা। তবে ছোটবেলায় বিসিজি টিকা নেওয়া থাকলে সাধাবণত অন্য প্রত্যঙ্গে যক্ষ্মা হয় না।

প্র: কিন্তু বিসিজি টিকা নেওয়া থাকলেও তো অনেক সময় পেটে বা গলায় যক্ষ্মা হয়?

উ: তার কারণ আলাদা। ফুসফুসের যক্ষ্মা খুব জটিল অবস্থায় থাকলে কফ মিশ্রিত থুতুর যতটুকু গলা বা পেটে যায় তা থেকেই ওই দুই জায়গা সংক্রামিত হয়ে যায়।

প্র: অনেকে বলেন ৩ সপ্তাহ বা তার বেশি যদি কাশি থাকে তাহলেই ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত?

উ: অবশ্যই। যক্ষ্মা হোক বা না হোক, ৩ সপ্তাহের ওপর কাশি চলতে থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার।

প্র: যক্ষার ক্ষেত্রেও তো মূল উপসর্গ কাশি?

উ: একেক জনের ক্ষেত্রে একেকটা উপসর্গ বেশি জোরদার হয়। তবে সাধারণভাবে ৩ সপ্তাহের বেশি কাশি, অল্প অল্প জ্বর বিশেষ করে সন্ধের দিকে, বুকে ব্যথা, ওজন কমা, খিদে কমা ইত্যাদি উপসর্গ থাকে। রোগ বেশি দূর এগিয়ে গেলে কাশির সঙ্গে রক্ত আসতে পারে। তবে যক্ষ্মা হয়েছে নিশ্চিতভাবে বলতে গেলে কফ পরীক্ষা একান্ত জরুরি।

কাশির আওয়াজ শুনে রোগ বোঝা যায়

ডাঃ পার্থসারথী ভট্টাচার্য

দূরভাষ : ৯৮৩১০-০৩১৪৪

প্র: খুব কাশি হতে থাকলে কী করব?

উ: গলা খুসখুস করে কাশি হতে থাকলে গরম নুন জল দিয়ে গার্গেল করুন বারবার। আদা, তুলসীপাতার রস মধু দিয়ে খেতে পারেন।

প্র: আদা, গোলমরিচ, লবঙ্গ জলে ফুটিয়ে সেই জল খেলে শুনেছি কাশি ঠিক হয়ে যায়?

উ: ঠিক হয়ে যায় কি না বলতে পারব না। তবে গরম জল এবং আদা আছে বলে খানিকটা আরাম পাবেন।

প্র: আর কাফ সিরাপ?

উ: যদি সেরকম না থাকে ধৈর্য ধরে নুন গরম জল বা বিটাডিন গার্গেল খুব কাজে আসে। আর কাফ সিরাপ যদি খেতেই হয় আগে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে নেবেন।

প্র: একটা কাফ সিরাপ কিনতে আবার ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে?

উ: কাফ সিরাপ দু' রকমের হয়। একটা কফ ওঠায়। একটা বসায়। আপনার হয়তো কফ ওঠানোর সিরাপ দরকার। কিন্তু কিনে বসলেন কফ বসানোর সিরাপ। বা উল্টোটা। অসুবিধে হতে পারে। সেজন্যই ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করা জরুরি।

প্র: সাধারণ ঠাণ্ডা লেগে যেমন কাশি হতে পারে, আবার গুরুতর রোগেরও তো কাশি হয়?

উ: হ্যাঁ, কাশি হয়েছে, প্রয়োজনীয় সাবধানতা নেওয়ার পরও কাশি কমছে না, ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। বিশেষ করে এইসব ক্ষেত্রে—

(১) রাত্রিবেলা বেশি কাশি হলে,

(২) সন্ধের পর থেকে খুসখুস করে কাশি হলে,

(৩) অনেক দিন ধরে একটানা চললে,

(৪) কাশির চরিত্র বদলে গেলে অর্থাৎ দিনে বা রাতে যে সময় কাশি হচ্ছিল, সময়টা বদলে গেল বা কাশির আওয়াজ বদলে গেল অথবা একসঙ্গে দুটোই হল।

(৫) কাশির সঙ্গে রক্ত বা পাকা কফ (যা আসলে কিন্তু পুঁজ) পরলে,

(৬) প্রাথমিক চিকিৎসায় কাশি সারল না বা

(৭) কাশির সঙ্গে ওজন ও খিধে কমছে। সঙ্গে ঘুসঘুসে জ্বর।

প্র: কাশির আওয়াজ শুনে কি কিছু বোঝা যায়?

উ: হ্যাঁ, যেমন, খনখনে কাশির উৎপত্তি গলায়। শ্বাসনালির প্রথম অংশে কোনও সংক্রমণ হলে খনখনে কাশি হয়। শুকনো কাশি সাধারণত সাইনোসাইটিস, শ্বাসনালির সংক্রমণ এবং কিছু ফুসফুসের রোগে দেখা দেয়। একটানা ভিজে কাশির মূলে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া ইত্যাদি কোনও রোগ থাকতে পারে। গলার সংক্রমণে আরেক রকম ঘং ঘং শব্দের কাশি হতে পারে।

প্র: কাশির সঙ্গে একবার রক্ত এলেই কি সেটা যক্ষ্মা?

উ: কাশির সঙ্গে রক্ত এলেই যক্ষ্মা হয়েছে এটা খুব ভুল ধারণা। নানা কারণে রক্ত পড়তে পারে। তবে রক্ত পড়লে কিন্তু সাবধান হবেন।

প্র: কীভাবে?

উ: একে একে বলি।

(১) উত্তেজিত হবেন না।

(২) সোজা হয়ে শোবেন।

(৩) স্বাভাবিক ঠাণ্ডা জল খান।

(৪) ভিক্স বা স্ট্রেপসিল জাতীয় লজেন্স চুষতে থাকুন।

(৫) একটু বেশি রক্ত পড়লে নিজে চলাফেরা না করে বাড়িতে ডাক্তার ডাকুন।

(৬) কিছু ফুসফুসের অসুখে কাশির সঙ্গে রক্ত পড়ে। যদি বাঁ দিকের ফুসফুসে অসুখ থাকে, বাঁ দিক ফিরে শুয়ে থাকবেন। যতক্ষণ না ডাক্তার আসে।

(৭) বেশি রক্ত পড়লে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার।

প্র: রক্ত যদি এক আধবার পড়েই বন্ধ হয়ে যায়, আর কখনও না পড়ে, তাহলেও কি ডাক্তার দেখাতে হবে?

উ: হ্যাঁ দেখাতে হবে।

প্র: কাশতে কাশতে গলা চিরে ও তো অনেক সময় রক্ত পড়ে?

উ: পড়তে পারে। সেক্ষেত্রে রক্ত পড়াটা হয়ত গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু অত কাশি কেন হচ্ছে সেটা জানা জরুরি। অতএব ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।

প্র: কিছু বয়স্ক মানুষ আছেন যাঁদের শীত গ্রীষ্ম বারোমাস কাশি হয়, বিশেষ করে সকালে এবং রাত্রে।

উ: বয়স্ক মানুষদের অল্প হাঁপের টান বা ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে রাত্রে ও সকালে কাশি হবে। শুয়ে থাকলে কাশি হয় অনেকের । নানা কারণে এরকম হতে পারে, বুকের মধ্যে এক ধরনের টিউমার থাকলে, অল্প স্বল্প হৃদরোগে, এমনকি রিফ্লাক্স ইসোফেজাইটিসেও। মাঝরাত্রে শুকনো খুসখুসে কাশি চলতে থাকলে

খোঁজ নিতে হবে তিনি রক্তচাপ কমানোর ওষুধ খান কিনা। এনালাপ্রিল জাতীয় ওষুধে কারোর কারোর কাশি হয়। সিগারেট এবং পরিবেশ দূষণ, ঝগড়া, অশান্তি, পরিশ্রম, মশা মারার ধূপ, রান্নার গ্যাস থেকেও কাশি হতে পারে। কোল্ড ড্রিঙ্কস বিশেষ করে হলুদ রংয়ের, কিছু ব্যথা কমার ওষুধ খেলে কারোর কারোর কাশি ও টান হয়। কাজেই লাগাতার কাশি দূর করতে চাইলে প্রথমে কারণ খুঁজে বার করা দরকার। এছাড়া, বয়স্ক মানুষকে সাধারণভাবেই কয়েকটি বিশেষ সাবধানতা মেনে চলতে হবে। যেমন

(১) ঠাণ্ডার ধাত থাকলে শীতের শুরু থেকেই গলায় পাতলা কাপড় অথবা মাফলার জড়িয়ে রাখুন। পায়ে চটি। শীত বাড়লে মোজা।

(২) ঠান্ডা জলে স্নান করবেন না। শীতকালে হাল্কা গরম, অন্যান্য সময় স্বাভাবিক ঠান্ডা জলে স্নান করুন।

(৩) সিগারেট, বিড়ি, খৈনি, গুড়াকু, পান মশলা ইত্যাদি খাওয়া বন্ধ করুন।

(৪) কোল্ড ড্রিঙ্কস, আইসক্রিম, ঠাণ্ডা দই, পুডিং ইত্যাদিও খাবেন না।

(৫) অল্প কাশির সূত্রপাতেই. দিনে ৪-৫ বার গার্গেল করা শুরু করুন। বেনজোয়িন জাতীয় ওষুধ ফুটন্ত জলে ফেলে তার ভাপ নিন।

(৬) পুরনো রোগ যেমন, ফ্যারিনজাইটিস, সাইনোসাইটিস, ফুসফুসের কোনও অসুখ বা হাঁপানি ইত্যাদি থাকলে সামান্য কাশির সূত্রপাতেই সতর্ক হয়ে যান।

প্র: হাঁপানির টান ওঠার আগে কি কাশি হয়?

উ: অনেকের হয়। সেক্ষেত্রে কাশি শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা ডেরিফাইলিন ট্যাবলেট খেয়ে বা কয়েকবার স্যালবুটামল ইনহেলার স্পেসার দিয়ে নিয়ে ডাক্তারকে খবর দিতে হবে। তাহলে আর বাড়াবাড়ি হবে না।

প্র: ওষুধে এলার্জি থেকেও তো শ্বাসকষ্ট হতে পারে?

উ: হ্যাঁ, এলার্জির ইতিহাস যদি জানা থাকে, খুব কাশি বা শ্বাসকষ্ট হতে দেখলে ডেরিফাইলিন ট্যাবলেট ও স্যালবুটামল ইনহেলাব দেওয়া যায়।

প্র: গর্ভাবস্থায় হলে কী করতে হবে?

উ: গর্ভাবস্থায় সাধারণত আমরা ওষুধ দিতে চাই না। গার্গেল করা, গলায় কাপড় জড়িয়ে রাখা, তুলসী পাতা, মধু, স্ট্রেপসিল, ভিকস্, আদা কুচি, গরম দুধ অথবা আদা গোলমরিচ ফোটানো জল খাওয়া ইত্যাদ্যি সব কিছু হার মানলে ওষুধ দিতে হয় কখনও। তবে এ নিয়ে অত চিন্তার কিছু নেই, বাচ্চা জন্মের পর কাশি নিজে থেকেই ঠিক হয়ে যায়।

প্র: ছোট বাচ্চার কাশি হলে কী করতে হবে? ওদের দিয়ে তো গার্গেল করানো যাবে না।

উ: অন্যান্য সাবধানতা মেনে চলবেন। বেশি ঠাণ্ডা জল খেতে দেবেন না। বারবার কাশি হলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করবেন। হঠাৎ করে প্রচণ্ড কাশি শুরু হলে দেখতে হবে বাচ্চার শ্বাসনালিতে কিছু ঢুকেছে কিনা...

হাঁপানি এড়াতে বিছানার চাদর, বালিশের ওয়ার ফুটন্ত জলে কাচুন

অধ্যাপক (ডাঃ) আলোক গোপাল ঘোষাল

দূরভাষ : ২২৩-১৬১৮

প্র: হাঁপানি তো সারে না?

উ: হ্যাঁ সারে, যদি রোগের সূত্রপাতে অথবা ৬ মাসের মধ্যে চিকিৎসা শুরু করা যায়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগী এত দেরি করে আসেন যে আশানুরূপ সুফল ফলে না।

প্র: দেরি কেন হবে? শ্বাসকষ্ট হলে তো মানুষ ডাক্তারের কাছে যাবেই।

উ: শ্বাসকষ্ট অজস্র কারণে হয়। ব্রঙ্কাইটিস থাকলে হয়, হার্টের সমস্যা হলে হয়। কিন্তু হাঁপানিকে নিয়ে মানুষের মধ্যে এত দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, কুসংস্কার আছে যে ডাক্তার যদি বলেনও হাঁপানি হয়েছে, মানুষ প্রথমে তা মানতে চান না। বিভিন্ন ডাক্তারের কাছে ঘুরে ফিরে, বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতি অনুযায়ী ওষুধ পত্র খেয়ে শেষ পর্যন্ত যখন হাঁপানির যথাযোগ্য চিকিৎসার জন্য আসেন, সময়ই যথেষ্টই দেরি হয়ে গেছে।

প্র: দেরি হয়ে গেলে আর সারানো যায় না?

উ: হাঁপানি দীর্ঘদিন ধরে অচিকিৎসিত থেকে গেলে শ্বাসনালিব কিছু স্থায়ী ক্ষতি হয়। সেই সব ক্ষতিপূরণ না করা গেলেও রোগ শুরু হওয়ার বছর পাঁচেকের মধ্যে এলে সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপনের উপযোগী করে দেওয়া যায়। তার থেকেও দেরি হলে চলনসই সুস্থতা ফিরিয়ে দেওয়া যায়। তবে চিকিৎসা নিয়মিত চালিয়ে যেতে হবে।

প্র: চিকিৎসা মানে তো স্টেরয়েড?

উ: হ্যাঁ, হাঁপানির চিকিৎসায় মূল ওষুধ কর্টিকোস্টেরয়েড। স্টেরয়েডের কিছু কুফল অবশ্যই আছে। তবে ওষুধ প্রয়োগের ধরন পাল্টে আমরা তার অনেকটাই কমিয়ে আনতে পেরেছি।

প্র: কী রকম?

উ: পাফ্ ব্যবহার করে। আসলে রোগটা তো শ্বাসনালি ফুসফুসকে ঘিরে। কাজেই ওষুধ

যদি সরাসরি শ্বাসনালিতে প্রয়োগ করা হয়, কাজও ভাল হবে, আর শরীর জুড়ে প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারটাও কমবে।

প্র: বোঝা গেল না।

উ: ধরুন আপনি স্টেরয়েড ট্যাবলেট খেলেন, পাকস্থলী থেকে শোষিত হয়ে সে যাবে রক্তে। রক্তের মাধ্যমে সারা শরীরে এবং ফুসফুসে। সমস্ত শরীরে এর প্রভাব পড়বে। ওষুধের মাত্রাও রাখতে হবে বেশি। সেক্ষেত্রে সরাসরি ওষুধ শ্বাসনালিতে স্প্রে করে দিলে ওষুধ কম। শরীরেব অবাঞ্ছিত উপদ্রবগুলি ঠেকিয়ে রাখা যাবে।

প্র: অবাঞ্ছিত উপদ্রব বলতে?

উ: স্টেরয়েড দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিত খেলে কয়েকটি অসুবিধে দেখা দিতে পারে। (১) রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে, (২) ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, (৩) পেটে আলসার, (৪) মোটা হয়ে যাওয়া, (৫) শরীরে লোমের আধিক্য হওয়া এমনকি (৬) এমন কি যক্ষ্মা হওয়ার সম্ভাবনাও দেখা দিতে পারে।

প্র: যক্ষ্মাও তো ফুসফুসের অসুখ। সেক্ষেত্রে সবাসরি ওষুধ স্প্রে করলে যক্ষ্মার সম্ভাবনা বাড়তে পারে না?

উ: তাত্ত্বিক ভাবে সম্ভাবনা আছে। তবে বাস্তবে এরকম ঘটনাব সংখ্যা খুবই নগণ্য।

প্র: তাহলে কি শ্বাসকষ্ট হলেই পাফ নেওয়া যাবে?

উ: এই ব্যাপারটা একটু ভালভাবে বোঝা দরকার। পাফ দু'রকমের। একটা রোগ সারায়, একটা উপসর্গ কমায। কর্টিকোস্টেরযেড ইনহেলার রোগ সারানোর কাজে লাগে। শ্বাসনালির প্রদাহকে যদি আগুন হিসেবে ভাবি, স্টেরয়েড সেখানে জলের কাজ করে। আগুন নেভায়। স্যালবুটামল, টারবুটালিন ইনহেলার তাৎক্ষণিক কাজে আসে। হঠাৎ করে শ্বাসকষ্ট শুরু হল, দু'চারটে পাফ নিলে সঙ্গে সঙ্গে আরাম পাওয়া যায়। অতএব প্রতিদিন নিয়ম করে স্টেরয়েড পাফ নিতে হবে। এবং এর সঙ্গে কখনও কখনও অ্যান্টি হিস্টামিনিক অর্থাৎ অ্যালার্জি কমানোর ওষুধ, যেমন সেট্রিজিন বা ফেক্সোফেনাডিন নিয়মিত খেলে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়। তা সত্ত্বেও কষ্ট বাড়লে স্যালবুটামল বা টারবুটালিন নিতে হবে। কিন্তু বাস্তবে হয় ঠিক এব উল্টোটা। স্টেরয়েড নিয়ে মানুষেব মনে ভয় ভীতি আছে, এর খবচ তুলনামূলকভাবে বেশি এবং ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে উপসর্গ কমে না, ফলে আমরা বারবার বলা সত্ত্বেও অনেকেই স্টেরয়েড ব্যবহার না করে নিয়মিত স্যালবুটামল জাতীয় পাফগুলিই ব্যবহার করেন। ফলে বাড়াবাড়ি হলে সামলাতে হিমশিম খেতে হয়।

প্র: ছোট বাচ্চাদেরও স্টেরয়েড পাফ নিতে হবে?

উ: হ্যাঁ।

প্র: বাচ্চাদের হাঁপানি তো অনেক সময় সেরেও যায়?

উ: ঠিকভাবে চিকিৎসা হলে শতকরা ৬০ ভাগ ক্ষেত্রে অসুখ পুরোপুরি সেরে যায়। ব্যাপারটা কী রকম জানেন, সহ্য হয় না এমন মানুষের সঙ্গেও যেমন অনেকদিন থাকতে থাকতে কাজ চালানো গোছের একটা বন্ধুত্ব হয়ে যায় সেরকম।

প্র: তার মানে রোগটাকে শরীর মেনে নিল?

উঃ না এরকম নয়। হাঁপানি হয় অ্যালার্জি থেকে। অথাৎ কোনও একটা জিনিস শ্বাসনালি সহ্য করতে পারছে না। কিন্তু তাকে বারবার বাধ্য হয়ে সেই জিনিসেরই মুখোমুখি হতে হচ্ছে। ফলে প্রদাহ হচ্ছে শ্বাসনালিতে । প্রদাহের ফল হাঁপানি। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় কিছুদিন চিকিৎসা চলাব পর শ্বাসনালির অসহ্য জিনিসটাকে মোটামুটি ভাবে মেনে নেয়। বোগের কাবণ দূর হওয়ার ফলে রোগ সেরে যায়।

প্রঃ অনেকে তো কিছুদিন ভাল থাকার পর আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন?

উঃ এরকম বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বাচ্চাদেব বেলায় হয়। ছোট বেলায় রোগ হল সেবেও গেল। আবাব দেখা দিল ৩০-৪০ বছর বয়সে।

প্রঃ তার মানে ছোটবেলার রোগটাই আবার রিল্যাপস্ কবল? ঠিকভাবে চিকিৎসা না হলে কি এরকম হয়?

উঃ ঠিক তা নয। এটা বোগেব একটা ধবন। শতকবা ১০ভাগ ক্ষেত্রে এরকম হয।

প্রঃ আর বাকি ৩০ ভাগ বড়দেব?

উঃ ঠিক তাই।

প্রঃ তার মানে কোনও জিনিসেব প্রতি হঠাৎ করে অ্যালার্জি দেখা দিল?

উঃ হাঁপানি বা অ্যালার্জির কারণ কিন্তু দুটো। বংশগত এবং পবিবেশগত। হয়ত কারও শরীর কোনও জিনিসেব প্রতি অ্যালার্জিক কিন্তু জিনিসটা যতক্ষণ তার কাছে উপস্থিত না হচ্ছে ততক্ষণ তো অ্যালার্জি হতে পাববে না। এর তৃতীয় একটি দিকও আছে। কার কোন জিনিসে কবে থেকে অ্যালার্জি দেখা দেবে সেটা পূর্ব নির্ধারিত। আজ দুধে বা ডিমে অ্যালার্জি নেই বলে ১০ বছব বাদে হবে না এমন কোনও কথা নেই।

প্রঃ দুধে বা ডিমে অ্যালার্জি হলে তো হয পেটখাবাপ হবে নয়তো গায়ে আমবাত।

উঃ একেক জিনিস একেক জনেব ক্ষেত্রে একেক জায়গায অ্যালার্জি কবে। চামড়ায় আমবাত বা আর্টিকেরিযা থেকে শুরু কবে সর্দিকাশি, পেট খারাপ এমনকি হাঁপানিও হওযা সম্ভব।

প্রঃ কীসে অ্যালার্জি আছে কী করে বোঝা যাবে, অ্যালার্জি টেস্ট করে?

উঃ না, অ্যালার্জির প্রবণতা থাকলে ভালভাবে খেযাল করতে হবে কী খেলে সমস্যা বাড়ে। ডিম, দুধ, চিংড়ি মাছ, কাঁকড়া, পুঁইশাক, অড়হড় ডাল ইত্যাদি থেকে কাবও কাবও অ্যালার্জি হয। কিছু ওষুধ যেমন পেনিসিলিন, সালফার ড্রাগ, অ্যাসপিরিন ইত্যাদিতে অ্যালার্জি থাকতে পাবে। আর ধোঁয়া ধুলো থেকে তো অনেকেরই হয়।

প্রঃ খাওয়া দাওয়া, ওষুধপত্রের ব্যাপাবে না হয় সাবধান হওযা যায়, ধোঁয়া, ধুলো এড়ানো যাবে কীভাবে?

উঃ হাঁপানিব ক্ষেত্রে বাইবেব ধোঁয়া বা দূষণেব থেকে কিন্তু বেশি দায়ী ঘবেব ভেতবকাব দূষণ। তাব মধ্যে সবাব প্রথমে রয়েছে ডার্মাটোফাইট নামে আমাদের চাদর বালিশেব ফাঁকে লুকিযে থাকা এক ধবনেব ছত্রাক। সেজন্য অনেকেব বিছানা ঝাড়াঝাড়ি করলেই হাঁচি সর্দি শুরু হয়ে যায়। অ্যালার্জি যদি সরাসরি শ্বাসনালিতে গিয়ে উপস্থিত হয় হাঁপানিও হতে পারে।

ডার্মাটোফাইট দূর করতে সপ্তাহে একবার কি দু'বার বিছানার চাদর, বালিশের কভার

ফুটন্ত জলে কাচতে হবে। ট্যানিক অ্যাসিড মেশানো জল দিয়ে চাদর, বালিশের কভার ধুলেও ভাল ফল হবে। এতে কাজ না হলে বিছানার ওপর পলিথিন বিছিয়ে তার ওপর শুতে হবে।বেড়াল কুকুর থেকেও অ্যালার্জি হওয়া সম্ভব। যাঁদের হাঁপানি বা অ্যালার্জি আছে তাঁদের ঘরে কুকুর বেড়াল থাকা উচিত নয়। আরশোলা যত নির্মূল করা যায় তত ভাল।

প্র: বাচ্চাদেরও কি এসমস্ত কারণের জন্যই হাঁপানি হয়?

উ: বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হাঁপানির কারণ অধিকাংশ সময় গরুর দুধ। অন্যান্য কাবণের জন্যও হতে পারে।

প্র: গরুর দুধ বন্ধ করে দিলে হাঁপানি সেরে যাবে?

উ: যদি জানা যায় যে বাচ্চার অ্যালার্জি বা হাঁপানি শুধুমাত্র গরুর দুধের জন্য হচ্ছে, দুধ বন্ধ করলে অবশ্যই উপকার পাওয়া যাবে।

প: একজনের কি একাধিক কারণের জন্য হাঁপানি হতে পারে?

উ: যাঁদেব অ্যালার্জির প্রবণতা আছে তাঁদের অনেক সময়ই একাধিক জিনিসে অ্যালার্জি থাকে।

প্র: হাঁপানি কি ছোঁয়াচে? বাড়িতে যে অনেক সময় একসঙ্গে একাধিক জনের দেখা যায়?

উ: না, হাঁপানি ছোঁয়াচে নয়। বংশগত বলে এক পবিবাবেব অনেকেব মধ্যে দেখা দিতে পারে।

প্র: সেক্ষেত্রে তো বিয়ের ব্যাপাবে সাবধান হওয়া দবকার?

উ: হাঁপানি থাকলে বিয়েতে কোনও বাধা নেই। তাব কাবণ বংশগত কারণে যদি কাবও মধ্যে হাঁপানিব প্রবণতা থাকে, পবিবেশগত কারণ আয়ত্তে রাখলে তার সম্ভাবনা কমবে। এবং যথাসময়ে সঠিক চিকিৎসা চালু করে দিলে হাঁপানি সেরে যাবে বা খুব ভাল ভাবে আয়ত্তে থাকবে।

প্র: কী দেখে বোঝা যাবে যে হাঁপানি হয়েছে বা হতে পারে?

উ: রোগী যখন আসেন আমাদের কাছে তখন শুধু তাঁকে নয় পবিবারের অন্যদের শারীরিক অবস্থার কথাও জানতে চেষ্টা করি। এতে রোগ বোঝা সহজ হয়। যেমন কোনও বাচ্চা এসেছে শ্বাসকষ্ট নিয়ে, যদি দেখা যায় তাব মা বাবা ভাই বোনের মধ্যে কারও অ্যালার্জির প্রবণতা আছে অর্থাৎ ধোঁয়া ধুলোতে হাঁচিকাশি হয় বা আমবাত, বাচ্চার শ্বাসকষ্টের মূলে হাঁপানি থাকার খুবই সম্ভাবনা।

শ্বাসকষ্ট ছাড়া অন্য কোনও উপসর্গ নেই। কিন্তু কথা বলে জানা গেল কোনও বিশেষ বিষয়ে অ্যালার্জি আছে। সেটা ওষুধেও হতে পারে। ধোঁয়া ধুলো, খাবার দাবার এমনকি কুকুর বেড়ালেও হতে পারে। এই শ্বাসকষ্টের হাঁপানির প্রারম্ভিক উপসর্গ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

শ্বাসকষ্ট সঙ্গে বুকে সাঁই সাঁই আওয়াজ — অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হাঁপানি।

শুকনো কাশি বিশেষ করে রাত্রের দিকে বাড়ে, শতকরা ৭০ ভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু হাঁপানির সূত্রপাতের জন্য হতে পারে। কিন্তু অনেক সময়ই যক্ষ্মা হিসেবে চিকিৎসিত হয়। ফলে রোগ জটিল হয়ে যায়।

ছোট বাচ্চাদের মাঝে মধ্যেই জ্বর সর্দি কাশি হলে ভাল করে ডাক্তার দেখানো দরকার। অনেক সময় হাঁপানির জন্য এরকম হয় বা অবহেলো করলে। এ থেকে হাঁপানি হয়ে যায়। কারণ বসে বা দাঁড়িয়ে থাকলে সর্দি যেমন বাইরে বেরিয়ে যায়, শুয়ে থাকলে কিন্তু তা হয় না। শ্বাসনালির পথ বেয়ে ফুসফুসের দিকে গিয়ে হাঁপানির সূচনা করতে পারে। অবশ্য যদি বংশগত কারণে হাঁপানি হওয়ার প্রবণতা থাকে তবেই। তবে এক্ষেত্রেও অনেক সময় যক্ষ্মার চিকিৎসা হতে থাকে। ফলে রোগ মারাত্মক পর্যায়ে চলে যায়।

প্র: যক্ষ্মার সঙ্গে গুলিয়ে যাওয়ার কারণ কী? হাঁপানি বোগ নির্ণয় করা কি খুবই কঠিন?

উ: না, কঠিন কিছু নয়, শুধুমাত্র লাং ফাংশন টেস্ট বা আরও কম খরচে পিক ফ্লো মিটার টেস্ট করেই ফুসফুসের কার্যকারিতা কমেছে কিনা বুঝতে পারা যায়। এর সঙ্গে সামান্য কিছু রক্ত পরীক্ষা, বিশেষ করে রক্তের ইওসিনোফিল বেড়েছে কিনা সেটা দেখা যেতে পারে। ইওসিনোফিল নানা কারণে বাড়ে। হাঁপানিও তার মধ্যে একটি। কিছু ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয়ে অসুবিধে হলে যক্ষ্মা আছে কি নেই তা জানবার জন্য বুকের এক্স-রে করার দরকার হতে পাবে।

প্র: শীতে, বর্ষায় হাঁপানির বাড়াবাড়ি হয়?

উ: আর্দ্র আবহাওয়ায় ডার্মাটোফাইটের বাড় বাড়ন্ত। কাজেই যাঁদের হাঁপানি আছে বর্ষাকালে, একটু অসুবিধে হতে পাবে। এছাড়া হাঁপানি রোগীর মাথা শুকনো এবং ঢাকা থাকা জরুরি। নাহলে মাথায় ঠাণ্ডা লাগবে। তার প্রভাব পড়বে বুকে।

প্র: রোগের বাড়াবাড়ি হলে কী করতে হবে?

উ: বাড়াবাড়ি হলে কী করতে হবে সেটা জানার আগে জানা দরকার বাড়াবাড়ি কীভাবে বুঝতে হবে। এমন অনেক রোগী অহরহ পাই যাঁরা বাড়াবাড়ি হচ্ছে বুঝতে না পারার দরুণ আচমকা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। এর মূলে রয়েছে এক জটিল শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া। শরীর যখন কষ্টের ভার আর বইতে পারে না, কষ্ট বোধ করার অনুভূতিটাকে ভোঁতা করে দেয। ফলে শরীর যে পরিমাণে খারাপ হতে থাকে রোগীর কষ্ট কিন্তু অনেক সময় সেই পরিমাণে হয় না। ফলে আচমকা এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে রোগী মারাও যেতে পারেন। তাই বাড়াবাড়ি চিনতে সতর্কতা দরকার।

হাঁপানি যখন বাড়তে থাকে বুকে চাপ অনুভব করেন রোগী। এবং নিঃশ্বাসের সঙ্গে সাঁই সাঁই আওযাজ বেড়ে যায়। অনেকে এটা ধরতে পারেন না বলে হাঁপানি রোগী মাত্রেই একটা পিক ফ্লো মিটার কিনে নেওয়া উচিত এবং বুকে সামান্য চাপ ভাব বা শ্বাসের আওয়াজ দেখা দিলেই পিক ফ্লো মিটার টেস্ট করে দেখে নেওয়া দরকার ফুসফুসের কার্যক্ষমতা কোন্ জায়গায় রয়েছে।

পিক ফ্লো মিটাব যদি বলে শরীর খারাপ হতে চলেছে বা হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে । এই অবস্থায় নিজে কিছু করতে যাওয়া বিপজ্জনক হতে পারে।

প্র: অনেকের তো শীতে বা বর্ষায় ঘন ঘন কষ্ট বাড়ে। ঘরে নেবুলাইজার মেশিন কিনে নিলে কি সমস্যার সমাধান হবে?

উ: নেবুলাইজ করার অর্থ স্যালবুটামল জাতীয় ওষুধ অনেক বেশি মাত্রায় সরাসরি

220
616 8849

শ্বাসনালীতে ঢুকিয়ে দেওয়া। রোগীর যখন আর পাফ টানার ক্ষমতা থাকে না তখনই এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। নেবুলাইজার কীভাবে কোনমাত্রায় দিতে হবে সেটা বাড়ির লোক শিখে নিলে মেশিন কেনা যেতে পারে। রাতবিরেতে কাজে আসবে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাড়াবাড়ি হলে শুধু নেবুলাইজেশনে কাজ হয় না। কর্টিকোস্টেরয়েড ইনজেকশন দিতে হতে পারে। অক্সিজেন তো অতি অবশ্যই দিতে হয়। অতএব ডাক্তারের উপস্থিতি জরুরি। বেশি বাড়াবাড়ি হলে অবস্থা কিছুটা সামলে নেওয়ার পর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াই ভাল।

প্র: বাড়াবাড়ি হলে ঘুমের ওষুধ দেওয়া যেতে পারে?

উ: একদম নয়। কারণ ঘুমের ওষুধ শ্বাসপ্রশ্বাসের হার, অক্সিজেন পরিবহণ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। যার ফল মারাত্মক হতে পারে।

প্র: একজিমা সেরে গেলে নাকি হাঁপানি হয়?

উ: না, ঠিক তা নয়। হাঁচি, হাঁপানি বা একজিমা তিনটিই একই গোত্রের অসুখ। কোনও পরিবারে এক ভাই বা বোনের হাঁপানি থাকলে অন্য জনের একজিমা থাকতে পারে। আবার কখনও ছোট বয়সে একজিমা ছিল, বড় হয়ে তাঁরই হাঁপানি হল। তার মানে এই নয় যে একটা অসুখ সেরে গেল বলে আরেকটা দেখা দিল।

প্র: হাঁপানির সঙ্গে অন্যান্য অসুখও কি আসতে পারে?

উ: হাঁপানির সঙ্গে ঘনঘন সর্দি হওয়া, হাঁচি, মাথা ধরা প্রভৃতি প্রায়ই দেখা যায়। এছাড়াও বেশির ভাগ হাঁপানি রোগী ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম নামের পেটের অসুখে ভোগেন।

প্র: যাঁদের হাঁপানি আছে তাঁরা কী কী সাবধানতা মেনে চলবেন?

উ: যদি কারও ঠাণ্ডায় অ্যালার্জি থাকে তাহলে তাঁর ঠাণ্ডা থেকে সাবধান হওয়া প্রয়োজন। মাথা বেশি সময় ভেজা রাখা চলবে না। শীতকালে মাথা ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে। কলা থেকে অধিকাংশ মানুষের এলার্জি হয় বলে হাঁপানি রোগীদের কলা খেতে বারণ করা হয়। অন্যান্য খাবার দাবারে যাঁর যেমন অ্যালার্জি আছে তেমন তেমন বাদ দিতে হবে। ধূমপান করার প্রশ্নই নেই, ধারে কাছেও যেন কেউ না করেন। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ধূমপান কতখানি ক্ষতিকর তা বলি, গর্ভাবস্থায়ও যদি কেউ পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হন, গর্ভস্থ ভ্রূণের হাঁপানি হতে পারে।

উচ্চ রক্তচাপ আয়ত্তে না রাখলে মৃত্যুও হতে পারে

অধ্যাপক (ডাঃ) অবনী রায়চৌধুরী

প্রঃ কী করে বুঝব রক্তচাপ বেড়েছে, ডাক্তার দেখাতে হবে?

উঃ অনেক সময় বুঝতে পারা যায় না। অন্য কোনও কারণে ডাক্তার দেখাতে গিয়ে জানতে পারা যায় রক্তচাপ বেড়েছে। এছাড়া কিছু উপসর্গ আছে যা অনেক সময় রক্তচাপ বাড়ার জন্যও হতে পারে। যেমন,

(১) মাথাব্যথা, বিশেষ করে মাথার পেছন দিকে ব্যথা, অনেক সময় সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর মাথা ব্যথা আরম্ভ হয়। দু' চার ঘণ্টা পরে আবার কমে যায়।

(২) মাথা ঘোরা

(৩) বুক ধড়ফড় করা

(৪) মনঃসংযোগের অভাব

(৫) ক্লান্তি

(৬) অল্প কাজে হাঁপ ধরা

(৭) মাংসপেশির দুর্বলতা

(৮) পা ফোলা

(৯) বুক ব্যথা

(১০) নাক দিয়ে রক্ত পড়া

প্রঃ যে কোনও বয়সেই এই জাতীয় সমস্যা দেখা দিলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করা জরুরি?

উঃ অবশ্যই। তবে সবসময় রক্তচাপ বাড়ার জন্যই এরকম হয় তা নয়। অন্য কারণেও হতে পারে।

প্রঃ কত বছর বয়স থেকে রক্ত চাপের ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত?

উঃ কোনও অসুখ বিসুখ না থাকলে মোটামুটি ৩০-৩৫ বছর বয়সের পর থেকে কিছু সাবধানতা মেনে চলা ভাল।

প্রঃ অসুখ বিসুখ বলতে?

উঃ কিডনি বা এন্ডোক্রিন গ্ল্যান্ডের কিছু অসুখে রক্তচাপ বাড়ে। আরও কিছু অসুখ আছে

যেমন কোয়ার্কটেশন অফ এওরটা, পরফাইরিয়া, হাইপার ক্যালসিমিয়া ইত্যাদি রোগেও রক্তচাপ বাড়ে।

প্র: কোনও অসুখ ছাড়াও রক্তচাপ বাড়তে পারে?

উ: শতকরা ৯৫ ভাগ ক্ষেত্রে রক্তচাপ বাড়ার কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এই ধরনের রক্তচাপ পরিবারের একাধিক সদস্যের মধ্যে থাকে। অর্থাৎ অনেক সময়ই বংশানুক্রমে বাহিত।

প্র: গর্ভাবস্থাতেও তো অনেক সময় রক্তচাপ বাড়ে?

উ: হ্যাঁ। এবং অধিকাংশ সময় সন্তান জন্মের পর রক্তচাপ আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়।

প্র: ব্যথা কমার ওষুধ খাওয়াকালীন রক্তচাপ বাড়তে পারে?

উ: শুধু ব্যথা কমার ওষুধ নয়, স্টেরয়েড, অ্যাড্রিনালিন, জন্মনিরোধক ট্যাবলেট ইত্যাদি খেলেও সেই সময়ের জন্য রক্তচাপ বাড়ে। ওষুধ বন্ধ করার পর আবার ঠিক হয়ে যায়।

প্র: রক্তচাপ কত হলে ওষুধ খাওয়া শুরু করতে হবে?

উ: ২০-৪০ বছর বয়সের কোনও মানুষের রক্তচাপ ১৪০/৯০ এর ওপরে হলে সে উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত বলা হয়। এর আবার তিনটে ভাগ আছে অল্প, মাঝারি আর মারাত্মক। ১৪০/৯০ থেকে ১৫৯/১০৪ এর মধ্যে হলে উচ্চ রক্তচাপ অল্পমাত্রায় আছে। ১৬০/১০৫-১৯৯/১১৪ মাঝারি এবং ২০০/১১৫ হলে মারাত্মক। মাঝারি এবং মারাত্মক উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের ওষুধ খেতে হবে। মৃদু উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের ক্ষেত্রে দ্বিমত আছে। অনেক সময় এঁদের ওষুধ না দিয়ে জীবনযাত্রার নিয়ম কানুন মেনে চলতে বলা হয়।

প্র: জীবনযাত্রার নিয়ম কানুন বলতে?

উ: জীবন যাত্রার ধরনে সামান্য হেরফের ঘটিয়ে রক্তচাপ আয়ত্তে রাখা। যেমন,

(১) ওজন ঠিক রাখা। উচ্চতার সঙ্গে ওজনের একটা সম্পর্ক আছে। যেমন, ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি উচ্চতার যুবকের ওজন হওয়া উচিত ৬০-৬৫ কেজির মধ্যে। যে শুয়ে বসে দিন কাটায় তার ৬০ এর মধ্যে হওয়া ভাল। খাটিয়ে মানুষের ক্ষেত্রে ৬৫।

(২) দিনে অন্তত ২ কিলোমিটার একটানা হাঁটতে হবে। ৪৫ মিনিটের মধ্যে। 'একটানা' কথাটা খেয়াল রাখা দরকার। অনেকেই এসে বলেন, ডাক্তারবাবু, দিনে তো কত হাঁটি! যতই হাঁটুন, একটানা একটা নির্দিষ্ট গতিতে না হাঁটলে ফল পাবেন না।

(৩) খাওয়া দাওয়া বুঝে শুনে করতে হবে।

(ক) কাঁচা নুন একদম খাওয়া যাবে না। রান্নাতেও নুন কম দিতে হবে।

(খ) যে খাবারে ওজন এবং কোলেস্টেরল বাড়ে, যেমন, মিষ্টি আলু, ঘি, মাখন, ডালডা, ডিমের কুসুম, পাঠার মাংস, ভাজাভুজি, তৈলাক্ত খাবার ইত্যাদি না খাওযাই ভাল।

(৪) মানসিক চাপ, টানাপোড়েন এড়িয়ে চলতে হবে। দরকার হলে সাইকলোজিকাল কাউন্সেলিংয়ের সাহায্য নিতে হবে। চাপ বেশি বেড়ে গেলে রাত্রে খাওয়ার ১৫ মিনিট আগে একটা করে অ্যালপ্রাজোলাম ট্যাবলেট খাওয়া যেতে পারে।

(৫) সিগারেট, জর্দা, দোক্তা, অর্থাৎ যে কোনও তামাক জাতীয় জিনিস পুরোপুরি ছেড়ে দিতে হবে।

(৬) কিছু ওষুধ যেমন গর্ভনিরোধক বড়ি, কর্টিকোস্টেরয়েড, ব্যথা কমার ওষুধ (এন এস এ আই ডি) জাতীয় ওষুধ রক্তচাপ বাড়াতে পারে। কাজেই এদের ত্যাগ করা ভাল।

প্র: তেলের কথা কিছু বললেন না? রক্তচাপ বেশি থাকলে সূর্যমুখী তেল শুনেছি ভাল।

উ: সূর্যমুখী তেল খাওয়া যায়। সর্ষের তেল, বাদাম তেল, সাফোলা — খাওয়া যায় যে কোনওটাই। কোনও বিশেষ ব্যাপার নেই। তবে একটা বয়সের পর তৈলাক্ত জিনিস যত কম খাওয়া যায় ততই ভাল।

প্র: আর ডাবের জল?

উ: ইচ্ছে হলে খাবে।

প্র: এমন কিছু খাবার নেই যা খেলে রক্তচাপ কমে?

উ: আগে ভাল ওষুধপত্র ছিল না। লোকে দুধভাত খেত। ক্যালসিয়াম বেশি আছে যে সমস্ত খাবারে যেমন, দুধ, ছানা, ছোট মাছ, পেঁয়াজ ইত্যাদি খাওয়া যেতে পারে। তবে এগুলি কিন্তু ওষুধের কাজ করবে না। দরকার হলে ওষুধ খেতে হবে।

প্র: কিন্তু রক্তচাপ ঠিক হয়ে গেলেও যে আপনারা ওষুধ বন্ধ করতে দেন না?

উ: ওষুধ বন্ধ করতে দিই না তার কারণ উচ্চ রক্তচাপ সারে না। ওষুধ খেলে আয়ত্তে থাকে। তাই অনেকে মনে করেন সেরে গেছে। হঠাৎ করে ওষুধ বন্ধ করলে না। রক্তচাপ দ্বিগুণেরও বেশি বেড়ে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

প্র: কী রকম দুর্ঘটনা?

উ: উচ্চ রক্তচাপের ব্যাপারে একটা কথা চালু আছে। রক্তচাপ পুশে রাখলে— Pump may fail, Filter may stop, Tube may burst. অর্থাৎ হার্টফেল হতে পারে, কিডনি তার কার্যকারিতা হারাতে পারে বা স্ট্রোক অর্থাৎ মাথার কোনও শিরা ছিড়ে যেতে পারে। মারাত্মক হলে ফল মৃত্যু।

প্র: এইসব ওষুধের তো নানারকম কুফলও আছে।

উ: কুফল সুফলের বিচার করেই ওষুধ দেওয়া হয়। ওষুধও নানারকম। একেকজনের ক্ষেত্রে একেকটা কাজে আসে। তা সত্ত্বেও ওষুধ খাওয়া কালীন কিছু অসুবিধে দেখা দিতে পারে। যেমন,

(১) রক্তচাপ হঠাৎ করে কমে যাওয়া

(২) মাথা ব্যথা, ঘোরা

(৩) কাশি

(৪) পা ফোলা

(৫) স্বাভাবিক বিবাহিত জীবনযাপনে অনীহা ইত্যাদি। এরকম হলে তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

প্র: রক্তচাপ খুব বেশি ওঠানামা করা খারাপ?

উ: নিশ্চয়ই। খুব বেশি টানাপোড়েনে ভোগেন যাঁরা তাঁদের ক্ষেত্রে এরকম হতে পারে। ওষুধপত্র ঠিকঠাক না খেলেও এরকম হয়।

প্র: সব রকম চিকিৎসা চলছে অথচ রক্তচাপ কমছে না এরকমও হতে পারে?

উ: সম্ভাবনা কম। তবে কিছু ক্ষেত্রে হয়। বিশেষত, রোগী যদি

(১) ঠিকমতো ওষুধ না খান

(২) বেশি নুন খান

(৩) ওজন বাড়তে থাকে

(৪) অন্য কোনও ওষুধ, যেমন জন্ম নিরোধক বড়ি, স্টেরয়েড, এফিড্রিন ইত্যাদির কোনও একটা খান

(৫) অন্য কোনও রোগের কারণে উচ্চ রক্ত চাপ থাকে

প্র: একই মানুষ, বিভিন্ন জায়গায় রক্তচাপ মাপিয়ে দেখা যায় বিভিন্ন হয়। এটা কি যন্ত্রের ত্রুটি?

উ: নানা কারণে এরকম হতে পারে। প্রথমত, একই মানুষের রক্তচাপ দিনের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম হতে পারে। অফিসের মিটিংয়ের সময় যা রক্তচাপ, আরাম করে বই পড়া বা বিশ্রাম করার সময় তা থাকে না। চাপা মানসিক অশান্তি চললেও রক্তচাপ বেড়ে যায়। সেজন্য রক্তচাপ মাপবার আগে মিনিট ১৫ শুয়ে থাকা এবং চা বা সিগারেট না খাওয়া নিয়ম। সব সময় এভাবেই রক্তচাপ মাপালে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম। কেউ যদি বসে রক্তচাপ মাপান, সবসময় সেভাবেই মাপালে চাপ মোটামুটি এক থাকবে। যন্ত্র সবসময় একই ধরনের ব্যবহার করা ভাল। অনেক সময় দেখা যায় নার্স রক্তচাপ মাপলে যা হচ্ছে, ডাক্তার মাপলে তা বেড়ে যাচ্ছে। একই মানুষ, একই মেশিন, একই অবস্থায়। ডাক্তার মাপলে অনেক সময় রোগীর মানসিক চাপ বেড়ে যায়। তাই এরকম হয়। সবথেকে ভাল রোগী যদি নিজে একটি যন্ত্র কিনে নেন। নিজের মেশিনে পরিচিত মানুষ রক্তচাপ মাপলে এদিক ওদিক হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে।

হৃদরোগের প্রবণতা এড়াতে নিয়মিত ধ্যান বা যোগাসন করুন

ডাঃ কিশোর সিন্‌হা

দূরভাষ : ২৪৪-২৮৬৮

প্র : বংশগত কারণে হৃদরোগ হতে পারে?

উ : বাবা বা মা কারোর যদি হৃদরোগ থাকে এবং তাঁদের কেউ যদি এই রোগে ৫০-৫৫ বছরের আগে মারা যান তবে তাঁদের ছেলেদের এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি।

প্র : কেন, মেয়েদের এ রোগ হয় না?

উ : হয় না, নয়। তবে মেয়েদের একটা সুবিধে আছে। মেনোপজের আগে পর্যন্ত ইস্ট্রোজেন হর্মোনের প্রভাব থাকায় হওয়ায় সম্ভাবনা কম থাকে। তবে দুইএর বেশি 'রিস্ক ফ্যাক্টর' থাকলে মেয়েদেরও হতে পারে।

প্র : রিস্ক ফ্যাক্টর বলতে?

উ : মোট ১০টি কারণ আছে যার মধ্যে ২-এর বেশি যদি কারোর মধ্যে দেখা যায় তাঁর ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এগুলিই রিস্ক ফ্যাক্টর। যেমন

(১) বংশগত কারণ অর্থাৎ মা-বাবা বা রক্তের সম্পর্কযুক্ত আত্মীয়দের মধ্যে কারোর যদি এই রোগ থাকে

(২) খুব বেশি ওজন

(৩) ডায়াবেটিস

(৪) উচ্চ রক্ত চাপ

(৫) রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি থাকা

(৬) হাইপোথাইরয়েডিজম

(৭) ধুমপান করা

(৮) নড়ে চড়ে না বসার অভ্যেস

(৯) বয়স এবং

(১০) ছেলে হয়ে জন্মানো

প্র : দুইয়ের বেশি রিস্ক ফ্যাক্টর হৃদরোগের সম্ভাবনা তৈরি করে। কিন্তু জন্মগত কারণ, বয়স এবং ছেলে হয়ে জন্মানো— এই তিনটে তো আর পরিবর্তন করা যাবে না।

সে ক্ষেত্রে হৃদরোগের সম্ভাবনা এড়াব কী ভাবে?

উ : এই তিনটে কারোর মধ্যে থাকলেই তাঁর ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজ হবে এমন কোনও কথা নেই। তবে তাঁর ক্ষেত্রে সাবধানতার মাত্রা বাড়বে।

প্র : কী রকম?

উ : ছোট থেকেই কিছু সুঅভ্যেস গড়ে তুলতে হবে।

(১) নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন। যেমন, ভোরে ওঠা, দেরি করে না শোয়া। সপ্তাহের ছুটির দিন একটু মাটির কাছাকাছি কাটানো, বাগান করা বা কাছে পিঠে কোথাও ঘুরে আসা অথবা পছন্দ সই কিছু করে সময় কাটানো।

(২) নিয়মিত ধ্যান এবং যোগাসন অভ্যেস করা।

(৩) নিয়মিত খেলাধুলা করা। সম্ভব না হলে ব্যায়াম। নিদেন পক্ষে প্রচুর হাঁটাহাটি করা।

(৪) খাওয়া দাওয়ার নিয়ন্ত্রণ। এমনিতেই চর্বি জাতীয় খাবার, ভাজাভুজি এবং তেল মশলাদার খাবার না খাওয়া ভাল। যদি মোটা হওয়ার ধাত থাকে তাহলে মোটামুটি এগুলো খাদ্যতালিকা থেকে বাদই দিতে হবে।

(৫) বাড়িতে নিকটাত্মীয়দের কারোর ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হাইপোথাইরয়েডিজম বা হৃদরোগ থাকলে বছরে অন্তত একবার, বিশেষ করে বয়স যদি ৩০এর ওপরে হয়। ডাক্তার দেখিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা দরকার।

(৬) ধূমপানের অভ্যেস যাতে গড়ে না ওঠে সে দিকে নজর দেওয়া।

প্র : হৃদরোগের সম্ভাবনা থাকলে ধ্যান করে কী হবে?

উ : রোগ ঠেকিয়ে রাখতে গেলে শরীর এবং মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকা জরুরি, আগেকার দিনে মুনি ঋষিরা যে দিনের পর দিন না খেয়ে বা না ঘুমিয়ে কাটাতে পারতেন তার মূলে ছিল এই ধ্যান এবং যোগাসন। ধ্যান এবং যোগাসনের সাহায্যে শরীর এবং মনকে এতখানি শান্ত করে তোলা যায় যে শারীরিক এবং মানসিক চাহিদা অনেক নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। ডাক্তারি ভাষায় বেসাল মেটাবলিক রেট (বি এম আর) বা শরীরের বিপাকীয় প্রক্রিয়ার হার অনেক কমে যায়। হার্টের কাজ পাম্প করে শরীরে রক্তের জোগান দেওয়া। বিপাকীয় প্রক্রিয়ার হার কমে গেলে শরীরে রক্তের চাহিদা কমে। হার্টের ওপর চাপ কমে।

প্র : আবার নিয়মিত খেলাধুলা বা ব্যায়াম করার কথাও বললেন। এতে তো হার্টের ওপর চাপ বাড়বে?

উ : সব রকম পরিস্থিতির সঙ্গে যাতে শরীর মোকাবিলা করতে পারে সেই জন্য দুটোই করা উচিত।

ব্যায়াম করলে শরীরে রক্তের চাহিদা বাড়বে। হার্টকে বেশি পাম্প করতে হবে। এবং হৃৎপিণ্ডের সব ছোট ছোট ধমনীগুলির মধ্যে দিয়ে দ্রুতবেগে রক্ত চলাচল করার ফলে চর্বি জমে পথ বন্ধ করার প্রবণতা কমবে। অর্থাৎ নিয়মিত ব্যায়াম করার ফলে আপৎকালীন পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার ক্ষমতাও থাকবে হার্টের।

প্র : চর্বি জমে হৃৎপিণ্ডের ধমনীর পথ বন্ধ হওয়া বলতে?

উ : আমাদের শরীরের প্রতিটি কোষের খাদ্য হচ্ছে রক্তের মাধ্যমে এসে পৌঁছনো অক্সিজেন। হৃৎপিণ্ডেরও তাই। সে নিজে পাম্প করে সমস্ত শরীরে রক্ত সরবরাহ করে। তাকে রক্ত সরবরাহ করার জন্য রয়েছে অসংখ্য ছোট ছোট ধমনী। করোনারি আর্টারি। এরা পুরো হার্টের ওপরে জালের মতো ছড়িয়ে আছে। এই ধমনীগুলির মধ্যে চর্বি জমলেই করোনারি আর্টারি ডিজিজ বা ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজ হয়। কতখানি চর্বি জমল, কটার মধ্যে চর্বি জমল, রক্ত যেতে বাধা পাচ্ছে, না যেতেই পারছে না এসবের ওপর রোগের মাত্রা নির্ভর করে।

প্র : শরীরে চর্বি জমার সঙ্গে কি হৃৎপিণ্ডের ধমনীতে চর্বি জমার কোনও সম্পর্ক আছে?

উ : হ্যাঁ, সম্পর্ক আছে। সে জন্যই তো আমরা ওজন কমানো, রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমানোর দিকে অত নজর দিই।

প্র : হৃদরোগের প্রবণতা কমাতে চা কফি খেতে বারণ কবা হয় কেন?

উ : বারণ করা হয় না। কম খেতে বলা হয়, মূলত দু'টি কারণে। প্রথমত যখন ক্যালরি কন্ট্রোলের কথা বলা হচ্ছে তখন সম্ভাব্য সব কারণগুলিই বাদ দিতে হবে। দিনে ১০-১৫ কাপ চা যাঁরা খান, দুধ চিনির মাধ্যমে প্রচুর ক্যালরি তাঁদের শরীরে ঢোকে। সেটা কাম্য নয়।

দ্বিতীয় হল, শরীর মনের শান্ত অবস্থা আমরা চাই। চা কফি বেশি খেলে হার্ট রেট বাড়ে। ঘুম এবং খিধে কমে। কফি তো খাওয়াই উচিত নয়।

প্র : আর মানসিক চাপ?

উ : মানসিক চাপ প্রত্যক্ষভাবে হৃৎপিণ্ডকে জখম কবে না বটে তবে অনেক সময় প্রবল মানসিক চাপের মুখে হৃদরোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

প্র : মানে?

উ · মানে হৃদরোগ ভেতরে ছিল। কিন্তু তার লক্ষণ প্রকাশ পায়নি। অশান্তি উদ্বেগের ফলে সেটা প্রকট হয়ে পড়ল।

প্র . ডায়াবেটিস থাকলে হৃদরোগেব লক্ষণ দেরিতে প্রকাশ পায়?

উ : হ্যাঁ অনেক সময় এরকম দেখি আমরা।

হৃদরোগ থাকলে সকাল সন্ধে নিয়ম করে হাঁটতে হবে

অধ্যাপক (ডাঃ) জে সি ঘোষ

দূরভাষ ৩৩৭-৩৪৩১

প্রঃ কী করে বুঝব ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজ হয়েছে?

উঃ ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজের শুরুতে চলতে ফিরতে বা উপব-নীচ করতে বুকের মাঝখানে পাথর চাপিয়ে দেওয়ার মতো ব্যথা হয়। দাঁড়িয়ে গেলে আবার কমে যায়। ব্যথা বুক থেকে পিঠ এবং হাতেও ছড়াতে পারে। কখনও শ্বাসকষ্ট থাকে। কখনও আবার কোনও উপসর্গই থাকে না।

প্রঃ উপসর্গ না থাকলে বোগ ধরা পড়বে কীভাবে?

উঃ অনেকে আছেন যাঁরা বছবে একবার ডাক্তারের কাছে যান। সব পরীক্ষা নিবীক্ষা কবান। তাঁদের কারোব যদি এরকম উপসর্গ হীন ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজ থাকে, ধরা পড়ে যাবে স্ট্রেস টেস্টের মাধ্যমে। তবে এই সংখ্যাটা তুলনামূলক ভাবে কম। এমন বেশ কিছু মানুষ আছেন যাঁদের রোগ ধরা পড়ে খুব বড় ধরনের হার্ট অ্যাটাক বা তার ফলে হঠাৎ মৃত্যুব মাধ্যমে।

প্রঃ তাহলে তো নিয়মিত পরীক্ষ নিরীক্ষা করাই ভাল।

উঃ হ্যাঁ, করালে ভাল। তবে ১০০ কোটি মানুষকে ধরে ধরে বছরে একবার করে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করানো খুব বাস্তব সম্মত নয়। তবে যাঁদের হাতে অনেক মানুষের জান প্রাণ রয়েছে যেমন, পাইলট, ট্রেনের ড্রাইভার— এদের বছরে একবার পুরো চেক আপ কবাতে হয়।

প্রঃ বাকিরা তবে কী কববেন?

উঃ বাকিরা সাবধান হয়ে চলবেন। অনেক সময ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজ কিন্তু মাঝে মধ্যেই জানান দেয়। কিন্তু এর ব্যথাটা, যাকে আমবা অ্যানজাইনা বলি, অম্বলের ব্যথার সঙ্গে এত মিলে যায় যে, ঘনঘন হলেও অম্বলের ওষুধ, গ্যাসের ওষুধ নয়তো ব্যথা কমা বা ঘুমের ওষুধ দিয়ে এর চিকিৎসা হয়। ফলে পরে যখন অবস্থা মারাত্মক হয়, হাসপাতাল বা নার্সিংহোম ছাড়া আর গতি থাকে না। কাজেই একই উপসর্গ যদি বারবার ঘুরে ফিরে আসে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।

বয়স ৫০ এর ওপর হলে, যদি দুটোর বেশি রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে, যেমন, উচ্চরক্তচাপ

এবং ডায়াবেটিস বা প্রজন্মগতকারণ এবং উচ্চ রক্তচাপ অথবা ধূমপানের নেশা এবং বাড়িতে কারোর হার্টের অসুখ আছে ইত্যাদি, ডাক্তারের পরামর্শমতো একবার সব পরীক্ষা নিরীক্ষা দরকার।

প্র: সব পরীক্ষা নিরীক্ষা বলতে?

উ: (১) ওজন বাড়ছে কিনা সেটা দেখা
(২) রক্তচাপ পরীক্ষা করা
(৩) রক্তের কিছু পরীক্ষা যেমন, ব্লাড সুগার, লিপিড প্রোফাইল ইত্যাদি মাপা

প্র: ই সি জি করার দরকার নেই?

উ: না, ই সি জি করে তেমন লাভ নেই। হার্ট অ্যাটাক হওয়ার আগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইসিজিতে কোনও পরিবর্তন আসে না। অর্থাৎ বুকে ব্যথা হলে ই সি জি করে কিছু নাও বোঝা যেতে পারে।

প্র: আর রানিং ইসিজি?

উ: হ্যাঁ, ট্রেডমিল টেস্ট অনেক সময় করতে বলা হয়। তবে এখানে কয়েকটি ব্যাপার আছে যা ডাক্তার ছাড়া অন্য কারোর বোঝার কথা নয়। ট্রেডমিল টেস্ট পজিটিভ হলেই যে সবসময় রোগ থাকবে এমন কোনও কথা নেই। আবার নেগেটিভ অথচ রোগ আছে এমনও হতে পারে। অল্পবয়সী মেয়েদের ক্ষেত্রে ট্রেড মিল টেস্ট পজিটিভ অথচ রোগ নেই এমন বেশ কিছু দেখা যায়।

প্র: তবে কি ট্রেডমিল টেস্ট করে রোগ আছে কি নেই তা নিশ্চিত করে বলা যায় না?

উ: বলা যায়। তবে সেই সিদ্ধান্ত নেবেন বিশেষজ্ঞ।

প্র: ২৪ ঘণ্টা ধরে যে ইসিজি করা হয়?

উ: হ্যাঁ, হলটার মনিটরিং। লুকোনো ইস্কিমিয়া ধরার জন্য এই ইসিজি কাজে আসে। আপনি খাচ্ছেন, ঘুমোচ্ছেন, চলাফেরা করছেন সে সময় হার্ট কীভাবে কাজ করছে তা এভাবে ধরা যায়।

প্র: লুকোনো ইস্কিমিয়া থাকলে তো আচমকা প্রবল ব্যথা শুরু হতে পারে। তখন কী করব?

উ: বাড়িতে সরবিট্রেট অথবা আইসরডিল জাতীয় ওষুধ এবং অ্যাসপিরিন রেখে দেবেন। ব্যথা হলে সরবিট্রেট বা আইসরডিল রাখবেন জিভের নীচে। আর একটা অ্যাসপিরিন খেয়ে নেবেন। এর পরই ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ব্যথা না কমলে সরাসরি কোনও কার্ডিয়াক সেন্টারে নিয়ে যাওয়া দরকার। কারণ হার্ট অ্যাটাকের চিকিৎসায় সময়ের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্র: দেরি হয়ে গেলে রোগী মারা যেতে পারে?

উ: হ্যাঁ, সেরকম বড় অ্যাটাক হলে রোগী মারা যেতে পারেন। এছাড়াও সমস্যা আছে। একটি মাঝারি ধরনের হার্ট অ্যাটাকে হৃৎপিণ্ডের ২০ থেকে ৩০ শতাংশ কার্য ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। খুব তাড়াতাড়ি চিকিৎসা শুরু করা গেলে ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনা যায়।

প্র: ৪০ এর ওপর বয়স হলে দিনে ৮০-১৬০ মিলিগ্রাম অ্যাসপিরিন খেলে নাকি হার্ট ভাল থাকে?

উ: অত আগে দরকার নেই। বয়স ৫০ এর উপর হলে এবং যদি দুটো রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে অ্যাসপিরিন খাওয়া দরকার।

প্র: অ্যাসপিরিনে যাঁদের অ্যালার্জি আছে?

উ: তাঁরা খাবেন টিকলোপিডিন জাতীয় ওষুধ।

প্র: রোগ ধরা পড়ার পর কেমন হবে জীবনযাত্রা?

উ: মোটামুটি নিয়ন্ত্রিত জীবন কাটাতে হবে। আর নিয়মিত ওষুধপত্র খেতে হবে। হার্টের রোগ ধরা পড়েছে বলে চুপচাপ বসে গেলে হবে না। সকাল এবং সন্ধে নিয়ম করে হাঁটতে হবে। ওজন বেশি থাকলে কড়া ভাবে ক্যালরি মেপে খেতে হবে। ঘি, মাখন, চিজ, দালদা মার্জেরিন, ডিমের কুসুম, পাঠার মাংস, মেটে, মাছের ডিম, তৈলাক্ত মাছ, ভাজাভুজি, বেশি তেল মশলাদার খাবার ইত্যাদি মোটামুটি বাদ। নিমন্ত্রণ বাড়ি বা পার্টিতে গেলে যদি লোভ সামলানো না যায়, যাওয়া বন্ধ করতে হবে। ডাক্তারের পরামর্শ মতো নিয়মিত রক্তচাপ, ওজন মাপা এবং রক্তের অন্যান্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে। বেশি রাত জাগা চলবে না। এবং উদ্বেগ অশান্তি দূরে রাখার চেষ্টা করতে হবে।

প্র: উদ্বেগ অশান্তি কি চাইলেই দূরে রাখা যায়?

উ: কিছুটা যায় বইকি। হার্টের রোগ আছে। বেশি উদ্বেগ থেকে শরীরে অক্সিজেনের চাহিদা বাড়বে, হার্টরেট বাড়বে। হঠাৎ করে হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেলে কী করবেন? নিজে যদি মন শান্ত করতে না পারেন সাইকলোজিকাল কাউন্সেলিংয়ের সাহায্য নিতে পারেন।

প্র: হার্টের রোগ আছে। হঠাৎ করে হার্ট অ্যাটাক হয়ে যেতে পারে, এই ভাবনাটাই তো অশান্তির জন্য যথেষ্ট।

উ: সবকিছু নিয়ম কানুন মেনে চললে,ওষুধপত্র খেলে এবং ডাক্তারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চললে হঠাৎ করে হার্ট অ্যাটাক হওয়ার সম্ভাবনা কম।

প্র: অনেকে বলেন এত সব ওষুধ পত্র নিয়মকানুনের ঝামেলায় না গিয়ে বাইপাস অপারেশন করিয়ে নিলে নাকি বেশি ভাল থাকা যায়?

উ: এই সিদ্ধান্ত আপনি নিতে পারবেন না। নেবেন আপনার ডাক্তার। যদি তিনি দরকার মনে করেন হবে অপারেশন। তবে অপারেশন হলেই সব সমস্যার সমাধান হয় না। প্রচুর খরচ, শরীরের ঝক্কি এবং তারপরেও কিন্তু কিছুটা নিয়ম মেনে চলার ব্যাপার থেকে যায়। কারণ যে কারণের জন্য আপনার শরীরে রোগের সূত্রপাত হয়েছিল অপারেশনের পরও তাকে এড়াতে ওষুধপত্র এবং কিছু সাবধানতা মেনে চলতে হয়।

প্র: আর অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করালে?

উ: এখানেও সেই এই একই কথা। বাইপাস হবে, না অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি হবে, না রোগী ওষুধের ওপর থাকবেন, সে সিদ্ধান্ত নেবেন আপনার ডাক্তার। কাজেই আপনার কাজ প্রথমে আপনার পছন্দসই ডাক্তার খুঁজে বার করা। তারপর তাঁর উপর পুরোপুরি নির্ভর করা। অনেক সময় এমনও হয় কার্ডিওলজিস্ট বললেন অ্যাঞ্জিওগ্রাফি করা দরকার। তার ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে অপারেশন লাগবে কিনা। বেশ কিছু খরচের ধাক্কা। রোগী মতামতটা যাচাই করে বেড়াতে লাগলেন। অনেক সময়

নষ্ট হল। রোগ আরও খানিকটা এগোল। কিন্তু কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনো গেল না। যাইহোক, যে কথা হচ্ছিল, কিছুক্ষেত্রে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি দরকার হতে পারে। তবে এখনও পর্যন্ত অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করার ৬ মাসের মধ্যে ২০-৩০ শতাংশ রোগীর আবার সমস্যা দেখা দেয়।

প্রঃ অনেকে বলেন রোগ নির্ণয়ের জন্য যে অ্যাঞ্জিওগ্রাফি করানো হয়, তাতে ধমনীতে খোঁচাখুঁচির ফলে চর্বি জমার হার আরও বাড়ে?

উঃ আমরা যখন কোনও একটা পরীক্ষা করতে বলি তার দরকার বলেই বলি। প্রতিটি ওষুধের, প্রতিটি পদ্ধতির কিছু না কিছু অসুবিধে হয়ত আছেই। কিন্তু যখন জীবন মরণের প্রশ্ন তখন অত সূক্ষ্ম জিনিস নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। কাজেই আর একবার গোড়ার কথা বলি, ভরসা রাখতে পারেন এমন একজন ডাক্তার খুঁজে বার করুন। তারপর তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী চলুন।

ওপেন হার্টের দু' সপ্তাহ পরে মর্নিংওয়াক শুরু করুন

ডাঃ সুধাংশু ভট্টাচার্য

প্রঃ ওপেন হার্ট সার্জারির পর প্রচুর বাধা নিষেধ মেনে চলতে হবে?

উঃ হ্যাঁ, প্রথম ৬ সপ্তাহ পর্যন্ত বেশ কিছু নিষেধাজ্ঞা থাকবে। যেমন,

(১) বুকের ক্ষত পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে সময় লাগে প্রায় ৬ সপ্তাহ। এই ৬ সপ্তাহ কোনও ভারী জিনিস তোলা যাবে না।

(২) আজকাল অপারেশনে বেশি রক্তপাত হয়না। শরীর নিজে থেকেই ৬ সপ্তাহের মধ্যে সেই ঘাটতি পূরণ করে নেয়। তবে প্রোটিন ঘাটতি সামলানোর জন্য ৬ থেকে ৮ সপ্তাহ ভাল করে খাওয়া দাওয়া করা দরকার।

(৩) অপারেশনের সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে মর্নিংওয়াক চালু করতে হবে।

(৪) ধূমপান এবং যে কোনও তামাক জাতীয় নেশা পুরোপুরি বর্জন করতে হবে।

(৫) ডায়াবেটিস থাকলে সামলে চলতে হবে। চিনি এবং কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবারের বিধি নিষেধের সঙ্গে দরকার হলে সাহায্য নিতে হবে ওষুধের।

(৬) রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। ওষুধপত্র খেতে হতে পারে। নোনতা খাবারের ব্যাপারে সাবধান হওয়া দরকার। পাতে নুন খাওয়া একদম বন্ধ।

(৭) রক্তের কোলেস্টরল এবং ট্রাই গ্লিসারাইডের মাত্রা যথাস্থানে রাখতে চর্বি জাতীয় খাবারের ব্যাপারে সাবধান হতে হবে।

প্রঃ কত কিছু তো খেতে বারণ করলেন। তবে খাবে কী সেটা বলুন।

উঃ কী খাবে না তার ফর্দ এখনও শেষ হয়নি। সাধারণভাবে টাটকা ফল, সবজি এবং কম চর্বি যুক্ত খাবার বেশি খেতে হবে। কম খাবে সম্পৃক্ত চর্বি জাতীয় খাবার, চিনি, লবণ, অ্যালকোহল। রান্না এবং খাওয়ার নিয়ম কানুনে সামান্য পরিবর্তন আনতে হবে। যেমন,

(১) ভাজাভুজি নয়, খেতে হবে বেক করা অথবা সেদ্ধ খাবার।

(২) বেশি তেলে রান্না নয়, সেদ্ধ করে পরে অল্প তেলে সাঁতলে নিতে হবে।

(৩) পাঁঠা, খাসির মাংস, ডিমের কুসুম, যে কোনও ধরনের বাদাম, নারকোল ইত্যাদি যথাসম্ভব কম খেতে হবে। সপ্তাহে এক দু'বারের বেশি নয়।

(৪) দুধ খেতে চাইলে খেতে হবে স্কিমড মিল্ক।

(৫) মদ্যপান অত্যন্ত অল্পমাত্রায় করা যেতে পারে।

(৬) ক্যাফেইন অনেকের হৃৎস্পন্দন বাড়িয়ে দেয়। তেমন হলে ক্যাফেইন-হীন চা, কোলা খেতে হয়।

প্র: এত হালকা খাবার খাওয়াই মুশকিল। খাওয়ার ইচ্ছে এবং খিদে দুইই তো কমে যায় এসময়।

উ: অপারেশনের ঠিক পর পর খাওয়ার ইচ্ছে এবং খিদে দুইই খুব কমে যায় ঠিকই কিন্তু তা আবার ফিরে আসতে শুরু করে সুস্থতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে। উল্টোদিকে ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া করলেও দ্রুত ফিরে আসে সুস্থতা। রোগীর শারীরিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে অনেক সময় বিশেষ কিছু পথ্যের নির্দেশ দেন ডাক্তারবাবু। অন্যথায় উপরের নিয়ম কানুন মেনে সুষম খাদ্য খেলেই চলবে। তবে খেতে হবে। না খেলে কিন্তু দুর্বলতা কমবে না।

প্র: শরীর মনে এ সময় যে ক্লান্তি দেখা দেয় তা কীভাবে দূর হবে?

উ: ওপেন হার্টের পর শরীর মনের এই ক্লান্তি খুব স্বাভাবিক। বেশ কিছুদিন কম পরিশ্রমের অভ্যেস, ভাল ঘুমের অভাব, ওষুধপত্র এবং অপারেশনের ধকল সব মিলিয়ে এরকম একটা পরিস্থিতি হয়। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে খুব ধীরে ধীরে প্রস্তুতি নেওয়া দরকার।

বাড়ি ফিরে চলাফেরার অভ্যেসটাই ধীরে ধীরে বাড়াতে হবে। বাড়ির লোক অনেক সময় চলাফেরায় বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু হার্ট অপারেশন হয়েছে বলে একেবারে অকর্মণ্য হয়ে বসে থাকলে চলবে না। সইয়ে সইয়ে হাঁটাচলার অভ্যেস বাড়াতে হবে। এবং দু'সপ্তাহের মধ্যে মর্নিংওয়াক চালু করে দিতে হবে। এর সাথে নিয়ম মাফিক পুষ্টিকর খাওয়া-দাওয়া এবং ঠিকঠাক ঘুম হলে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

প্র: অনেক সময় আবেগের অস্থিরতা দেখা দেয় এসময়?

উ: যে কোনও বড় অপারেশনের পর আবেগ নিয়ন্ত্রণে ঘাটতি দেখা দিতে পারে। দীর্ঘদিনের দুশ্চিন্তা, ভয় থেকেই এর উৎপত্তি। এর ফলে কারোর মধ্যে দেখা দেয় হতাশা। কেউ কান্নাকাটি শুরু করেন। দিনের পর দিন একই স্বপ্নের আনাগোনা চলতে পারে ঘুমের মধ্যে। মনঃসংযোগের অসুবিধে বা স্মৃতিভ্রংশতাও দেখা দিতে পারে কারও কারও ক্ষেত্রে সাধারণভাবে ৪-৬ সপ্তাহের মধ্যে এই অসুবিধে কেটে যায়। পর্যাপ্ত বিশ্রাম এবং শারীরিক মানসিক ব্যস্ততা এই অবস্থা দ্রুত কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে। কয়েকটা জিনিস মেনে চলুন।

(১) শরীর যতখানি চায় ততখানি বিশ্রাম নিন।

(২) মর্নিংওয়াক একা না করে পছন্দসই কাউকে সঙ্গী হিসেবে বেছে নিন।

(৩) অবসর সময় বসে বসে রোগের কথা চিন্তা না করে গান শুনুন, বই পড়ুন

কিংবা চোখ বন্ধ করে আপনার পছন্দসই কোনও বিষয়ের কথা ভাবতে চেষ্টা করুন।

(৪) ডায়েটিশিয়ান এবং আপনার ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে খাবারে একটু বৈচিত্র্যের ছোঁয়া আনার চেষ্টা করুন। খাবার যদি ওষুধের মতো বিস্বাদ হয়ে পড়ে, একঘেয়েমি আসতে পারে।

(৫) আপনার রাঁধুনিকে বলুন যে খাবারই দিক একটু সাজিয়ে গুছিয়ে দেন যেন। বা খাবার সাজানোর ব্যাপারে নিজেও হাত লাগাতে পারেন।

(৬) ওষুধ নিয়ম করে খান।

(৭) ছোটখাটো ঘরের কাজে সাহায্য করলে মন অন্যমনস্ক থাকবে। আপনার থাকার ঘরটা একটু অন্যভাবে সাজিয়ে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করুন।

(৮) সকাল সন্ধে ঘরে টাটকা সুগন্ধী ফুল রাখুন। এবং পছন্দের ধূপ জ্বালিয়ে দিন।

(৯) অহেতুক তর্ক-বিতর্কে একদম যাবেন না।

(১০) স্বাভাবিক বিবাহিত জীবন যাপন করার চেষ্টা করুন। ইত্যাদি।

এরপরও যদি হতাশা বা অবসাদের হাত থেকে বেড়োতে না পারেন, ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন। অবস্থা বেশি জটিল হলে অনেক সময় সাইকোথেরাপিস্টের সাহায্যও দরকার হয়।

মৃগী রোগী আচমকা ওষুধ খাওয়া বন্ধ করবেন না

ডাঃ অনুপম দাশগুপ্ত

দূরভাষ : ৪৬৪-২৭২৮

প্রঃ মৃগী থেকে নাকি আচরণগত সমস্যা দেখা দিতে পারে? অথচ আমরা তো জানি মৃগী মানে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, হাত পায়ে খিঁচুনি, মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরনো ইত্যাদি।

উঃ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মৃগীরোগে ওই সমস্ত উপসর্গ থাকে বলে সাধারণ মানুষের ধারণা মৃগী মানে শুধু ওইটুকুই। আসলে ব্যাপারটা তা নয়। মানুষের আচরণগত দিকটি নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিষ্কের যে অংশ, লিম্বিক এরিয়া, সেখানে ত্রুটি দেখা দিলে আচরণগত সমস্যা দেখা দেয়। কারোর ক্ষেত্রে হঠাৎ হঠাৎ কথা বন্ধ হয়ে যায়, কেউ হাত পা নড়াতে পারেন না, কেউ খানিকক্ষণের জন্য উদ্ভ্রান্তের মতো আচরণ করেন ইত্যাদি।

প্রঃ মৃগী কি বংশগত?

উঃ কিছুটা। বাবা বা মা কারোর যদি মৃগী থাকে ২-৪ শতাংশ ক্ষেত্রে সন্তান রোগাক্রান্ত হয়। দু'জনেরই থাকলে রোগ হওয়ার সম্ভাবনা ৮-১০ শতাংশ।

প্রঃ এছাড়া আর কী কারণে মৃগী হতে পারে?

উঃ প্রায় সময়ই রোগের কারণ জানা যায় না। কিছু ক্ষেত্রে মাথায় আঘাত, ম্যানিনজাইটিস, ব্রেন টিউমার, এনকেফেলাইটিস ইত্যাদি কারণে মৃগী দেখা দিতে পারে।

প্রঃ মৃগী হওয়া মানে তো সারা জীবন ওষুধ খেয়ে যাওয়া?

উঃ হ্যাঁ, ওষুধপত্রের ব্যাপারে একটু কড়াকড়ি আছে। চিকিৎসা চলাকালীন একটানা ৩ বছর উপসর্গ দেখা না দিলে ই ই জি করানো হয়। ই ই জি রিপোর্ট ঠিক থাকলে ওষুধের মাত্রা ধীরে ধীরে কমিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ ক্ষেত্রে চিকিৎসা শুরু করার মোটামুটি ৫-৬ বছর পরে ওষুধ বন্ধ করে দেওয়া যায়।

প্রঃ ওষুধ বন্ধ হওয়ার পর আবার উপসর্গ দেখা দিতে পারে কি?

উঃ ওষুধ বন্ধ করতে হয় ধীরে ধীরে এবং ধাপে ধাপে। তারও আগে দেখা দরকার ই ই জি রিপোর্ট ঠিক আছে কিনা। কিছু ক্ষেত্রে ৩ বছর উপসর্গ বন্ধ থাকলেও রোগ থেকে যায় ভেতরে। সে ক্ষেত্রে ওষুধ বন্ধ করলে বা ঠিক ই ই জি রিপোর্টের ক্ষেত্রেও

আচমকা ওষুধ বন্ধ করলে এরকম হতে পারে। তখন খুব তাড়াতাড়ি নিউরোলজিস্টের সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার।

প্র: মৃগীরোগীর টি ভি দেখা বারণ?

উ: না দেখাই ভাল। দেখলেও অন্তত ১০ ফুট দূরত্ব থেকে দেখতে হবে এবং একটানা আধ ঘটার বেশি দেখা যাবে না। আজকাল সব প্রোগ্রামের মধ্যেই বিজ্ঞাপন থাকে। অন্তত সেই সময়টুকু খোলা হাওয়ায়, ছাদে বা বারান্দায় ঘুরে আসতে পারলে ভাল হয়।

প্র: এঁরা তাহলে কম্পিউটারও চালাতে পারবেন না?

উ: কম্পিউটার চালাতে কোনও অসুবিধে নেই। ভিডিওগেম খেলা বা হলে গিয়ে সিনেমাও দেখা যেতে পারে।

প্র: এঁদের তো রাত্রিজাগা উচিত নয়?

উ: না, রাত্রে ৬-৭ ঘণ্টা ঘুম এঁদের জন্য খুব জরুরি।

প্র: এক আধ দিন অনিয়ম করলে কি কোনও অসুবিধে হতে পারে?

উ: মৃগী থাকলে কিছু বিধি নিষেধ মেনে চলা দরকার। তবে ঠিকমতো ওষুধপত্র খেলে এবং নিয়মকানুন মেনে চললে এক আধদিন অনিয়মে তেমন বিপদ কিছু হয়না।

প্র: নিয়ম কানুন বলতে?

উ: ওষুধ নিয়মিত খেতে হবে এবং ওষুধের কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে তা ডাক্তারকে জানাতে হবে। প্রতি ৬মাস অন্তর ডাক্তারের কাছে যাওয়া এবং রক্ত পরীক্ষা করানো একান্ত জরুরি। ওষুধ চলাকালীন রাত্রে ৬-৮ ঘণ্টা ঘুমোতে হবে। টিভি যথাসম্ভব কম দেখতে হবে। বেশি চিন্তা ভাবনা, উত্তেজনা এদের জন্য ভাল নয়। কাজেই ঝগড়া, মারামারি এড়িয়ে চলা দরকার। বারবার যাতে হজমের গণ্ডগোল না হয় সে দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। হালকা, সহজপাচ্য খাবার খাওয়াই ভাল। হালকা ব্যায়াম, খোলা জায়গায় হাঁটাহাটি, খেলাধুলা ইত্যাদি করা যেতে পারে।

প্র: হজমের গণ্ডগোলের সঙ্গে মৃগীর কোনও সম্পর্ক আছে?

উ: সরাসরি নেই। তবে হজমের গণ্ডগোল হলে অন্যান্য খাবারের মতো ওষুধও পুরোপুরি হজম হয় না। ফলে ওষুধের মাত্রা বাড়াতে হয়।

প্র: এঁদের কি সাঁতার কাটা বা সাইকেল চালানো বারণ?

উ: অসুস্থ অবস্থায় অবশ্যই বারণ। তবে বেশ কিছু দিন উপসর্গ না থাকলে বা রোগী ভাল হয়ে গেলে সাঁতার কাটা এবং সাইকেল চালানো দুইই সম্ভব।

প্র: আর বিয়ে করা?

উ: চিকিৎসা চলাকালীন করা উচিত নয়। কারণ রাত্রে ৬-৭ ঘণ্টা ঘুম এদের জন্য খুব জরুরি। বিয়ের ঠিক পরপর যা মেনে চলা অনেক সময়ই সম্ভব হয় না। ফলে রোগের প্রকোপ বেড়ে যেতে পারে।

প্র: অনেক সময় তো চিকিৎসা অনির্দিষ্টকালের জন্য চলে?

উ: ওষুধপত্র নিয়মিত খেলে এবং সমস্ত নিয়ম কানুন মেনে চললে অধিকাংশ সময় চিকিৎসা শুরু হওয়ার ৫-৬ বছরের মধ্যে অবস্থা আয়ত্বের মধ্যে চলে আসে। তখন

বিয়ে করলে অসুবিধে নেই। অনেকসময় রোগ ধরা পড়ে বেশি বয়সে, ৫-৬ বছর অপেক্ষা

করার মতো সময় হাতে থাকে না, সেক্ষেত্রে বিয়ে হয়। তবে গর্ভধারণের ব্যাপারে এদের অত্যন্ত সতর্ক হয়ে থাকতে বলা হয়।

প্র: চিকিৎসা চলাকালীন গর্ভধারণ নিষিদ্ধ ?

উ: উচিত নয়। কারণ শতকরা ৮ভাগ ক্ষেত্রে এই সমস্ত ওষুধের প্রভাবে গর্ভস্থ ভ্রূণের ক্ষতি হতে পারে। অনেকে সেই ভয়ে ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দেন। ফলে বারবার তরকা হতে থাকে, যা মা এবং বাচ্চা দুইয়ের জন্যই ক্ষতিকর।

প্র: মৃগীর ওষুধ থেকে গর্ভস্থ ভ্রূণের কী ক্ষতি হতে পারে?

উ: কিছু জন্মগত ত্রুটি নিয়ে বাচ্চা জন্মাতে পারে। যেমন বাচ্চার মাড়ি, ঠোঁট বা তালু কাটা হতে পারে, হৃৎপিণ্ডে ফুটো বা অন্য ধরনের হার্টের অসুখ নিয়ে বাচ্চা জন্মাতে পারে ইত্যাদি।

প্র: গর্ভস্থ ভ্রূণে কোনও ত্রুটি দেখা দিচ্ছে কিনা তা আগে থেকে বুঝতে পারা যায় না?

উ: তা অবশ্য পারা যায়। অ্যামনিওসিণ্টেসিস করা যেতে পারে। তবে এই পদ্ধতি আমাদের দেশে এখনও তত জনপ্রিয় হয়নি।

প্র: মৃগী রোগীর মধ্যে অনেক সময় ঘুমঘুম ভাব, আলস্য ইত্যাদি বেশি থাকে। সেসব কি ওষুধের জন্য হয়?

উ: ফেনোবারবিটোন জাতীয় ওষুধে সামান্য ঘুমঘুম ভাব দেখা দিতে পারে। দাম একটু কম বলে এর ব্যবহার বেশি। তবে ঘুমের সমস্যা হয় না এরকম দামী বিকল্প ওষুধও আছে।

প্র: কিছু ওষুধে তো আবার খিদেও বাড়ে?

উ: সোডিয়াম ভ্যালপ্রোয়েট জাতীয় ওষুধে খিদে বাড়তে পারে।

প্র: অ্যালার্জি?

উ: কিছু ওষুধে হতে পারে। সেক্ষেত্রে ডাক্তারকে জানালে তিনি ওষুধ বদলে দেবেন।

প্র: মৃগী থাকলে বাচ্চারা কি খুব বেশি জেদি, রাগী হয়?

উ: না, এই ধারণা ঠিক নয়। এই রোগটিকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচুর ভুল ধারণা আছে, বাচ্চাকে ঠিকভাবে বড় করে তোলার পথে যা অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। ফলে বাচ্চা জেদ, রাগ ইত্যাদি দেখানোর সুযোগ পায়। যেমন, অনেক বাবা মা মনে করেন তাঁদের কোনও ভুলের জন্য বাচ্চা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। হয়তো গর্ভাবস্থায় সঠিক নিয়ম পালন করা হয়নি বা ঝগড়াঝাটি, অশান্তির দরুণ বাচ্চার মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে অথবা বাচ্চা জন্মের সময় কোনও ত্রুটি বিচ্যুতি হয়েছে। কেউ ভাবেন বাচ্চাকে বড় করার সঠিক নিয়ম তাঁরা জানেন না। তাই বাচ্চার অসুস্থতা। এর ফলে অনেক সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়া হয় বাচ্চার প্রতি। এবং বাচ্চা বাবা মায়ের দুশ্চিন্তার সুযোগ গিয়ে অস্বাভাবিক আচরণ করতে থাকে।

প্র: এদের মধ্যে মনোসংযোগের অভাব দেখা দেয়?

উ: বারবার খিঁচুনি এবং অজ্ঞান হতে থাকলে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। সেক্ষেত্রে

শুধু মনোসংযোগের অভাব নয় হতাশা, স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়া এবং আচরণগত সমস্যাও দেখা দেওয়া সম্ভব।

প্রঃ *একে ঠেকানো যায় না?*

উঃ বারবার অজ্ঞান হওয়া ঠেকাতে পারলেই সমস্যা এড়ানো যায়। অতএব নিয়মিত ওষুধপত্র খেতে হবে এবং নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে।

প্রঃ হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে গেলে সেই মুহূর্তে কী করতে হবে?

উঃ (১) মাথা একপাশে ফিরিয়ে দিতে হবে যাতে গ্যাঁজলা শ্বাসনালিতে ঢুকে বিপত্তি বাধাতে না পারে।

(২) বাঁধানো দাঁত থাকলে তা বার করে নিতে হবে।

(৩) জামা, প্যান্ট, টাই ঢিলে করে দিতে হবে। বিশেষ করে টাই এবং জামার গলার বোতাম খুলে নেওয়া দরকার। নয়তো তরকার সময় শ্বাসকষ্ট হতে পারে।

(৪) আশপাশ থেকে ধারালো জিনিস সরিয়ে নেওয়া দরকার।

(৫) হাত পা চেপে ধরার দরকার নেই।

(৬) দাঁত আটকে গেলে অনেকে মুখের মধ্যে চামচ দিয়ে খোলার চেষ্টা করেন। জোরাজুরি করলে দাঁত ভেঙ্গে যেতে পারে। অতএব সেই চেষ্টা না করাই ভাল।

(৭) ফিট চলাকালীন ওষুধপত্র খাওয়ানোর চেষ্টা করা উচিত নয়।

(৮) ফিট বেশিক্ষণ ধরে চললে শিরা অথবা রেকটামের মাধ্যমে ওষুধ দিতে হতে পারে।

(৯) ফিটের পর খানিকক্ষণের জন্য বাচ্চা ক্লান্ত অথবা খিটখিটে হয়ে যায়। সে সময় তাকে শান্ত করে রাখতে হবে।

(১০) ফিটের পর অনেক সময় মাথা ব্যথা হয়। ব্যথা অসহ্য হলে অ্যাসপিরিন জাতীয় ওষুধ খাওয়াতে হবে।

ঘুম কম হলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়

ডাঃ অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

দূরভাষ : ৪৬৬-৫০২১

প্রঃ ৭-৮ ঘণ্টা ঘুমিয়েও সকালে উঠে মনে হল ঘুম হয়নি। যেমন ক্লান্তি ছিল তেমনই ক্লান্তি। কী করব?

উঃ সম্পূর্ণ ঘুমের কয়েকটি ধাপ আছে। ঘুম হালকা থেকে ধীরে ধীরে গাঢ় হয়, আবার হালকা, সেখান থেকে গাঢ়—এভাবে সারা রাত ৪-৫ টি পর্যায় সম্পূর্ণ হয়। শরীর মনের সজীবতা ফিরে আসে গাঢ় ঘুমের পর্যায়ে। ঘুমের মধ্যে এই পর্যায় ঘুরে ফিরে না এলে অনেকক্ষণ ঘুমিয়েও ক্লান্তি দূর হবে না।

নানা কারণে এরকম হতে পারে। পরিবেশ, পরিস্থিতির পরিবর্তন, অশান্তি, উদ্বেগ, অসুস্থতা, ওষুধ পত্রের প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি। অতএব এরকম হতে থাকলে প্রথমে খুঁজে নেওয়া দরকার কী কারণে এরকম হচ্ছে। তরপর সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিলে সমস্যার সমাধান হবে। দরকার পড়লে ডাক্তারের পরামর্শ মতো কয়েকদিন ঘুমের ওষুধ খেতে হতে পারে।

প্রঃ কিন্তু আমরা তো ঘুম না এলেই ঘুমের ওষুধ খাই।

উঃ সে জন্য ঘুম না হওয়ার সমস্যা মেটে না। ঘুমের ওষুধ নিয়মিত খেলে অনেকক্ষণ ধরে ঘুম হয় ঠিকই কিন্তু ঘুমের মধ্যে পরিপূর্ণ শারীরিক বিশ্রাম হয় না। ফলে চিন্তাভাবনা, কাজকর্মের দক্ষতা, রিফ্লেক্স সব কিছু কমতে শুরু করে। ওষুধের উপর নির্ভরতা জন্মায়। এবং সবচেয়ে বড় কথা, যে অশান্তি উদ্বেগের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ঘুমের ওষুধ খাওয়া শুরু হয়েছিল, সেটা দ্বিগুণ হয়ে ফিরে আসে।

প্রঃ তাহলে ঘুম না এলে কী করব? কী কারণে ঘুম আসছে না সেটা খুঁজে পেতে তো সময় লাগবে?

উঃ ঘুম না এলে তবে ঘুমের ব্যাপারে সচেতন হবেন তেমন হলে চলবে না। কিছু নিয়ম কানুন আছে যা মেনে চললে ঘুমের সমস্যাই হবে কম। যেমন-

(১) দিনে ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা না ঘুমোলে শরীর খারাপ হবে এরকম ধারণা ঠিক

নয়। নানা কারণে ঘুমের অল্প বিস্তর ব্যাঘাত হতে পারে। অস্থির না হলে কিছুদিনের মধ্যে আবার সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে যায়।

(২) ঘুমের সমস্যা থাকলে বিছানাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। ঘুমের সময়টুকু ছাড়া বিছানায় শোয়া বসা না করাই ভাল। ভালমতো ঘুম পাওয়ার পর বিছানায় যেতে হবে। এবং ১০-১৫ মিনিটের মধ্যে ঘুম না এলে উঠে হালকা কোনও কাজ যেমন বই পড়া, গান শোনা, খোলা হাওয়ায় পায়চারি ইত্যাদি করলে সহজে ঘুম আসবে।

(৩) রাত্রে যখনই শুতে যান না কেন, ভোরবেলায় একই সময় উঠতে হবে। এতে সেই দিনটা হয়তো একটু ক্লান্ত লাগবে। কিন্তু ঘুমের ছন্দের স্থায়ী ব্যাঘাত এড়াতে পারবেন। শুতে যাওয়ার ব্যাপারেও একই নিয়ম। চেষ্টা করবেন শুতে যাওয়ার সময়টা মোটামুটি ঠিক রাখতে।

(৪) ঘুমোনোর পরিবেশ ঠিক রাখা খুব জরুরি। গরম, ঠাণ্ডা, আওয়াজ, আলো, বিছানা, বালিশ, চাদর, এমনকি সঙ্গীর প্রভাবও পড়তে পারে এ ব্যাপারে। যাঁদের ঘুমের অসুবিধে আছে, পরিবেশ বদলে গেলে তাঁদের ঘুম না আসার খুব সম্ভাবনা।

(৫) শুতে যাওয়ার আগে চা, কফি, সিগারেট ইত্যাদি না খাওয়া উচিত। কারণ ক্যাফেইন, নিকোটিন ইত্যাদি ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। কিছু ওষুধপত্র আছে যা চলাকালীন ঘুমের অসুবিধে হতে পারে। যেমন, কেমোথেরাপিতে যে সমস্ত ওষুধ ব্যবহৃত হয়, থাইরয়েডের অসুখ, মৃগী, অবসাদে ব্যবহৃত ওষুধ, জন্মনিরোধক বড়ি ইত্যাদি।

(৬) রাত্রের খাবার খাওয়া উচিত ঘুমোতে যাওয়ার ঘণ্টা দেড়েক দুয়েক আগে। খাবার হবে হালকা এবং ঘুমোনোর ঠিক আগে একটা কলা বা একগ্লাস ঈষদুষ্ণ দুধ খেলে ঘুমের সুবিধে হতে পারে।

(৭) ঘুমোনোর ঠিক আগে জটিল কাজকর্ম বা ভাবনাচিন্তার মধ্যে না ঢোকাই ভাল। গান শোনা, বইপত্র পড়া, সম্ভব হলে মেডিটেশন ঘুমে সাহায্য করবে।

(৮) শোয়ার আগে ভাল করে গরম জলে স্নান করে দেখতে পারেন।

(৯) ঘুমের সমস্যা থাকলে দুপুরের ঘুম একদম বাদ দিতে হবে।

(১০) স্বাভাবিক বিবাহিত জীবন যাপন না করলে ঘুমের অসুবিধে হতে পারে। সমস্যা হতে থাকলে এ দিকটাও খতিয়ে দেখতে হবে।

প্রঃ এতো নিয়ম কানুন না মেনেও তো অনেকে দিব্যি ঘুমিয়ে পড়েন।

উঃ ঘুমের পুরো ব্যাপারটা ভীষণ ব্যক্তিগত। কেউ হট্টগোলের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তে পারেন। কারোর চতুর্দিক নিস্তব্ধ না হলে ঘুম আসে না। কেউ বিছানায় শুয়ে সাধ্য সাধনার পর ঘুমোতে পারেন। কারোর শোওয়া মাত্র নাক ডাকতে থাকে। কেউ ৪-৫ ঘণ্টা ঘুমিয়ে সারাদিন সতেজ থাকেন। কারো দরকার ৮-১০ ঘণ্টা ঘুম। অর্থাৎ নিজস্ব ঘুমোনোর পদ্ধতিটাকে বুঝে নিতে হবে। এবং সেইমতো চললে ঘুম ভাল হওয়ারই কথা।

প্রঃ ৪-৫ ঘণ্টা ঘুমিয়ে দিনভর কর্মক্ষম থাকা সত্যি সম্ভব?

উঃ কারও কারও ক্ষেত্রে সম্ভব। কারণ কতটা সময় ধরে কেউ ঘুমোলেন তার থেকে

বেশি গুরুত্বপূর্ণ কত ভাল ভাবে তিনি ঘুমোলেন। ঘুমের গুণগত মান ভাল হলে কম ঘুমোলেও চলবে।

প্র: ঘুমের গুণগতমান কী ভাবে ভাল করা যায়?

উ: আগে যে নিয়ম কানুনগুলি বলেছি সেগুলি মেনে চললে এবং ভাল ঘুম না হওয়ার পেছনে যদি কোনও কারণ থাকে তা দূর করলে ঘুমের মান ভাল হবে। তবে ঘুমের মান ভাল হলেই যে সবাই ৪-৫ ঘণ্টা ঘুমিয়ে তরতাজা হতে পারবেন তা কিন্তু নয়। যাঁর যতখানি ঘুম দরকার তাঁকে ততখানিই ঘুমোতে হবে। না হলে সমস্যা দেখা দেবে।

প্র: কী সমস্যা দেখা দেবে?

উ: সারাদিন ঘুম ঘুম ভাব, ক্লান্তি, বিরক্তি, কাজে মন না লাগা থেকে শুরু করে চিন্তাভাবনার ক্ষমতা, কাজে দক্ষতা কমে যাওয়া, অশান্তি, অবসাদ ইত্যাদি দেখা দিতে পারে। বেশ কিছু দিন ধরে ঘুম কম হলে আরও কয়েকটি অসুবিধে দেখা দেয়। যেমন হাত পা কাঁপা, কথায় জড়তাভাব, ব্যথা বোধ করার ক্ষমতা কমে যাওয়া, রিপ্রোডাকটিভ হর্মোন; প্রোল্যাকটিন; গ্রোথ হর্মোনের পরিমাণ কমে যাওয়া, থাইরয়েড হর্মোনের পরিমাণ বাড়া ইত্যাদি। রক্ত চাপ, হৃৎস্পন্দন, শ্বাস প্রশ্বাসের হার এলোমেলো হয়ে যেতে পারে। কমে যায় শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, রিফ্লেক্স, একাগ্রতা। দেখা গেছে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট যাঁরা করেন তাঁদের অনেকেই দীর্ঘস্থায়ী ইনসমনিয়ার রোগী।

প্র: ঘুম কম হলে মৃগী রোগীদের মধ্যে খিঁচুনি এবং অজ্ঞান হওয়ার সম্ভবনা বাড়ে?

উ: হ্যাঁ।

প্র: মাথা ব্যথাও তো হয় অনেক সময়?

উ: হ্যাঁ, ঘুম কম হলে রাত্রে এবং সকালে ঘুম থেকে উঠে মাথা ব্যথা করতে পারে।

প্র: ঘুম কম হতে হতে অনেকে নাকি পাগল হয়ে যান?

উ: না পাগল হন না। মানসিক অস্থিরতা বাড়ে।

প্র: কতদিন বাদে এই সমস্ত উপসর্গ দেখা দেয়?

উ: ঘুম কম হওয়াকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সাময়িক, স্বল্পস্থায়ী এবং দীর্ঘস্থায়ী। ২-৫ দিন কম ঘুম হওয়া সাময়িকের পর্যায়ে পড়ে। এতে ক্লান্তি, বিরক্তি, দিনের বেলা ঘুম ঘুম ভাব ছাড়া আর তেমন কোনও অুসবিধে হয় না। ঘুম ঠিকঠাক শুরু হওয়া মাত্র সমস্যা কেটে যায়। ১ থেকে ৩ সপ্তাহ ঘুম কম হলে তাকে স্বল্পস্থায়ী ইনসমনিয়া বলে।

এ সময় থেকেই উপসর্গ কম বেশি শুরু হয়ে যায়।

প্র: কী কী কারণে ঘুম কম হয়?

উ: জেটল্যাগ, উত্তেজনা, অশান্তি, দুঃখ বা হঠাৎ করে ঘুমের ওষুধ বন্ধ করে দিলেও সাময়িক ভাবে ঘুমের উপর প্রভাব পড়তে পারে। বেড়াতে গিয়ে অনেকের দু'চারদিন ঘুম আসে না। পরিবেশ, পরিস্থিতি বদলে যাওয়ার জন্য এরকম হয়।

দীর্ঘস্থায়ী ইনসমনিয়া দেখা দিতে পারে শারীরিক, মানসিক কিছু অসুস্থতার জন্য। যেমন হাঁপানি, ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজ, হাইপার থাইরয়েডিজম, লিভার ফেইলিওর, স্লিপ

অ্যাপনিয়া সিনড্রোম, অবসাদ, ম্যানিয়া ইত্যাদি। অনেকে আছেন ঘুম নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভোগেন, শুতে যাওয়ার আগে চিন্তা যদি ঘুম না হয়। এবং চিন্তা এমন রূপ নেয় যে চেষ্টা সত্ত্বেও ঘুম আর আসে না। বেশি দিন এরকম চললে স্থায়ী ইনসমনিয়া দেখা দিতে পারে। দেখা গেছে তাঁদের নিজস্ব খাট বিছানার জগৎ ছেড়ে অন্যত্র নিয়ে গেলে ঘুমের অসুবিধে কমে যায়। ঘুম কম হওয়ার আরেক মানসিক কারণ স্লিপ স্টেট মিসপারসেপশন সিনড্রোম। এক্ষেত্রে রোগী কিন্তু ভালমতোই ঘুমোন কিন্তু নিজে সেটা বুঝতে পারেন না। এবং তাঁর মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী ইনসমনিয়ার বেশ কিছু লক্ষণ ফুটে ওঠে।

এ সমস্তই সেকেন্ডারি ইনসমনিয়া। অর্থাৎ কোনও কারণে ঘুমের ব্যাঘাত হওয়া। কিছু মানুষ আছেন যাঁদের এমনিতেই ঘুম কম। তাকে বলে প্রাইমারি ইনসমনিয়া। বয়স্ক মানুষদের মধ্যে এ ব্যাপারটা বেশি দেখা যায়।

প্র: বয়সের সঙ্গে ঘুম কমতে থাকে?

উ: হ্যাঁ, একদম ছোট বাচ্চার দিনে ১৬ থেকে ১৮ ঘণ্টা ঘুমের দরকার। ১৫ থেকে ৫০ বছর বয়সে মোটামুটি ৬-১০ ঘণ্টা। বয়স ৫০ এর ওপরে গেলে ঘুমের প্রয়োজন আরও কমে যায়।

প্র: কাজকর্মের সঙ্গে ঘুমের সম্পর্ক আছে?

উ: খাটাখাটনি হলে বিশ্রামের প্রয়োজন বাড়ে। ঘুম তো আসলে শরীর মনের বিশ্রামই।

প্র: কিন্তু ক্লান্ত হলেও তো অনেক সময় ঘুম আসে না?

উ: শরীর সুস্থ থাকলে ক্লান্তি থেকে ঘুম আসার কথা। কিন্তু তার সঙ্গে যদি উদ্বেগ, অশান্তি থাকে ঘুম দেরি করে আসতে পারে বা এলেও বারবার ভেঙে যেতে পারে।

প্র: স্লিপ অ্যাপনিয়া সিনড্রোমেও তো বারবার ঘুম ভেঙে যায়?

উ: ভেঙ্গে যায়। কিন্তু রোগী তা জানতে পারেন না। এঁরা সাধারণত আসেন অতিরিক্ত ঘুমের উপসর্গ নিয়ে. দিনরাত ঘুমঘুম ভাব। কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা যায় স্লিপ অ্যাপনিয়া সিনড্রোম আছে।

স্লিপ অ্যাপনিয়া সিনড্রোমে ঘুমের মধ্যে শ্বাস প্রশ্বাসে ব্যাঘাত ঘটে। হালকা থেকে গভীর ঘুমে তলিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে শরীরে অক্সিজেনের ঘাটতি চরম সীমায় পৌঁছে যাওয়ায় আচমকা ঘুম ভেঙে যায়। বড় শ্বাসের মাধ্যমে শরীরে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আবার সব স্বাভাবিক হয়ে যায়। ৬-৭ ঘণ্টার ঘুমে ২০ থেকে ৩০ বার এরকম হতে পারে।

প্র: কী করে এই সমস্যার সমাধান হবে?

উ: অক্সিজেন দেওয়ার মাস্ক দেখেছেন? ভেন্টিমাস্ক। রাত্রে শোয়ার সময় ওরকম একটি মাস্ক নাকে মুখে লাগিয়ে দেওয়া হয়। এর সঙ্গে যোগ থাকে অক্সিজেন সিলিণ্ডার এবং পজিটিভ প্রেশার রেসপিরেটর নামে একটি যন্ত্রের। সাধারণ অবস্থায় শরীরে এর মাধ্যমে অক্সিজেন ঢোকে না। কিন্তু রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ প্রয়োজনের চেয়ে কমে গেলে খুব জোরের সঙ্গে অক্সিজেন ঢোকে শরীরে। পরিমাণ মতো। সারা রাত ধরে এরকমই চলে। যখন যেমন দরকার অক্সিজেনের জোগান পেয়ে যায় শরীর।

সমস্যা মিটে যায়।

প্র: অনেকে বলেন দু চার পেগ ড্রিঙ্ক করলে ভাল ঘুম আসে?

উ: আসে হয়ত অনেকের। তবে ঘুমের ওষুধের থেকেও অনেক বেশি ক্ষতিকর অভ্যেস এটি। হয়ত ঘুম কম হওয়ার পেছনে কোনও শারীরিক বা মানসিক কারণ আছে, এরা তাকে গুরুত্ব না দিয়ে ঘুম আনার জন্য ড্রিঙ্ক করতে থাকেন. কারণটা থেকে যাওয়ায় ঘুম কম হওয়ার ব্যাপার থেকেই যায় বা বাড়তে থাকে। ফলে ড্রিঙ্কের মাত্রাও বাড়ে। অর্থাৎ ইনসমনিয়ার সঙ্গে সঙ্গে অ্যালকোহলিক হয়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা।

প্র: পরদিন গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে। অথচ তার অশান্তিতে আগের রাত্রে ঘুম আসছে না, এমন কোনও ওষুধ আছে যা খেলে ভাল ঘুম হবে অথচ পরদিন তার কোনও প্রভাব থাকবে না?

উ: নন বেঞ্জিডায়াজিপিন গোত্রের কোনও ওষুধ যেমন জোলপিডেম, মেলাটোনিন ইত্যাদি খেয়ে দেখতে পারেন।

প্র: ঘুমের ওষুধ পাল্টে পাল্টে খেলে অর্থাৎ এক সপ্তাহ অ্যালপ্রাজোলাম, পরের সপ্তাহে লোরাজিপাম, তার পরের সপ্তাহে ডায়াজিপাম, আবার অ্যালপ্রাজোলাম এরকম হলে নাকি ঘুমের ওষুধে নির্ভরতা জন্মায় না।

উ: ব্যাপারটা ঠিক এরকম নয়। একই গ্রুপের ওষুধ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খেলে নির্ভরতা জন্মানো বন্ধ করা যায় না। ওপরের সবকটা ওষুধই বেঞ্জোডায়াজিপিন গোত্রের। এই ওষুধে দ্রুত নির্ভরতা জন্মায়। কাজেই কেউ যদি চান ওষুধে নির্ভরতা না জন্মাক বা অনেক সময় অ্যালপ্রাজোলাম জাতীয় ওষুধে অনেকে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন তখন সেই ওষুধ বন্ধ করে নন বেঞ্জেত ডায়াজিপিন গ্রুপের ওষুধ কিছুদিন খেতে বলা হয়।

প্র: এই ওষুধে নির্ভরতা জন্মায় না?

উ: ৭-৮ সপ্তাহের বেশি একটানা ব্যবহার করলে নির্ভরতা জন্মাতে পারে।

প্র: ঘুমের ওষুধ খালিপেটে না খেলে কাজ করে না?

উ: খালিপেটে খেলে যে কোনও ওষুধই ভালভাবে শোষিত হয় শরীরে। সেজন্য সচরাচর খাবার খাওয়ার আধঘণ্টা কি ১৫ মিনিট আগে ঘুমের ওষুধ খেতে বলা হয়।

প্র: ঘুমের অভ্যেস বদলাতে চাইলে কী করতে হবে? অর্থাৎ রাত্রি ১২টায় শুয়ে সকাল ৮টায় ওঠার অভ্যেস পালটে যদি ৯টায় শুয়ে ৫টায় ওঠার অভ্যেস করতে হয়?

উ: রাতারাতি কিছু করা যাবে না। আধঘণ্টা আধঘণ্টা করে সময়টাকে পিছিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ধরুন প্রথম ৭দিন ৮টার বদলে ৭.৩০টায় উঠলেন, শুতেও গেলেন আধঘণ্টা আগে। পরের ৭ দিন ৭ টায় ওঠার চেষ্টা করুন। শোয়ার সময় ১২টা থেকে এগিয়ে ১১টা হবে। এভাবে এক দেড় মাসের মধ্যে অভ্যেস বদলে ফেলা। যাবে।

আরেকটু দ্রুত ফল পেতে চাইলে লাইট থেরাপির সাহায্য নিতে পারেন। অ্যালার্ম ঘড়ির সঙ্গে খুব চড়া আলোর সংযোগ করে নিন। রোজ নিয়ম করে ৫টায় অ্যালার্ম বাজবে। সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বলে উঠবে। উঠে পড়ুন। রাত্রেও শুতে যাবেন ৯টায়। ঘুম আসুক না আসুক। দু'চারদিন কষ্ট হবে। কিন্তু অভ্যেস বদলে যাবে তাড়াতাড়ি।

লাইট থেরাপির উদ্দেশ্য কৃত্রিম ভাবে ঘরে দিনের মতো আলো সৃষ্টি করা। সকাল বেলা যেরকম আলো থাকে রোজ ভোর ৫টায় তেমন আলোর জোগানে শরীর দ্রুত নতুন পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে।

প্রঃ অনেক সময় সকালে ঘুম থেকে উঠে মনে হয় আরও খানিকক্ষণ শুয়ে থাকলে বুঝি ঘুম ভালভাবে কাটবে। জোর করে উঠতে হলে তরতাজা ভাব আসে না। কী করা উচিত?

উঃ উঠেই পড়া উচিত। শুয়ে শুয়ে আলস্য করলে তরতাজা ভাব আসতে আরও দেরি হবে।

কড়া 'টয়লেট ট্রেনিং' থেকে কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা দিতে পারে

ডাঃ অরবিন্দ পাল

দূরভাষ ৯৮৩০০-৮৫২১২

প্র: পেট খারাপ হলে কী করব?

উ: মারাত্মক কিছু না হলে প্রথম দু দিন বারে বারে নুন চিনির জল খাওয়া ছাড়া আর কিছু করবেন না। কারণ অধিকাংশ সময়ই ডায়েরিয়া হয় ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের দরুন। ব্যাকটেরিয়া তৈরি করে কিছু দূষিত পদার্থ। তা যুক্ত হয় অন্ত্রের অভ্যন্তরীণ কোষের সঙ্গে। এই বিষকে শরীর থেকে বার করার জন্য অন্ত্রের কোষ থেকে প্রচুর পরিমাণে জল বেরোতে শুরু করে। এর সঙ্গে মিশে থাকে শরীরের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিছু লবণ। কোলনের কাজ মলের জলীয় অংশ শোষণ করা। পরিমাণ বেশি হলে সে আর এ কাজ পুরোপুরি করে উঠতে পারে না। তখনই পেট খারাপ হয়। ৩৬ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে এই বিষ শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। পেটখারাপও সেরে যায়। কিন্তু মাঝপথে পায়খানা বন্ধ করার ওষুধ খেলে বিষ শরীরে থেকে গিয়ে কষ্টকে প্রলম্বিত করতে পারে।

প্র: তার মানে পেট খারাপ হলে দেড় দু দিন ঘরে বসে থাকব?

উ: কয়েকটি সাবধানতা অবলম্বন করে বাড়িতে বিশ্রাম নেওয়াই এই সময় ভাল।

প্র: সাবধানতা বলতে?

উ: প্রথম সাবধানতা— শরীরে জল এবং লবণের মাত্রা যাতে বিপদসীমার নীচে না নামতে পারে সে দিকে খেয়াল রাখা। না হলে কিডনি সহ শরীরের অন্যান্য অংশ আক্রান্ত হয়ে জীবন সংশয় হতে পারে। অনেক সময় পেট খারাপের সঙ্গে বমি ভাব থাকে বা বমিও হয়। কিন্তু মোটামুটি ৬ থেকে ৮ ঘণ্টার মধ্যে বমিভাব সাধারণত কমে যায়। এই অবস্থায় ওরাল রিহাইড্রেশন থেরাপি চালু করা দরকার। বাজারে বিভিন্ন কোম্পানির ও আর এস পাউডার কিনতে পাওয়া যায়। ফোটানো ঠাণ্ডা জলে প্যাকেটের গায়ে লেখা পরিমাপ অনুযায়ী মিশিয়ে বারে বারে খেতে হবে। ওষুধের বদলে দিনে বার দুয়েক দু'চামচ করে ইসবগুল জলে গুলে খেয়ে নিলে উপকার পাওয়া যাবে। খিদে পেলে হালকা ঝোল ভাত। আর পরিপূর্ণ বিশ্রাম। দু'দিনে সুস্থ হয়ে উঠবেন।

প্র: পেট খারাপে তার মানে ওষুধপত্রের কোনও ভূমিকা নেই?

উ: সাধারণ অবস্থায় নেই। কিন্তু যদি সাবধানতা নেওয়া সত্ত্বেও বমি পায়খানা বন্ধ না হয়

এবং প্রস্রাব কমে আসতে শুরু করে ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার। এসব ক্ষেত্রে স্যালাইন দেওয়ার দরকার হতে পারে। এবং অ্যান্টিবায়োটিক।

প্রঃ পায়খানা বন্ধ করার ওষুধ খেলে নাকি কোষ্ঠবদ্ধতা হয়?

উঃ হতে পারে দু'চার দিনের জন্য।

প্রঃ কোষ্ঠবদ্ধতাও তো এক সমস্যা। কীভাবে প্রাকৃতিক উপায়ে একে ঠিক রাখা যায়?

উঃ কোষ্ঠকাঠিন্য বা কোষ্ঠবদ্ধতার মূলে রয়েছে খাবারে রাফেজের পরিমাণ কম থাকা। প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় পরিমাণ মতো শাক সবজি, ফল, ভুষিসুদ্ধ আটার রুটি, ডাল ইত্যাদি রাখা উচিত। মাছ, মাংস, ডিমের পরিমাণ কম থাকা দরকার। দিনে ৮ থেকে ১০ গ্লাস জল খেতে হবে। ভাজাভুজি, তেল মশলাদার খাবার কম খাওয়াই ভাল। প্রয়োজন হলে দিনে দু'বার দু'চামচ করে ইসবগুলের ভুষি জলে গুলে খেতে হতে পারে।

প্রঃ অনেক সময় এ সমস্ত নিয়ম মেনে চললেও তো দেখা যায় পেট পরিষ্কার হয় না। তখন কি কিছু ওষুধপত্র খাওয়া যেতে পারে?

উঃ পেট পরিষ্কার হওয়ার ব্যাপারে খাবারে রাফেজের পরিমাণের যেমন ভূমিকা আছে, ভূমিকা আছে মনেরও। দেখবেন কোনও নতুন জায়গায় গেলে কারও কারও প্রথম এক দু দিন বেশ অসুবিধে হয়। পরিবেশের পরিবর্তন মানাতে মানাতে দু'একদিন কেটে যায়। ডাক্তারি ভাষায় একে বলে 'বাওয়েল কনসাসনেস'। একদিন কোনও কারণে পেট পরিষ্কার না হলে সারাদিন তা নিয়ে অস্বস্তি বোধ করা, পরের দিন সকালে উঠেও ভয়, আজও যদি না হয় তাহলে কী হবে ইত্যাদি। পেট পরিষ্কার রাখার নিয়ম কানুন মেনে চললে, দু'একদিন কোনও কারণে না হলে বেশি ভাবনা চিন্তা না করাই ভাল। এই অভ্যেস যদি এক্ষুনি ত্যাগ করতে পারেন দেখবেন সমস্যার সঠিক সমাধান হয়ে গেছে। ওষুধপত্র কালে ভদ্রে দু চারবার খাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাকে অভ্যেসে পরিণত করলে প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করবেন। সেক্ষেত্রে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান আর হবে না। ওষুধ ছাড়া আর পায়খানা হতে চাইবে না।

প্রঃ কড়া টয়লেট ট্রেনিং থেকে নাকি অনেক সময় কোষ্ঠবদ্ধতার সৃষ্টি হয়?

উঃ সকালে টয়লেটে যেতেই হবে, বেগ না এলেও বসে থাকতে হবে— এই ধরনের অভ্যেস না করানোই ভাল। ছোটবেলা থেকে এই ধরনের শিক্ষা পেতে পেতে এক ধরনের অবসেশন জন্মে যাওয়ার খুব সম্ভাবনা। যা থেকে পরবর্তী কালে এসব অকারণ সমস্যার উদ্ভব। যেটা করা উচিত বেগ পেলে টয়লেটে যাবে এবং পেট পরিষ্কার রাখার নিয়ম কানুন মেনে চলবে। কিন্তু এক দু'দিন না হলে বা দু' এক বারের বেশি হলে বেশি আতঙ্কিত হবে না। বেশি সমস্যা হলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে।

প্রঃ কখনও পেট খারাপ কখনও কোষ্ঠবদ্ধতা এরকম পর্যায়ক্রমে চলতে থাকলে কী করতে হবে?

উঃ এরকম চলতে থাকলে প্রথমে দেখুন আপনার খাদ্যাভ্যাসে কোনও ত্রুটি আছে কিনা। খাওয়া দাওয়ার অনিয়ম এবং খাবারে রাফেজের অভাব থাকলে এরকম হতে পারে। নিয়ম মেনে হালকা খাবার খান এবং দিনে দু'বার দু'চামচ করে ইসবগুলের ভুষি খান দু এক সপ্তাহ। এতে সমস্যা না মিটলে ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

প্র: ইরিটেব্‌ল বাওয়েল সিনড্রোম হলে নাকি এরকম হয়?

উ: হতে পারে। তবে ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোমে আক্রান্ত বলে কাউকে চিহ্নিত করার আগে বেশ কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন হয়। আসলে স্ট্রেস, টেনশন, অনিদ্রা, পেটের রোগ আমাদের অনেকেরই নিত্যসঙ্গী। ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোমের মূলেও এদের কিছু ভূমিকা আছে। তাই অনেক সময় ভুল হতে পারে। মল পরীক্ষা, আপার জি আই এন্ডোস্কোপি, কোলোনোস্কোপি ইত্যাদি করে অন্য কোনও রোগের হদিস না পেলে তবেই বলা যাবে রোগটি আই বি এস।

প্র: অনেক সময় সামান্য খাওয়া দাওয়ার অনিয়মে ওপর পেটে চাপ ধরা ব্যথা হয়। কী করতে হবে?

উ: খাওয়া দাওয়ার গণ্ডগোল হলে গ্যাসট্রাইটিস হতে পারে। এ সময় কয়েকদিন একটু হালকা খাবার খেতে হবে। সাধারণত এতেই অবস্থা আয়ত্তে আসে। না এলে বা মাঝে মধ্যেই উপসর্গ দেখা দিলে ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

প্র: গ্যাসট্রাইটিস আর কোলাইটিস কি একই রোগ?

উ: না, গ্যাসট্রাইটিসে আক্রান্ত হয় পাকস্থলী। তেল মশলাদার খাবার, ভাজাভুজি, অ্যালকোহল, ব্যথার ওষুধ ইত্যাদি লাগাতার খেয়ে চললে গ্যাসট্রাইটিসের সমস্যা দেখা দিতে পারে। কোলাইটিস অর্থাৎ কোলনে প্রদাহ নানা কারণে হতে পারে। আমাদের দেশে আমাশার জন্য অ্যামিবিক কোলাইটিস বেশি হয়।

প্র: আমাশার ঘরোয়া কিছু সমাধান বলুন।

উ: প্রথম এবং প্রধান— জল ফুটিয়ে খাওয়া। শাক সবজি, স্যালাড খেতে চাইলে পরিষ্কার জলে বারবার ধুয়ে তারপর খেতে হবে। এবং অল্প পরিমাণে খেতে হবে। উপসর্গ অর্থাৎ পেটে মোচড় দিয়ে ব্যথা, বারবার পায়খানার বেগ এবং পায়খানার সঙ্গে আম পড়তে থাকলে একটা দুটো এনটেরোকুইনল খেয়ে চাপা দেওয়ার অভ্যেস ত্যাগ করতে হবে। এতে অসুখ বারবার ফিরে আসে। এবং পরবর্তী কালে আর কোনও ওষুধ কাজ করে না। দীর্ঘস্থায়ী আমাশার পরিণতিতে লিভারও আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। কাজেই ওষুধ যদি একবার খেতে শুরু করেন অন্তত ৫ দিন খেতে হবে।

প্র: খালিপেটে থানকুনি পাতার বস খেলে নাকি আমাশা ভাল হয়ে যায়?

উ: যে পরিবেশে আমরা বাস করি তাতে আমাশা পুরোপুরি ভাল হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। থানকুনি পাতার রস খেলে কোনও অসুবিধে নেই। তবে ভাল করে ধুয়ে পরিচ্ছন্ন ভাবে তৈরি না করলে সমস্যা বাড়বে।

প্র: পেঁপে কাঁচকলা দিয়ে সিঙি মাগুরের ঝোল?

উ: খেতে পাবেন সহজ পাচ্য বলে। তবে নিয়ম করে খেলে আমাশা হবে না এমন কথা বলা যাবে না।

প্র: আর অম্বল? অম্বলের হাত থেকে মুক্তি মিলবে কীভাবে?

উ: মাঝে মাঝে গলা বুক জ্বালা, পেট জ্বালা বা টক ঢেকুর উঠলে বুঝতে হবে আপনি অম্বলে ভুগছেন। ওষুধ খাওয়ার আগে নিজের খাদ্য তালিকার দিকে তাকান। এক একজন মানুষের

এক একটি জিনিসে অম্বল হয়। কেউ আটার রুটি খেতে পারেন না। কেউ পাউরুটি। কিছু বিশেষ ফল খেলে অম্বল হয় অনেকের। দই খেতে পারেন না কেউ কেউ। তেল মশলাদার খাবার, ভাজাভুজিতে অধিকাংশ মানুষের অম্বল হয়। অনিদ্রা, মানসিক চাপ, টানাপোড়েন তো ডেকে আনে অম্বলকে। অতএব খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনযাত্রার পরিবর্তন এনে অম্বলকে আয়ত্তে রাখতে হবে। নেহাত বাড়াবাড়ি হলে মাঝেমধ্যে অ্যান্টাসিড জাতীয় কিছু খেতে পারেন। তবে অভ্যেস করে ফেলবেন না। আর নিয়মিত পেট পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করবেন।

প্র: খাওয়া দাওয়ার নিয়ম মেনে এবং পেট পরিষ্কার রেখেও তো অনেক সময় অম্বলের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না?

উ: খাওয়া দাওয়ার নিয়ম কানুন মেনে চললে, ধূমপান, মদ্যপান যথাসম্ভব এড়িয়ে গেলে এবং পেট পরিষ্কার থাকলে অম্বলের সমস্যা আয়ত্তে থাকে। এসবে কোনও ফল না হলে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। দীর্ঘস্থায়ী চিকিৎসার দরকার হতে পারে।

প্র: সাবেক অ্যান্টাসিড ছাড়াও অম্বল কমানোর জন্য তো আজকাল নানারকম ওষুধ পাওয়া যায়। ফ্যামোটিডিন, র‍্যানিটিডিন বা ওমিপ্রাজোল। খেলে উপকারও হয় বেশি।

উ: অম্বল সারাতে বিভিন্ন ভাবে এই সমস্ত ওষুধগুলি কাজে আসে। অ্যান্টাসিডের কাজ পাকস্থলিতে অ্যাসিড তৈরি হওয়ার পর তাকে প্রশমিত করা। আমাদের পাকস্থলির কোষে দু' ধরনের হাইড্রোজেন রিসেপটর থাকে। এরা অ্যাসিড তৈরি করে। ফ্যামোটিডিন, র‍্যানিটিডিন এই সমস্ত হাইড্রোজেন রিসেপটরকে আটকে দিয়ে অ্যাসিড তৈরি কমিয়ে দেয়। ওমিপ্রাজোল কাজ করে কোষের গভীরে। তারও কাজ অ্যাসিড তৈরিতে বাধা দেওয়া। সুক্রালফেট জাতীয় ওষুধ পাকস্থলিতে প্রলেপ তৈরি করে অ্যাসিডের ক্ষতিকর প্রভাব কমায়। কার ক্ষেত্রে কোন ওষুধ প্রয়োজন সেটা ঠিক করবেন চিকিৎসক। সেই অনুযায়ী কিছুদিন ওষুধ খাওয়া দরকার। কিন্তু হয় ঠিক এর উল্টোটা। যাঁরা বেনিয়মে অভ্যস্থ তাঁরা যখন দেখেন অনিয়ম সত্ত্বেও ওমিপ্রাজোল বা র‍্যানিটিডিনের প্রভাবে অম্বলের সমস্যা কমছে, ওষুধের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। এটা কখনও ঠিক নয়।

প্র: এমন কিছু পথ নেই যা মেনে চললে পেট ঠিক থাকবে?

উ: নিশ্চয়ই আছে। তবে এ তো অ্যাপেনডিক্স, হার্নিয়ার মতো ব্যাপার নয় যে অপারেশন হল আর রোগ ঠিক হয়ে গেল। আগে যে রকম বলেছি খাওয়া, ঘুমের নিয়ম ঠিক রাখা, পেট পরিষ্কার রাখা এবং অশান্তি উদ্বেগকে কিছুটা হলেও এড়িয়ে চলতে পারলে সুস্থ থাকা সম্ভব।

আমাশা থেকেও লিভার খারাপ হয়

ডাঃ কে. এন. জালান

দূরভাষ : ২৪৭-৫৯৯০

প্র : পেঁপে নিয়মিত খেলে লিভার ভাল থাকে?

উ : না, পেঁপের এরকম গুণাগুণ কিছু নেই।

প্র : জন্ডিস হলে যে তবে গলাভাত আর পেঁপে সেদ্ধ খেতে বলা হয়?

উ : কে বলে খেতে? ডাক্তার? ডাক্তার কোনও দিনও বলবে না।

প্র : তবে জন্ডিস হলে কী খাবে?

উ : যাঁর যা খাদ্য সে তাই খাবে। চাইনিজরা চাওমিন খাবে, ইটালিয়ানরা স্প্যাগেটি। ইংরেজ খাবে স্যুপ, টোস্ট। আমাদের দেশেও দক্ষিণ ভারতীয়রা তাঁদের খাবার ইডলি, দোসা খায়। পাঞ্জাবিরা রুটি ডাল। অর্থাৎ জন্ডিসের খাদ্য একমাত্র পেঁপে সেদ্ধ আর গলা ভাত নয়। যা খেতে ইচ্ছে হবে এবং শরীরে সহ্য হবে তাই খাওয়া যেতে পারে।

প্র : এসময় হজম শক্তি কমে যায় না?

উ : জন্ডিসের জন্য কমার কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। তাছাড়া এ সময় শরীরে ক্যালরির চাহিদা বাড়ে। ফলে বেশি পরিমাণ প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন এবং অল্প পরিমাণে চর্বি জাতীয় খাবারের দরকার হয়।

প্র : ক্যালরির প্রয়োজন বাড়ে কেন?

উ : জন্ডিসে লিভারের কিছু কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাদের স্থান পূরণ করতে নতুন কোষের জন্ম হয়। কাজেই সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় কারোর যদি ২০০০ ক্যালরির দরকার থাকে। এই অবস্থায় তার থেকে কিছু বেশিই প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ ভালভাবে খাওয়া দাওয়া করতে হবে।

প্র : কিন্তু এই অবস্থায় তো খেতেই ইচ্ছে হয় না। বমি বমি লাগে।

উ : রোগ খুব জটিল না হলে সেটা থাকে প্রথম ৫-৭ দিন। তারপর সুস্থতার সঙ্গে সঙ্গে খাওয়ার ইচ্ছে ফিরে আসে। যদি তা সত্ত্বেও বমিভাব থাকে, ওষুধ দেওয়া যায়।

কিন্তু জন্ডিস নিয়ে ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়ে গেছে যে রোগী খেতে চাইলেও বাড়ির লোক খেতে দেন না। অনেক সময় খাবার পছন্দ হয় না বলেও বমি এসে যায়। ফলে জন্ডিস সেরে যাওয়ার পরও স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরে পেতে দেড় দু'মাস সময় লেগে যায়। অথচ সহজপাচ্য যে কোনও খাবারই এই সময় দেওয়া যায়। যেমন, সকালে শুকনো টোস্ট যদি বিস্বাদ লাগে, সামান্য মাখন দিলে খুব ক্ষতি নেই। মাছ, মাংস বা সব্জি একদম সেদ্ধ না দিয়ে সামান্য তেল মশলা দিয়ে রান্না করে দেওয়া যায়। তবে ভাজাভুজি বা তেল মশলাদার খাবার একদমই খাওয়া উচিত নয়।

প্র : জন্ডিস হলে যে স্বাস্থ্য যে খারাপ হয়ে যায় সেটা রোগের কারণে না খাওয়ার দরুণ?

উ : সাধারণ জন্ডিসের ক্ষেত্রে বেশির ভাগ সময় না খাওয়ার জন্য।

প্র : জন্ডিসে নাকি বিশ্রামই ওষুধ?

উ : অল্প স্বল্প চলাফেরা বা কাজকর্ম করা যায়। তবে লোকে তো মাত্রা রাখতে পারে না, তাই বিশ্রামই বলি আমরা।

প্র : তাহলে দেখছি জন্ডিস সম্বন্ধে অনেক ধারণাই ভুল?

উ : হ্যাঁ ভুল। আরও ভুল জন্ডিসকে রোগ ভেবে নেওয়া। জন্ডিস আসলে উপসর্গ। লিভারের বেশ কিছু রোগের ফলে জন্ডিস উপসর্গ হিসেবে দেখা দেয়।

প্র : যেমন?

উ : মূল হল ভাইরাল হেপাটাইটিস। হেপাটাইটিস এ, হেপাটাইটিস বি, হেপাটাইটিস সি, হেপাটাইটিস ডি এবং হেপাটাইটিস ই। সিরোসিস অফ লিভার, হেপাটিক অ্যামিবিয়োসিস, অ্যামিবিক লিভার অ্যাবসেস, লিভার ক্যান্সার, অটোইমিউন হেপাটাইটিস ইত্যাদি রোগেও জন্ডিস উপসর্গ হিসেবে থাকতে পারে।

প্র : ভাইরাল হেপাটাইটিস কি প্রতিরোধ করা যায়? হেপাটাইটিস বি র তো টিকা আছে।

উ : হেপাটাইটিস এ এবং ই সংক্রামিত হয় জলের মাধ্যমে। জল ভাল করে ফুটিয়ে খেলে এদের ঠেকানো যায়। হেপাটাইসিস বি এবং সি আসে মূলত রক্তের পথ ধরে। শারীরিক সম্পর্কের ফলেও হেপাটাইটিস বি ছড়িয়ে পড়ে। হেপাটাইটিস বি হলে তার সঙ্গে অনেক সময় ডি ও থাকে। আলাদাভাবে হেপাটাইটিস ডির কোনও অস্তিত্ব নেই।

হেপাটাইটিস এ এবং হেপাটাইটিস বি র টিকা আছে! সমস্যা বাধায় হেপাটাইটিস সি। যদিও সরকারের নিয়ম আছে প্রতিটি ব্লাড ব্যাঙ্কে বি-র সঙ্গে সি ভাইরাসেরও পরীক্ষা করা। কিন্তু সি ভাইরাসের জন্য খরচ পড়ে বোতল পিছু প্রায় ১৮০ টাকা। কাজেই কটা ব্লাডব্যাঙ্কে এই পরীক্ষা হয় আমার সন্দেহ আছে।

প্র : তাহলে তো খুবই সমস্যা।

উ : সমস্যা তো বটেই। দুনিয়া জুড়েই হেপাটাইটিস সি নিয়ে সমস্যা। অজস্র কারণে শরীরে রোগ ঢুকে পড়ে। রক্ত দেওয়া তো অনেক বড় জিনিস। চুল, দাড়ি কাটতে

গিয়ে, বিউটি পার্লারে সাজগোজ করতে গিয়ে বা দাঁত তুলতে গিয়েও শরীরে জীবাণু নিয়ে ফিরতে পারেন। হেপাটাইটিস বি র ক্ষেত্রেও এরকম হতে পারে। তবে টিকা নেওয়া থাকলে সে সমস্যা থাকে না।

প্র : হেপাটাইটিস এ এবং বি-র টিকা কি সবাইকেই নিতে হবে?

উ : নিয়ে নেওয়াই ভাল। তবে সবক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় না। তাই অধিকাংশ সময় শুধুমাত্র দুর্বল, অসুস্থ বাচ্চাদের হেপাটাইটিস এ র টিকা দেওয়া হয়। বি-র টিকা সবার নেওয়া উচিত। বিশেষ করে স্কুলপড়ুয়া বাচ্চা, হাসপাতাল, নার্সিংহোমে যাঁরা কাজ করেন এবং রোগের কারণে বারবার যাঁদের রক্ত দিতে হয়।

প্র : হেপাটাইটিস এ থেকে ই-সব রোগেই কি উপসর্গ এক?

উ : মোটামুটি এক। রোগ খুব প্রবল ভাবে চেপে ধরলে বমি বমি ভাব, বমি হওয়া, জ্বর, গা হাত পা ব্যথা, দুর্বলতা, পেট ব্যথা, হলুদ প্রস্রাব, সাদা স্টুল, জন্ডিস, চুলকুনি ইত্যাদি থাকে। তাৎক্ষনিক প্রবল জন্ডিস এক অর্থে ভাল, কারণ রোগ ধরা পড়ে চটপট। সমস্যা হয় মেয়াদি হেপাটাইটিসে। ক্লান্তি, খেতে ভাল না লাগা, অল্প জন্ডিস, পেটে অস্বস্তি, ব্যথা— ইত্যাদি উপসর্গকে সাধারণ মানুষ গ্যাস্ট্রাইটিস বলে ধরে নেন। কিন্তু তলে তলে লিভার জখম হতে থাকে।

প্র : জখম বলতে? সিরোসিস?

উ : সিরোসিস, ক্যান্সার দুইই হতে পারে।

প্র : হেপাটাইটিস কতদিন ধবে চলতে থাকলে এরকম হতে পারে?

উ : ৮-১০ বছর। এই সমস্যাটা বেশি বাধায় হেপাটাইটিস সি।

প্র : হেপাটাইটিস এ থেকে ই-সব রোগেই তো একই রকম উপসর্গ বললেন। আবার কখনও উপসর্গ থাকেও না। এদের মধ্যে থেকে হেপাটাইটিস সি তবে চেনা যাবে কীভাবে?

উ : প্রথমে রক্তের লিভার ফাংশন টেস্ট কবতে হবে। দেখা যাবে এস জি পি টি বেড়ে গেছে। এস জি পি টির মাত্রা ৭-৮ দিন পরে পবে ওঠানামা করবে। হাত দিয়ে বোঝা যাবে লিভার আকারে বড় হয়েছে। এটাই হেপাটাইটিস সি। এছাড়া কী ধরণের হেপাটাইটিস হয়েছে জানতে হেপাটিক প্রোফাইল করা যেতে পারে।

প্র : হেপাটিক প্রোফাইল তো খুবই খরচ সাপেক্ষ ব্যাপার।

উ : হ্যাঁ, প্রায় ৫-৭ হাজাব টাকা খরচ।

প্র : হেপাটিক প্রোফাইল না করে হেপাটাইটিস চেনবার পথ নেই?

উঃ চেনা যায় না তা নয়। যেমন, হেপাটাইটিস এ এবং ই সবসময়ই আকস্মিক ভাবে প্রবল রূপে দেখা দেয়। বি দু'ভাবেই হতে পারে। আকস্মিক এবং মেয়াদি। সি কেবল মেয়াদি। মেয়াদি হেপাটাইটিসের বেলায় যদি রক্ত দেওয়ার দু'তিন সপ্তাহ পরে অল্প জন্ডিস, দুর্বলতা, হাতপা ব্যথা, জ্বর, ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সেটা হেপাটাইটিস সি। লিভারের আকার এবং এস জি পি টি-র চরিত্র দেখে মোটামুটি রোগ নির্ণয় হয়ে যায়। হেপাটাইটিস বি-র পরীক্ষা খুব একটা খরচ সাপেক্ষ নয়।

প্র : বর্ষাকালে যে জন্ডিসের প্রকোপ বাড়ে সেটা কি হেপাটাইটিস এ এবং ই র জন্য?

উ : হ্যাঁ, এই দুটিই মূলত দূষিত জলের মাধ্যমে ছড়ায়।

প্র : হেপাটাইটিস এ এবং ই তো বোধহয় সেরকম সমস্যা দেয় না?

উ : হ্যাঁ, রোগ নির্ণয় হয় সহজে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাবধানতা এবং সামান্য কিছু ওষুধ পত্রের সাহায্যে সহজেই রোগ সারিয়ে তোলা যায়। তবে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হেপাটাইটিস এ এবং ই কখনও মারাত্মক রূপ নেয়। আর গর্ভবর্তী মহিলাদের ক্ষেত্রে হেপাটাইটিস ই।

প্র : মারাত্মক রূপ মানে?

উ : হেপাটিক কোমা, সেখান থেকে শতকরা ২০ ভাগ ক্ষেত্রে মৃত্যু হয়।

প্র : কিছু সাবধানতার কথা বলুন যাতে এরকম অবস্থায় পড়তে না হয়।

উ: হেপাটাইটিস-এর প্রতিষেধক নেওয়া এবং জল ভাল করে ফুটিয়ে খাওয়া।

প্র : সব ধরনের হেপাটাইটিসেরই কি একই চিকিৎসা?

উ: সব ক্ষেত্রেই মোটামুটি খাওয়া দাওয়ার কিছু সাবধানতা এবং বিশ্রাম নিতে বলা হয়। ভিটামিন এবং বমি কমানোর ওষুধ ছাড়া ওষুধের তেমন ভূমিকা নেই। তবে প্রথম পর্যায়ে ধরা পড়লে ৩০-৪০ শতাংশ হেপাটাইটিস সি তে আক্রান্ত রোগীকে সিরোসিস অফ লিভাব বা লিভাব ক্যান্সারের হাত থেকে বাঁচানো যায় ইণ্টাবফেরন এবং রিবাভেরিনের সাহায্যে। বি-র ক্ষেত্রে ইণ্টারফেরন আর ল্যামিভিউডিন।

প্র : সে তো খুবই খরচ সাপেক্ষ ব্যপার।

উ : হ্যাঁ, পুরো চিকিৎসার খরচ প্রায় এক থেকে দেড় লাখ টাকা ।

প্র : হেপাটাইটিস বি কি সি এর মতোই মারাত্মক ?

উ: রোগ হিসেবে দুইই প্রায় সমান মারাত্মক। তবে হেপাটাইটিস বি-এর প্রতিষেধক আছে, রোগ নির্ণয়ও সহজে করা যায় ফলে সমস্যাএত জটিল হয়ে পড়ে না।

প্র : হেপাটাইটিস বি তো ছোঁয়াচে?

উ : ছোঁয়াচে বলতে রক্ত, থুতু, বীর্য ইত্যাদির মাধ্যমে ছড়ায়। বাড়িতে একজনের যদি রোগটি থাকে বাড়ির শতকরা ৩০ জনের অন্তত রোগটি থাকবে। আমার এক রোগী আছেন, তাঁদের বাড়ির ২২ জন সদস্যের মধ্যে ১৮ জনেরই হেপাটাইটিস বি আছে।

প্র : হেপাটাইটিস বি হলে তাহলে কী করব?

উ : যথাশীঘ্র সম্ভব চিকিৎসা করে সুস্থ হতে হবে। এবং বাড়ির অন্যদের প্রতিষেধক নিতে হবে। কারণ আগেই বলেছি হেপাটাইটিস বি এবং সি মেয়াদি হয়ে গেলে সিরোসিস অফ লিভার বা লিভার ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

প্র : বেশি অ্যালকোহল খেলে তো শুনেছি লিভার সিরোসিস হয়?

উ : হ্যাঁ, অ্যালকোহল থেকেও হয়। হেপাটাইটিস, উইলসন ডিজিজ, অটোইমিউন ডিসঅর্ডার ইত্যাদি রোগের জন্যেও সিরোসিস হতে পারে।

প্র : সিরোসিস হলে রোগী বাঁচে?

উ : সেটা রোগের পর্যায়ের ওপর নির্ভব করে। সিরোসিসে লিভার কোষ মরতে থাকে।

যদি সেটা খুব ধীরে ধীরে হয় অনেকদিন পর্যন্ত তা নাও জানতে পারা যেতে পারে। কিন্তু অ্যাকটিভ সিরোসিসে দ্রুত রোগীর অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। এবং ৭ বছরের মধ্যে শতকরা ৬০ থেকে ৭০ জন এতে মারা যান।

প্র : কী দেখে বোঝা যাবে অ্যাকটিভ লিভার সিরোসিস হয়েছে?

উ : পেটে জল জমবে, পা ফুলে যাবে, খিদে এবং ওজন কমতে থাকবে, হলুদ হয়ে যাবে শরীর, রোগী ভুলও বকতে পারে। এই অবস্থায় সহজেই সংক্রমণ হয় শরীরে। রক্তবমি এবং কালো পায়খানাও হওয়া সম্ভব।

প্র : অ্যাকটিভ লিভার সিরোসিসের কোনও চিকিৎসা নেই?

উ : এক্ষেত্রে লিভার কোষ প্রায় সবই মরে যায়। লিভার ট্রান্সপ্লান্ট করে একমাত্র বাঁচানো সম্ভব।

প্র : দীর্ঘদিন ধরে আমাশায় ভুগলে নাকি লিভার অসুস্থ হয়ে পড়ে?

উ : আমাশার জীবাণু এন্টামিবা হিস্টালাইটিকা অনেক সময় তার ঘাঁটি সিকাম থেকে রক্তবাহী নালির মাধ্যমে লিভার পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ধীরে ধীরে লিভারে ছোট থেকে বড় মাপের এক বা একাধিক ফোঁড়া দেখা দেয়। একে বলে অ্যামিবিক লিভার অ্যাবসেস। এই অ্যাবসেস বড় হয়ে ফেটে গেলে খুবই বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে।

প্র : কী করে বোঝা যাবে অ্যামিবিক লিভার অ্যাবসেস হয়েছে?

উ : ওপর পেটের ডানদিকে ব্যথা, জ্বর এবং কিছুক্ষেত্রে অল্প জন্ডিসও থাকতে পারে। ওপর পেটের অ্যালট্রাসনোগ্রাফি করে লিভার অ্যাবসেস দেখতে পাওয়া যাবে।

প্র : এর চিকিৎসাও কি আমাশার মতো মেট্রোনিডাজোল দিয়ে হবে?

উ : হ্যাঁ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশ আছে গ্রামাঞ্চলে যদি কারোর ডানদিকে পেট ব্যথা এবং জ্বর ২৪ ঘন্টার বেশি থাকে তাকে মেট্রোনিডাজোল দিতে হবে।

প্র : আর হেপাটিক অ্যামিবিয়োসিস?

উ : এরও উপসর্গ এবং চিকিৎসা অ্যামিবিক লিভার অ্যাবসেসের মতো।

প্র : লাগাম ছাড়া ওষুধ খেলে নাকি লিভারের উপর চাপ পড়ে?

উ : কিছু ওষুধের বিরূপ প্রভাব আছে লিভারের উপর। যেমন টিবি, আর্থাইটিসের ওষুধ, অবসাদ কমানোর ওষুধ, প্যারাসিটামল ইত্যাদি। তবে ডাক্তারের পরামর্শমতো সঠিক মাত্রায় খেলে তেমন অসুবিধে হয়না।

প্র : লিভার ঠিক রাখার জন্য তো নানারকম ওষুধ পাওয়া যায়?

উ : কোনও ওষুধের সাহায্যে লিভার ঠিক রাখা যায় না।

প্র : তাহলে লিভারের সুস্থতার জন্য কী করতে হবে?

উ : পুষ্টিকর সহজ পাচ্য খাবার খেতে হবে, মদ্যপান চলবে না, কোষ্ঠবদ্ধতা যাতে না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে, কথায় কথায় ওষুধ খাওয়া চলবে না, লিভারকে আক্রান্ত করতে পারে এমন অসুখ যেমন, আমাশা থেকে শুরু করে হেপাটাইটিস প্রতিরোধ করার চেষ্টা করতে হবে।

মানসিক চাপ বাড়লে আই বি এসের প্রকোপ বাড়ে

ডাঃ সব্যসাচী পট্টনায়ক

দূরভাষ ৯৮৩০০-৫৭৬২১

প্র: ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম কি মানসিক রোগ?

উ: ঠিক তা নয়। আসলে অবসাদগ্রস্ত বা অল্পেই উত্তেজিত হয়ে পড়েন এমন মানুষের মধ্যে আই বি এস বেশি দেখা যায়। আবার খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী, নানা রকম চিন্তাভাবনায় জর্জরিত মানুষের অনেকেও এই রোগে ভোগেন বলে এরকম একটা ধারণার জন্ম হয়েছে।

প্র: কিন্তু আপনারাই তো বলেন আই বি এসে পেট এবং মন দুইই যুক্ত থাকে।

উ: সে তো নিশ্চয়ই। আই বি এস এমন একটা পেটের অসুখ যেখানে যুক্ত থাকে ব্রেন এবং গাট। কিন্তু এটা পেটের অসুখই। মানসিক রোগ নয়।

প্র: এর চিকিৎসায় যে অনেক সময় দুশ্চিন্তা কমানোর ওষুধ দেওয়া হয়?

উ: প্রতিটি অসুখেরই বাড়া কমার পেছনে কোনও না কোনও কারণ থাকে। দেখা গেছে অশান্তি, দুশ্চিন্তা বাড়লে আই বি এসের প্রকোপ বাড়ে। তাই. দুশ্চিন্তা কমানোর ওষুধ দেওয়া হয় অনেক সময়।

প্র: তার মানে অশান্তি-উদ্বেগ থেকে যে পেটের অসুখ হয় তাই আই বি এস? তাহলে পরীক্ষার সময় যে লাগাতার পেটের অসুখ চলে সেটাও আই বি এস?

উ: না, অশান্তি উদ্বেগ থেকে আই বি এস হয় সেটা ঠিক নয়। পরিসংখ্যান বলছে যাঁরা অশান্তি উদ্বেগে ভোগেন তাঁদের আই বি এস বেশি হয়। দুটো কথা এক নয়। পরীক্ষার সময় যে ডায়েবিয়া হয় তাকে বলে 'নার্ভাস ডায়েরিয়া'। পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে ডায়েরিয়া ঠিক হয়ে যায়। অর্থাৎ এটা সাময়িক সমস্যা। আই বি এস সারাজীবন জ্বালায়।

প্র: তার মানে আই বি এসের সমস্যা জীবনভর থাক বে?

উ: মোটামুটি কিছু না কিছু লেগেই থাকবে। একেক সময় একেকটা। কখনও ডায়েরিয়া। কিছুদিন হয়তো ঠিক। আবার কনস্টিপেশন, আবাব ডায়েরিয়া। আপনি বুঝে উঠতে পারবেন না যে কী এমন খেয়েছিলেন যে ডায়েরিয়া হল। অথবা নিয়ম মাফিক

ইসবগুল খাওয়া সত্ত্বেও কেন কনস্টিপেশন হচ্ছে। কখনও দেখবেন বুক পেটের সংযোগস্থলে ব্যথা হচ্ছে। কখনও অম্বল। কোথাও কিছু নেই শুরু হল হজমের গণ্ডগোল, গ্যাস। অশান্তি উদ্বেগ বাড়ল তো সমস্যা বেড়ে গেল বহুগুণ। এরকমই পর্যায়ক্রমে ভাল থাকা মন্দ থাকা নিয়ে জীবন কাটবে।

প্র: ভাল থাকার কথা আর কোথায় বললেন?

উ: ভালও থাকবেন। ২-৩ মাস, ৬ মাস এমনকি ভাল থাকার সময়টা বছর খানেকও হতে পারে। তবে তা নির্ভর করবে আপনি ঠিক ঠিক সাবধানতা মেনে চলছেন কিনা তার ওপর।

প্র: কী কী সাবধানতা মেনে চললে ভাল থাকা যাবে?

উ: মানসিক চাপ, অশান্তি কম করতে হবে। দরকার হলে দুশ্চিন্তা কমানোর ওষুধপত্রও খেতে হতে পারে। নিয়মিত হাল্কা ব্যায়াম করতে হবে। আর খাওয়া দাওয়া হবে একেবারে নিয়মমাফিক এবং হালকা। রোজ দু'তিন চামচ করে ইসবগুলের ভুষি খেতে হবে দুপুরে এবং রাত্রে। কিছু খাবার আছে যেগুলি আই বি এসের প্রকোপ বাড়ায় যেমন, চা, কফি, দুধ, আটা, ময়দা এবং কম ফাইবারযুক্ত খাবার। তবে কার কোনটা থেকে হবে বা আদৌ হবে কিনা সেটা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

প্র: এই সমস্ত সাবধানতা মেনে চললে পেটের অসুখ কম হবে ?

উ: তা নয়। তবে হলেও কমসম হবে। এছাড়া আরও একটা কথা আছে। আপনার আই বি এস আছে বলে অন্য কোনও পেটের অসুখ হবে না তা নয়। অনেকে এক টা সময় তিতিবিরক্ত হয়ে যা খুশি খেতে শুরু করেন। যেখান সেখানকার খাবার, জল। ফলে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস বা প্রোটোজোয়া ঘটিত পেটের অসুখেও আক্রান্ত হতে থাকেন।

প্র: অম্বল, গ্যাস, ডায়েরিয়া, কনস্টিপেশন সারাজীবন টেনে বেড়াতে হবে। এর কোনও চিকিৎসা নেই?

উ: শুধু এই সব উপসর্গই নয় , আরও কিছু থাকতে পারে। বারবার প্রস্রাবের বেগ, পিঠ কোমর ব্যথা, মাথা ব্যথা, মহিলাদের ঋতু চলাকালীন ব্যথা ইত্যাদি। আই বি এসের চিকিৎসা মূলত উপসর্গ ভিত্তিক। যেমন, ডায়েরিয়া হলে লোপারামাইড বা কোডেইন গ্রুপের ওষুধ খেতে হবে। পেট ব্যথায় মেবেভেরিন বা ডাই সাইক্লোমিন জাতীয় ওষুধ, কনস্টিপেশনে ল্যাক্সেটিভ বা ইসবগুল। এর সঙ্গে দরকার মানসিক প্রস্তুতির। বারবার ঘুরে ফিরে সমস্যা দেখা দেবে, এটা মেনে নিতে পারা খুব জরুরি।

প্র: অল্প বয়সে না হয় মেনে নেওয়া গেল, বয়স বাড়লে কী হবে?

উ: কিছুই হবে না। আই বি এস জীবনের অঙ্গ হয়ে যাবে। আর সত্যি কথা বলতে কী আই বি এস বিরক্তিকর অসুখ। মারাত্মক তো নয়।

প্র: আই বি এসের যে সমস্ত উপসর্গের কথা বললেন তা তো কোলাইটিসেও হয়। কিন্তু কোলাইটিসের চিকিৎসা তো আপনারা উপসর্গ ধরে করেন না।

উ: শুধু কোলাইটিস কেন আই বি এসের উপসর্গের সঙ্গে মিল আছে অনেক অসুখের। যেমন, আলসারেটিভ কোলাইটিস, ইনফ্ল্যামেটরি বাওয়েল ডিজিজ, অ্যামিবিক বা

ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রি, ডাইভার্টিকুলার ডিজিজ অফ কোলন, কোলন ক্যানসার, ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস, প্যানক্রিয়াস ক্যানসার, পেপটিক আলসার ইত্যাদি। কিন্তু সব ক্ষেত্রে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে রোগের কারণ ধরা পড়ে। তাই উপসর্গ ধরে নয় কারণ ধরে চিকিৎসা হয়। কিন্তু আই বি এসে কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্র: তাহলে কী করে বোঝা যাবে রোগটা আই বি এস?

উ: নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা যেমন, এক্সরে, আলট্রাসনোগ্রাফি, রুটিন ব্লাড টেস্ট, আপার জি আই এণ্ডোস্কোপি, কোলনোস্কোপি ইত্যাদি করে কিছু পাওয়া না গেলে আই বি এসের সন্দেহ মনে আসে। আরও ব্যয়বহুল কিছু পরীক্ষা যেমন, সিটি স্ক্যান বা এম আর আই করেও যদি কিছু না পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে বলা যায় রোগটা আই বি এস।

প্র: এমনও তো হতে পারে, কিছু খুঁজে না পেয়ে বলে দিলেন আই বি এস আছে। অথচ ছিল হয়তো কোনও জটিল রোগ?

উ: সচরাচর তা হয় না। কারণ যে কোনও গ্যাস্ট্রোএনটেরোলজির আউটডোরে যত রোগী আসেন তার ৩০-৪০ শতাংশ আই বি এসে আক্রান্ত। এদের চেহারা ছবি, কথাবার্তা, উপসর্গ দেখে এবং কোনও পরীক্ষা নিরীক্ষাতেই কিছু না পাওয়া গেলে মোটামুটি নিশ্চিতভাবে বলা যায় রোগটা আই বি এস।

প্র: সারাজীবন ধরে যে এই রোগটা চলবে এতে শরীরের কোনও ক্ষয়ক্ষতি হবে না?

উ: রোগটা সারাজীবন লাগাতার চলবে তা তো নয়। মাঝে মধ্যে ঘুরে ফিরে আসবে। যথেষ্ট সাবধানতা নিলে অনেক দিনই ভাল থাকা যাবে। তবে সমস্যা যখন দেখা দেবে উপসর্গ অনুযায়ী চিকিৎসা না হলে সাময়িক দুর্বলতা দেখা দিতে পারে। তবে এর জন্য স্থায়ী ক্ষতি তেমন কিছু হয় না।

প্র: যে কোনও বয়সেই কি এই রোগ হতে পারে?

উ: যে কোনও বয়সে হতে পারে। তবে বেশি হয় ২০-৩০ বছরের মধ্যে। এবং আমাদের দেশে ছেলেদের রোগটি বেশি হয়। মেয়েদের তুলনায় প্রায় ৫ গুণ। তবে আজকাল মেয়েদের মধ্যেও প্রকোপ বাড়ছে।

প্র: কেন?

উ: বোধহয় অশান্তি, উদ্বেগ বাড়ছে বলে।

গেঁটে বাত চোখেও হতে পারে

অধ্যাপক (ডাঃ) সুকুমার মুখোপাধ্যায়

দূরভাষ : ২৪৪-৮০১২

প্র : সকালে উঠে গা হাত পা কোমর ভারী ভারী। কখনও কখনও হাঁটু, কখনও বা গোড়ালি ব্যথা। আবার বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কমতে থাকা। এটাই কি আর্থাইটিস?

উ : হ্যাঁ, এটা এক ধরনের আর্থাইটিস।

প্র : আর্থাইটিস কি মহিলাদের বেশি হয়?

উ : আর্থাইটিস নানা রকমের। ওপরে যে লক্ষণগুলির কথা বলা হয়েছে তা রিউম্যাটয়েড আর্থাইটিস বা গেঁটে বাতের। গেঁটে বাত মহিলাদের বেশি হয়। আগে অবশ্য যেঁকোনও দীর্ঘস্থায়ী গাঁটের ব্যথাকেই গেঁটে বাত বলা হত। আজকাল রিউম্যাটয়েড আর্থাইটিসকে বলা হয়।

প্র : এর থেকেই কি ভবিষ্যতে হার্টের ভাল্‌ভ খারাপ হয়ে যায়?

উ : না, সেটা রিউম্যাটিক আর্থাইটিস। ১০-১৫ বছর আগে পর্যন্ত প্রচুর দেখা যেত। কিন্তু ইদানীং শহরাঞ্চলে তো বটেই গ্রামের দিকেও এ রোগের প্রকোপ খুব কম।

প্র : গেঁটে বাত কি চোখেও হতে পারে?

উ : কারোর ক্ষেত্রে গেঁটে বাতের সূত্রপাতে অল্প জ্বর, একটা বা দুটো চোখ টকটকে লাল হয়ে যেতে পারে। একে বলে এপিস্‌ক্লেরাইটিস আইরাইটিস, চোখের বাতও বলা হয়। এরপর ধীরে ধীরে শরীরের ছোট ছোট গাঁটগুলিতে ব্যথা শুরু হয়ে যায়।

প্র : রিউম্যাটয়েড আর্থাইটিস সারে ?

উ : আমরা বলি 'রিলাপ্‌স অ্যান্ড রেমিশন'। ওষুধ নিয়মিত খেলে শতকরা ৭০ ভাগ ক্ষেত্রে এরকম হয়। শতকরা ১৫ জন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যান। বাকী ১৫ জনের রোগ কিন্তু সারে না।

প্র : তার মানে শতকরা ৮৫ ভাগ ক্ষেত্রে সারবে না?

উ : আজকাল এত ভাল ওষুধ বেরিয়ে গেছে যে প্রথম অবস্থা থেকে চিকিৎসা করালে যথেষ্ট ভাল থাকা যায়। চিকিৎসা না করালে কিন্তু অচিরেই শয্যাশায়ী হয়ে পড়তে

হবে।

প্র : এর চিকিৎসা কি খুবই খরচ সাপেক্ষ?

উ : রোগের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে মাসে মোটামুটি হাজার টাকার মতো। ১০-১৫ বছর ধরে টানা চিকিৎসা চলতে পারে। এবং সব কিছু করে যাওয়া সত্ত্বেও মাঝে মধ্যে কষ্ট পাওয়ার ব্যাপারটা থেকে যায়। অনেকে তার ফলে মনের জোর হারিয়ে ফেলে চিকিৎসা বন্ধ করে দেন।

প্র : রিউম্যাটয়েড আর্থাইটিসের যন্ত্রণা কি খুবই মারাত্মক?

উ · হ্যাঁ, গাঁটগুলো ফুলে গরম হয়ে মারাত্মক ব্যথা হতে পারে কখনও। বিভিন্ন গাঁটে ব্যথাটা ঘুরে বেড়ায়। ব্যথা শরীরের দু'দিকেই সমান ভাবে হয়। যেমন দু'হাঁটুতে বা দু' গোড়ালিতে। দু' কব্জিতে বা দু' কনুইয়ে। হাতের ছোট গাঁটগুলিতেই ব্যথা হয় বেশির ভাগ সময়।

প্র : ব্যথা হলে কী করব?

উ : খুব ব্যথা হলে এবং ফুলে গেলে বরফের সেঁক দিতে হবে। ডাক্তারের পরামর্শমতো ওষুধ খেতে হবে প্রয়োজনে বিশ্রাম নিতে হতে পারে।

প্র : এই ধরনের ব্যথায় গরম সেঁকের কোনও ভূমিকা আছে?

উ : ব্যথায় নেই। তবে গাঁটগুলিকে চালনা করতে অসুবিধে হলে গরম সেঁক দেওয়া যেতে পারে।

প্র : আর ফিজিও থেরাপি বা আলট্রাসোনিক রে?

উ : খুবই প্রয়োজন। চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে ফিজিওথেরাপি, আলট্রাসোনিক রে, ওয়া' বাথ সবই দরকার হয় পর্যায় ক্রমে।

প্র : এই রোগে ব্যবহৃত ওষুধের তো শুনেছি খুবই খারাপ প্রতিক্রিয়া আছে শরীরে?

উ : যাই থাক ওষুধ খেতে হবে এবং খুব কড়া ভাবে ডাক্তারি তত্ত্বাবধানে। অনেক সময় রোগ আয়ত্তে রাখতে ২-৩ রকমের ওষুধ যেমন, স্যালাজোপাইরিন. মেথোট্রিক্সেট, ক্লোরোকুইন ইত্যাদি মিলিয়ে মিশিয়ে দিতে হয়। এবং ৩-৪ সপ্তাহ বাদে বাদে রক্ত পরীক্ষা করতে হয়। কারণ ডোজ বেশি হয়ে গেলে কিছু ক্ষেত্রে লিভার বা চোখের ক্ষতি হতে পারে। বোনম্যারো ডিপ্রেশনও হওয়া সম্ভব।

প্র : স্টেরয়েডও ব্যবহার করতে হয়?

উ : রোগীর অবস্থা খারাপ হয়ে গেলে দিতে হয়। তারপব আস্তে আস্তে কমিয়ে একটা নির্দিষ্ট মাত্রা বজায় রাখতে হয় বেশ কিছুদিন।

প্র : স্টেরয়েড একবার ব্যবহার করলে নাকি অন্য ওষুধ আর কাজ করে না?

উ : খেতে খেতে আচমকা বন্ধ করে দিলে অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড কাজ করা বন্ধ করে দিতে পারে। এছাড়া ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে স্টেরয়েড খাওয়া, বন্ধ করা বা অন্য ওষুধের কার্যকারীতা কোনও কিছুতেই কিছু অসুবিধে নেই।

প্র : রিউম্যাটয়েড আর্থাইটিসের চিকিৎসা কি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক করবেন না অর্থোপেডিক সার্জেন?

উ : এটা একার কাজ নয়। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক যেমন থাকবেন, তেমনই থাকবেন ফিজিক্যাল

মেডিসিনের ডাক্তার। অপারেশনের জন্য তো অর্থোপেডিক সার্জেনের সাহায্যই দরকার পড়বে ।

প্র : এতসব চিকিৎসা করার পরও অপারেশনের দরকার পড়বে?

উ : সঠিক চিকিৎসা করানোর পরও শতকরা ১৫ জন রোগীর অবস্থা খারাপ হতে পারে। এই সংখ্যাটা তুলনামূলক ভাবে কম। বেশির ভাগ রোগীর অবস্থা খারাপ হয় সঠিক চিকিৎসার অভাবে। এসব ক্ষেত্রে অপারেশন দরকার হয়।

প্র : কী অপারেশন?

উ : অবস্থা বুঝে ৩ ধরনের অপারেশন করা যেতে পারে। যেমন,

(১) সাইনোভেকটমি। শরীরের সমস্ত গাঁট আলাদা আলাদা ভাবে সাইনোভিয়াম নামে পর্দার আড়ালে থাকে। প্রদাহের পর্দা ভেদ করে গাঁটে ছড়িয়ে পড়া রুখতে এই অপারেশন করা হয়। এক্ষেত্রে পুরো পর্দাটাকে চেঁছে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়।

(২) আর্থোপ্লাস্টি অপারেশনের সাহায্যে ক্ষতিগ্রস্ত গাঁট মেরামত করা যায়।

(৩) মেরামতের অযোগ্য গাঁট বাতিল করে নতুন নকল গাঁট বসানো হয়- জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট করে।

প্র : কোনও সাবধানতা নেই যা মেনে চললে রোগটা হবে না?

উ : রোগটি হয় শরীরের রোগ প্রতিরোধী ব্যবস্থায় কিছু ত্রুটি হলে। সেভাবে একে প্রতিরোধ করা যায় না। তবে কিছু কিছু সাবধানতা মেনে চললে এর প্রকোপ কমানো যেতে পারে। যেমন,

(১) ওজন ঠিক রাখা। ওজন বেড়ে গেলে হাঁটু এবং গোড়ালিতে চাপ পড়ে। এই দু'জায়গা যদি আক্রান্ত হয়ে থাকে ওজন বাড়লে শয্যাশায়ী হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

(২) নিয়মিত মাছ খেলে রোগের প্রকোপ কম থাকতে পারে।

(৩) হাঁটাচলার অভ্যেস বজায় রাখা।

(৪) রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেলেই ডাক্তার দেখানো।

প্র : রিউম্যাটয়েড আর্থাইটিসের প্রকোপ কি খুব বেশি?

উ : হ্যাঁ, আমাদের দেশে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮ জন রিউম্যাটয়েড আর্থাইটিসে আক্রান্ত। এর মধ্যে বেশ কিছু আবার এস এল ই-তে ভোগেন।

প্র : এস এল ই কী?

উ : সিস্টেমিক লুপাস এরিথিমেটোসাস। অল্প বয়সী মেয়েদের হয়। রিউম্যাটয়েড আর্থাইটিসের সঙ্গে এই রোগ অনেক সময় গুলিয়ে যায়। গাঁয়ে: ব্যথা, জ্বর, চোখ লালের সঙ্গে এক্ষেত্রে মুখে ঘা থাকে। চুল পড়ে যেতে থাকে। পিরিয়ডের সময় সমস্যা বাড়ে।

প্র : চিকিৎসায় সারে এস এল ই?

উ : আয়ত্তে থাকে। তবে রোগ অনেক সময় ধরা পড়ে দেরিতে। আর দেরি হলে ব্রেন, হার্ট, কিডনি, চোখ, চামড়া সর্বত্র রোগ ছড়িয়ে গেলে সারিয়ে তোলা কঠিন হয়ে যায়।

প্র : এই রোগ প্রতিরোধেরও কোনও রাস্তা নেই?

উ : রোগ ধরা পড়া মাত্র ধৈর্য ধরে চিকিৎসা করা ছাড়া আর তেমন কিছু করার নেই। তবে, রোদে বেরোলে এদের চামড়ায় অ্যালার্জি বের হয় অনেক সময়। কাজেই রোদে বেরোনো বন্ধ করতে পারলে ভাল। নয়তো ছাতা, সানগ্লাস, সানব্লক ক্রিম ব্যবহার করতে হবে। দ্বিতীয় সাবধানতা, ডাক্তারকে না বলে কোনও ওষুধ খাওয়া চলবে না। কারণ এদের বিভিন্ন ওষুধেই বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

প্র : এর চিকিৎসাও কি রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের মতোই?

উ : অধিকাংশ সময় ক্লোরোকুইন দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। অবস্থা ভেদে দীর্ঘমেয়াদি স্টেরয়েডও দেওয়া হয়।

মোটা মানুষদের অস্টিও আর্থ্রাইটিস বেশি হয়

প্র . দু'বছর আগে হাঁটুতে চোট লেগেছিল। এখনও ব্যথা জানান দেয়।

উ : চোটের সঙ্গে এই ব্যথার সম্পর্ক নাও থাকতে পারে। যে সময় হয়তো কার্টিলেজে আঘাত লেগেছিল। এখন অস্টিও আর্থ্রাইটিসের সূত্রপাত হয়েছে।

প্র : অস্টিও আর্থ্রাইটিস যে কোনও বয়সে হতে পারে?

উ : সাধারণত ৬০ বছর বয়সের পরে অসুখটি হয়। তবে চোট আঘাত অনেক সময় ব্যাপারটাকে ত্বরান্বিত করে।

প্র : ঘর মোছা, উবু হয়ে বসে রান্না করা এসব কারণে নাকি আগেকার দিনে মেয়েদের হাঁটুতে অস্টিও আর্থ্রাইটিস হতনা?

উ : এই ধারণা ঠিক নয়। মোটা না হলে মেয়েদের অস্টিও আর্থ্রাইটিস একটু কমই হয়। বেশি হয় খেলোয়াড় এবং নর্তকীদের।

প্র : কেন?

উ : অতি ব্যবহারের ফলে। শরীরের সমস্ত ওজন বহন করে হাঁটু এবং কোমর। এমনিতেই এদের ওপর চাপ বেশি। তার ওপর বেশি নাড়াচাড়া করলে কার্টিলেজের ক্ষয় বেশি হয়ে অস্টিও আর্থ্রাইটিসের সূত্রপাত হতে পারে।

প্র : অনেকে বলেন কমোড ব্যবহারের ফলে এ সমস্ত রোগের সৃষ্টি।

উ : না। হাঁটু এবং কোমরের উপর অনাবশ্যক চাপ এড়াতে কমোডই ব্যবহার করা উচিত। হাঁটু গেড়ে নামাজ পড়ার ফলে মুসলমানদের মধ্যে এর প্রকোপ বেশি।

প্র : আর সিঁড়ি ওঠা নামা?

উ : যত কম করা যায় তত ভাল।

প্র : হাঁটু এবং কোমর ব্যথা মানেই কি অস্টিও আর্থ্রাইটিস?

উ : বয়স যদি ৬০-এর ওপরে হয়, হাঁটু বা কোমরে ব্যথা এবং ফোলা ভাব থাকে, বা সিঁড়ি ওঠানামা করতে কষ্ট হয় বিশেষ করে নামতে, অস্টিও আর্থ্রাইটিসের কথা ভাবতে হবে।

প্র : এ তো হাড়ের জরা। সারিয়ে তোলা যায়?

উ : এই রোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয় কার্টিলেজ। রোগ খুব বেশি দূর এগিয়ে না গেলে কার্টিলেজের দুই উপাদান গ্লাইকোসামিন এবং কোনড্রয়টিন খাবারের মাধ্যমে শরীরে জোগান দিয়ে রোগের অগ্রগতি ঠেকানো যায়। এছাড়া ব্যবহার করা হয় কিছু নন স্টেরয়ডাল অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি ড্রাগ (এন এস এ আই ডি) এবং প্রয়োজন বোধে সেলিকক্সিব, রফিকক্সিব বা নিমেসুলাইড গোত্রের ব্যথা কমার ওষুধ। ফিজিওথেরাপির সাহায্যে হাঁটু, কোমর সচল রাখা সম্ভব।

প্র : অস্টিও আর্থাইটিসের রোগী তো শেষ অবধি লাঠি নিয়ে চলাফেরা করেন।

উ : হাঁটুর ওপর চাপ কমাতে প্রথমে ওজন কমানোর কথা বলা হয়। পরের ধাপে হাঁটু যথাসম্ভব কম ব্যবহার করা। অর্থাৎ বার বার ওপর নীচ না করা বা সিঁড়ি ওঠানামা একদম বন্ধ করে দেওয়া, বাথরুমে কমোড ব্যবহার করা, হাঁটু মুড়ে না বসা ইত্যাদি। রোগ আরও এগিয়ে গেলে চাপ কমাতে লাঠি ব্যবহার করতে হয় অনেককে।

প্র : হাঁটু বেঁকেও তো যায় অনেকের?

উ : প্রথম দিকে ব্যথা, ফোলা থাকে। ব্যবস্থা না নিলে নড়াচড়ার ক্ষমতা কমে যেতে থাকে। শেষ অবধি বেঁকে যেতে পারে।

প্র : দুটো হাঁটুতে কি একই সঙ্গে রোগটি হয়?

উ : না, প্রথমে একটা হাঁটুতে হয়। পরে দ্বিতীয়টাও আক্রান্ত হতে পারে। আমাদের দেশে হাঁটুতে রোগটি বেশি হয়। কিন্তু বিদেশে বেশি হয় কোমরে। কাঁধেও হয় কখনও।

প্র : রোগটি কি বংশগত?

উ : প্রাইমারি অস্টিও আর্থাইটিস, অর্থাৎ বয়স বাড়ার ফলে যে হাড়ের ক্ষয়, বংশগত কারণে হতে পারে।

প্র : সেকেন্ডারি অস্টিও আর্থাইটিস ব্যাপারটা কী?

উ : কোনও কারণে এই রোগ হলে তাকে সেকেন্ডারী অস্টিও আর্থাইটিস বলে। যেমন, গাঁটে চোট লাগলে, পেশাগত কারণে ইত্যাদি।

প্র : এক্ষেত্রেও চিকিৎসা কি একই রকম?

উ : প্রথমে রোগের চিকিৎসা করতে হবে। তারপর উপসর্গ অনুযায়ী চিকিৎসা।

প্র : হঠাৎ খুব ব্যথা হলে কী করতে হবে?

উ : বরফের পুলটিশ লাগাতে হবে। প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ খাওয়া যেতে পারে। এতেও না কমলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করবেন।

প্র : জয়েন্ট রিপ্লেসমেণ্ট সার্জারি কখন দরকার হয়?

উ : হাঁটু বা কোমরের যখন আর নড়াচড়া করবার বা ভার বইবার ক্ষমতা থাকে না। এবং মারাত্মক ব্যথা হতে থাকে।

প্র : আমাদের প্রধানমন্ত্রীর তো একটা হাঁটুতে অপারেশন করা হল। দু'টো হাঁটু একসঙ্গে দরকার হয় না?

উ : ওঁর ক্ষেত্রে তো শুনছি এখনই দ্বিতীয় হাঁটুর অপারেশন দরকার নেই। কারোর ক্ষেত্রে দুটো হাঁটু একসঙ্গে খারাপ হতে পারে। সেক্ষেত্রেও একসঙ্গে দু'টোতে করা হয় না। প্রথমে একটা হাঁটুতে করে অবস্থাটা যাচাই করে নেওয়া হয়। পরে দ্বিতীয়টার কথা ভাবা হয়।

প্র : কেন, এই অপারেশন থেকে কি কোনও বিপদ হতে পারে?

উ : যে কোনও অপারেশন থেকেই বিপদ হতে পারে। এক্ষেত্রে হাঁটু বা কোমরের মূল গাঁট সরিয়ে দিয়ে চিনেমাটি বা স্টিলের গাঁট বসানো হয়। শরীর তাকে কীভাবে মানতে পারছে, কোনও সংক্রমণ বা অন্য কোনও অসুবিধে হচ্ছে কিনা সেটা দেখে নেওয়া দরকার। যদিও খুব কম ক্ষেত্রেই এই সমস্ত অসুবিধে হয়।

গাউটের রোগী রেড ওয়াইন খাবেন না

প্র : গাউটি আর্থাইটিস কি বংশগত রোগ?

উ : নিকটাত্মীয়দের কারোর থাকলে হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

প্র : রোগটি কি মোটা মানুষদের বেশি হয়?

উ : হ্যাঁ।

প্র : রক্তচাপের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক আছে?

উ : হ্যাঁ, দেখা গেছে যাঁদের রক্তচাপ বেশি তাঁদের কারোর কারোর গাউটও থাকে।

প্র : গাউট কি যে কারোরই হতে পারে?

উ : মধ্যবয়স্ক পুরুষরাই এতে আক্রান্ত হন বেশি।

প্র : কী করে বোঝা যাবে গাউট হয়েছে?

উ : বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভোর রাত্রে হঠাৎ করে পায়ের বুড়ো আঙুলে ব্যথা শুরু হয়। ফুলে যায়। লালও হতে পারে। সঙ্গে কখনও অল্প জ্বর থাকে। প্রথমে একটি গাঁটে ব্যথা হয়। পরে অন্য গাঁটও আক্রান্ত হতে পারে। কিছুদিন ব্যথা ভোগের পর রোগী ভাল হয়ে যান। আবার কয়েক মাস পরে হঠাৎ শুরু হয়। পায়ের আঙুলেই এই রোগ বেশি দেখা যায়। তবে গোড়ালি, পায়ের পাতা, কব্জি, হাতের আঙুলও আক্রান্ত হতে পারে।

প্র : ৪-৫ রকমের আর্থাইটিসের মধ্যে গাউটকে আলাদাভাবে চেনা যাবে কীভাবে?

উ : প্রতিটি আর্থাইটিসের নিজস্ব ব্যথার ধরন আছে। আলাদা আলাদা বয়স আছে। কাজেই বিশেষজ্ঞের পক্ষে চিনে নিতে অসুবিধে হয় না। এছাড়া রক্ত পরীক্ষা, গাঁটের এক্সরে ইত্যাদি তো আছেই।

প্র : রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে গেলে কি গাউট হয়?

উ : হ্যাঁ।

প্র : প্রোটিন, ফ্যাট জাতীয় খাবার কম খেলে এই প্রবণতা বন্ধ করা যাবে?

উ : যে বয়সে রোগটি হয় অর্থাৎ মধ্যবয়সে, প্রোটিন এবং ফ্যাট জাতীয় খাবারে কিছু

বিধি নিষেধ আমরা এমনিতেই করে দিই। ওজন একটু বেশির দিকে থাকলে কড়াকড়িটা বেশি থাকে। তৈলাক্ত মাছ, পাঠা খাসির মাংস, ডিমের কুসুম, বেশি তেল মশলাদার খাবার, ভাজাভুজি ইত্যাদি যথাসম্ভব কমের দিকে রাখতে বলা হয়। অনেকে আছেন, বাড়িতে কারোর গাউট থাকলে, ৪০ বছর বয়েসের পর, আমিষ প্রোটিন একদম বন্ধ করে দেন। এটা ঠিক নয়। শরীরের চাহিদা অনুযায়ী প্রোটিন, ফ্যাট সবই পরিমাণ মতো খেতে হবে। বাদ দিতে হবে রেডওয়াইন, পাঠা-খাসির মাংস এবং গুরুপাক খাবার খাওয়ার অভ্যেস। দেখা গেছে রাত্রে গুরুভোজন এবং মদ্যপান করলে পরদিন সকালে ব্যথা বাড়ে বা শুরু হয়।

প্র : প্রতিভার সঙ্গে রোগটির কোনও যোগ আছে?

উ : আছে বোধ হয়। অনেক প্রতিভাবান মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। হয়তো রক্তে ইউরিক অ্যাসিড বাড়ার সঙ্গে প্রতিভার কোনও সম্পর্ক আছে! একে বলাও হয় 'ওয়াইজ ম্যানস্ ডিজিজ'।

প্র : রক্তে ইউরিক অ্যাসিড বাড়ে কেন?

উ : দু' কারণে বাড়তে পারে। বেশি তৈরি হলে অথবা শরীর থেকে কম পরিমানে বেরোলে। শরীরে বেশি পরিমাণে ইউরিক অ্যাসিড তৈরি হওয়া অধিকাংশ সময়ই পূর্বনির্ধারিত অর্থাৎ জেনেটিক। এ ব্যাপারে ওষুধ দেওয়া ছাড়া খুব একটা কিছু করার নেই। কিডনি অসুস্থ হলে শরীর থেকে ইউরিক অ্যাসিড বেরোনোর পরিমাণ কমে যায়। কিডনির সুস্থতা ফিরে এলে সমস্যার কিছু উন্নতি হতে পারে।

প্র : ল্যাসিক্স, ডাইটাইড জাতীয় ওষুধ দীর্ঘদিন ধরে খেলে রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ বাড়ে?

উ : এইসব ওষুধ ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া দীর্ঘদিন খাওয়া উচিত নয়।

প্র : আচমকা ব্যথা উঠলে কী করতে হবে?

উ : ব্যথা কমাতে আগে কলচিসিন জাতীয় ব্যথার ওষুধ খেতে দেওয়া হত। সহ্য না হলে আইবুপ্রফেন, ইন্ডোমেথাসিন বা ন্যাপ্রোক্সিন জাতীয় ওষুধ। তবে ব্যথা কমানোর ওষুধ বেশি দিন খাওয়া ঠিক নয়। রোগের কারণ কমাতে অ্যালোপিউরিনল খেতে হবে এবং কিছু সাবধানতা মেনে চললে দীর্ঘস্থায়ী উপকার পাওয়া যাবে।

প্র : কী সাবধানতা?

উ : ওজন কম রাখা, রক্তচাপ আয়ত্তে রাখা, কিডনির অসুখ দেখা দিলে যথাশীঘ্র সম্ভব তার চিকিৎসা করা, গুরুপাক খাবার, মদ্যপান যথা সম্ভব কম করা।

প্র : আর ফিজিও থেরাপি?

উ : গাউটের ক্ষেত্রে ফিজিও থেরাপির তত ভূমিকা নেই।

অপুষ্টি থেকেও হাড় ভাঙতে পারে

প্র আগেকার দিনে বয়স্ক বিধবা মহিলারা কুঁজো হতে হতে কেমন একরকম ছোট হয়ে যেতেন। হাড়ের গঠন দুর্বল হয়ে যাওয়ার জন্য কি এরকম হত?

উ: বয়স হলে হাড়ের গঠনে দুর্বলতা আসতে পারে বা হাড়ের উপাদান ক্যালসিয়ামের পরিমাণ কমে যায় অথবা তার চরিত্রে কিছু পরির্বতন আসে। হাড় কমজোর হয়ে যায়। একে বলে অস্টিওপোরোসিস। রজঃনিবৃত্তির পর এমনিতেই অস্টিওপোরোসিসের সম্ভাবনা বাড়ে তার ওপর আগেকার দিনে বিধবাদের খাওয়া দাওয়া ছিল অপুষ্টিকর। ফলে হাড় ফাঁপা, দুর্বল হয়ে পুরো কাঠামোটাই ছোট হয়ে যেত।

প্র: খাওয়া দাওয়ার সঙ্গে অস্টিওপোরোসিসের কোনও সম্পর্ক আছে?

উ· অবশ্যই। খাবারে ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি-র অভাব থাকলে অস্টিওপোরোসিসের সম্ভাবনা বাড়ে।

প্র: কী ধরনের খাবার খেতে হবে?

উ: সুষম পুষ্টিকর খাবার। ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ডি এবং প্রোটিন সমৃদ্ধ। বিশেষ করে দুধ, ছানা, মাছ, ডিম, ডাল ইত্যাদির কিছু না কিছু যেন রোজকার খাদ্য তালিকায় থাকে।

প্র: রজঃনিবৃত্তির পর মহিলাদের হাড় কমজোরি হয়ে যায় বললেন। সে সময় তবে কী করতে হবে?

উ: ভাল করে খাওয়া দাওয়া করতে হবে। এবং ভাল স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মতো হর্মোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি করতে হবে।

প্র: হর্মোন রিপ্লেসমেণ্ট থেরাপি ব্যাপারটা কী?

উ: রজঃনিবৃত্তির পর মহিলাদের শরীরে ইস্ট্রোজেন হর্মোনের পরিমাণ কমে যায়। এর ফলেই হাড় কমজোর হতে শুরু করে। এই সময় কম মাত্রায় ইস্ট্রোজেন এবং প্রজেস্টেরন হর্মোন নিয়মিত শরীরে জোগান দিলে এই সম্ভাবনা কমে যায়। জরায়ু অপারেশনের দরুন যাঁদের ঋতু বন্ধ হয়েছে তাঁদের ক্ষেত্রে শুধু ইস্ট্রোজেনেই কাজ হয়।

প্র: তার মানে হর্মোন রিপ্লেসমেণ্ট থেরাপি বা এইচ আর টি করালেই হাড় ভাঙা বা কুঁজো হওয়ার হাত থেকে মুক্তি?

উ: না, অস্টিওপেরোসিসের অন্যান্য কারণ যদি মজুত থাকে শুধু এইচ আর টি খানিকটা প্রতিরোধের কাজ করবে। রোগ পুরো ঠেকাতে পারবে না।

প্র: অন্যান্য কী কারণে অস্টিওপোরোসিস হতে পারে?

উ: (১) দীর্ঘদিন ধরে স্টেরয়েড খেয়ে চললে

(২) অলস জীবন যাপন করলে

(৩) অপুষ্টি থেকে

(৪) খুব বেশি মাত্রায় মদ্যপান করলে ইত্যাদি

এখানে একটা কথা খেয়াল রাখা দরকার। বয়স্ক মহিলাদের ক্ষেত্রে সফ্‌ট টিস্যু রিউম্যাটিজম এবং অস্টিওপোরোসিস অনেক সময় গুলিয়ে যেতে পারে।

প্রঃ তার মানে দুটি রোগেরই উপসর্গ এক রকম?

উঃ মিল আছে। আবার অমিলও আছে। অস্টিওপোরোসিসে প্রধান উপসর্গ কোমর ব্যথা। কোমর তুলে উঠতে গেলে বেশ ব্যথা হয়। হাড়গোড় ভাঙার সম্ভাবনা থাকে খুব বেশি, বিশেষ করে কোমর, শিরদাঁড়া বা হাতের কব্জির হাড়।

সফ্‌ট টিস্যু রিউম্যাটিজমেও পিঠ, কোমর ব্যথা এবং কোমর তুলতে কষ্ট হয়। ব্যথাটা চলাফেরাও করে। কখনও বুকে, কখনও পিঠে এবং কখনও সন্ধিতে। হাড়ের পাশাপাশি মাংসপেশিতেও ব্যথা থাকে। পরীক্ষা করার সময় ব্যথার নির্দিষ্ট জায়গা খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রঃ সফ্‌ট ট্যিসু রিউম্যাটিজমে তাহলে হাড়গোড় ভাঙার সম্ভাবনা থাকে না?

উঃ না, সফ্‌ট টিস্যু রিউম্যাটিজমে হাড় ভাঙার সম্ভাবনা নেই।

প্রঃ একজন মধ্যবয়সী মহিলার কোমর ব্যথা সফ্‌ট টিস্যু রিউম্যাটিজমের জন্য হয়েছে না অস্টিওপোরোসিসের জন্য হয়েছে সেটা কীভাবে বোঝা যাবে?

উঃ অস্টিওপোরোসিস ধরা পড়বে এক্সরে-তে। আর উপসর্গের গতি প্রকৃতি দেখে বোঝা যাবে রোগটি সফ্‌ট টিস্যু রিউম্যাটিজম কিনা। যাঁরা এই রোগে ভোগেন তাঁদের বেশ কয়েকটির বিশেষত্ব থাকতে পারে। যেমন,

(১) উদ্বেগ প্রবণতা

(২) অবসাদ

(৩) দীর্ঘস্থায়ী প্রবল ক্লান্তি,

(৪) রাতে ভাল ঘুম না হওয়া

(৫) মাংসপেশিতে ব্যথা কিন্তু জায়গাটা লাল হয়ে যাওয়া, ফুলে যাওয়া এসব থাকবে না।

(৬) একেক বার একেক জায়গায় ব্যথা হবে এবং আবহাওয়ার উপর নির্ভর করবে ব্যথার গতি প্রকৃতি।

(৭) মানসিক চাপ, অশান্তি, দুশ্চিন্তা বাড়লে ব্যথা বাড়বে।

(৮) পিরিয়ডের সময় ব্যথা বাড়বে।

প্রঃ এর মধ্যে বেশ কয়েকটি উপসর্গ তো রজঃনিবৃত্তির পর মহিলাদের এমনিতেই থাকে।

উঃ হ্যাঁ, উদ্বেগ, অশান্তি, অবসাদ, ক্লান্তি এসব থাকতে পারে। কিন্তু ব্যথার নির্দিষ্ট ধরনটা থাকবে না।

প্রঃ তার মানে ব্যথার ধরন দেখে আপনারা রোগ চিনে নেন?

উঃ মূলত তাই। তার সঙ্গে ব্যক্তিত্ব যাচাই করা হয়। এক্ষেত্রে একটা বিশেষ ব্যাপার আছে। ব্যথা কমার ওষুধে সবসময় সুফল পাওয়া যায় না।

প্রঃ তাহলে চিকিৎসা কী?

উঃ সর্বপ্রথম খুব ভাল ঘুম হওয়া। দরকার মতো অশান্তি কমাবার ওষুধ বা ঘুমের ওষুধ দিতে হতে পারে। রিল্যাক্স করা অভ্যেস করতে হবে। নিজে না করা গেলে বিশেষজ্ঞের

সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। অবসাদ কমানোর ওষুধও দিতে হয় কখনও।

প্র: তাহলে কি এটা মানসিক রোগ?

উ: না, রোগটির সঙ্গে অল্পবিস্তর মানসিক সমস্যা থাকতে পারে। যা মধ্যবয়সে খুব একটা অস্বাভাবিক নয়।

প্র: রোগা ছোটখাটো মহিলারা রজঃনিবৃত্তির পর এইসব ব্যথা যন্ত্রণায় বেশি ভোগেন?

উ: সেই ব্যথা যন্ত্রণা অধিকাংশ সময় হয় অস্টিওপোরোসিসের জন্য।

প্র: তার চিকিৎসা এইচ আর টি?

উ: মহিলা হলে এইচ আর টিতে ভাল ফল পাওয়া যায়, যদি অন্য কোনও কারণ না থাকে। কর্টিকোস্টেরয়েড যাঁরা নিয়মিত খান তাঁদের ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি দিতে হয়। এছাড়া হাড়ের ক্ষয় রুখতে বিসফসফোনেট জাতীয় ওষুধ দীর্ঘদিন ধরে খেতে হতে পারে।

ঘাড় ব্যথায় নরম তুলোর বালিশ ব্যবহার করুন

ডাঃ সুব্রত দাশগুপ্ত

দূরভাষ : ৪৬৪-২৫৬৩

প্র: বাচ্চাদেরও তো আজকাল ঘাড়ে ব্যথা হয়। আচমকা খুব ব্যথা হলে কী করব?

উ: প্রথমে দেখতে হবে বাচ্চা ঘাড় এদিক ওদিক ঘোরাতে পারছে কিনা। তা যদি পারে তবে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। জেনে নিন কোনও চোট আঘাত পেয়েছে কিনা। ঘাড় শক্ত হয়ে গেলে বা কোনও আঘাত পেলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। অন্যথায় আইবোপ্রুফেন বা প্যারাসিটামল সিরাপ খাইয়ে দিন। দরকাব হলে এই ওষুধ দিনে দু'তিনবারও দেওয়া যেতে পারে।

প্র: ব্যথা কমার ওষুধের সঙ্গে অ্যান্টাসিড খেতে হবে না?

উ: অল্প মাত্রায় এই সব ব্যথা কমার ওষুধে সাধারণত তেমন সমস্যা হয় না। হলে প্রতিবার ওষুধ খাওয়ানোর পর এক চামচ অ্যান্টাসিড খাইয়ে দেবেন।

প্র: আচমকা চোট লাগলে আপনারা অনেক সময় বরফের সেক দিতে বলেন। ওষুধ না দিয়ে বাচ্চাকে যদি সেক দিই অসুবিধে আছে?

উ: খেলতে গিয়ে বা আচমকা চোটে বরফের সেক সত্যিই ভাল। বাচ্চার ক্ষেত্রে বেশি দিতে বলা হয় না, কারণ সঠিকভাবে জানা যায় না বলেই। এছাড়া ঠাণ্ডা লাগার ভয়ও থাকে।

প্র: আর আয়োডেক্স, মুভ বা অমৃতাঞ্জন জাতীয় মালিশের ওষুধ?

উ: এদের বলে 'কাউন্টার ইরিট্যান্ট'। এদের লাগিয়ে একটু ঘসলেই একটা গরম বা জ্বালা ভাব শুরু হয়ে যায়। ব্যথার চেয়ে তখন এই অনুভূতিই বেশি প্রকট হয়ে ওঠে। ব্যথা কমেনা কিন্তু মন ব্যথা থেকে সরে যায়। বড়রা কখনও লাগাতে পারেন। বাচ্চাদের না লাগানোই ভাল।

প্র: শোয়া বসার দোষেও তো অনেক সময় ঘাড়ে ব্যথা হয় ?

উ : খুব হয়। ঘাড় ঝুঁকিয়ে বেশিক্ষণ কাজ করার অভ্যেস থাকলে, বেশি নরম বা শক্ত বিছানায় শুলে বা শক্ত বালিশ ব্যবহার করলে ঘাড় ব্যথা হতে পারে। বালিশ ছাড়া শুলেও অনেক সময় ঘাড় ব্যথা হয়।

প্রঃ বালিশ ছাড়া শুলে তো ঘাড় ব্যথা ভাল হয় শুনেছি।

উঃ কী করে হবে? সারারাত যদি চিত হয়ে শুয়ে থাকতে পারেন তবে ঠিক আছে। কিন্তু সে তো হয় না। ঘুমের মধ্যে যেই পাশ ফিরবেন কাঁধ বিছানায় লেগে থাকবে। আর ঘাড় থাকবে মটকে। এ পাশে ও পাশে মটকাতে মটকাতে সকালে যখন উঠবেন দেখবেন ব্যথা বেড়েছে। বা ব্যথা ছিল না কিন্তু এখন ব্যথা করছে।

প্রঃ তাহলে কি ঘাড় ব্যথায় বালিশ ব্যবহার করব?

উঃ ব্যথা থাকুক না থাকুক বালিশ ব্যবহার করতে হবে। মোটামুটি ৪ ইঞ্চি মতো উচ্চতার নরম তুলোর বালিশ মাথা থেকে পুরো ঘাড় পর্যন্ত থাকবে। বালিশ এমন হবে যাতে মাথা রাখলে গর্তমতো হয়ে যায়। ফলে মেরুদণ্ড, ঘাড়, মাথা সব বরাবর থাকবে।

প্রঃ আর বিছানা? ঘাড় পিঠে ব্যথা হলে মেঝেতে শোয়া ভাল ?

উঃ অনেক রোগী এসে বলেন, ডাক্তারবাবু, আমি বিছানা ছেড়ে দিয়েছি। মাটিতে শুচ্ছি। জিজ্ঞেস করি, ব্যথা কেমন আছে? ব্যথা কমেনি, তবে? মেঝেতে বা কাঠের তক্তোপোশে শোয়ার দবকাব নেই। শোবেন শক্ত অথচ আরামদায়ক বিছানায়। ছোবড়াব গদির ওপর তুলোর তোষকে অথবা আজকাল যে রবাবাইজড কয়্যাব ম্যাট্রেস পাওয়া যায় তার ওপর। স্প্রিং বা ফোম একদম নয়।

প্রঃ স্পণ্ডাইলোসিস তো অনেকেরই হয়। এব থেকে বাঁচার কী উপায়?

উঃ বয়সের সঙ্গে যেমন চুল পাকে, দাঁত পড়ে, চামড়া খারাপ হতে থাকে, এও তেমনই। পুরোপুরি এড়িয়ে যাবার পথ নেই। তবে জীবনযাত্রাব কিছু নিয়ম কানুন মেনে চললে মোটামুটি উপসর্গহীন হয়ে থাকা যায়।

প্রঃ যেমন?

উঃ প্রথম মানসিক প্রস্তুতি মনে রাখতে হবে, এটা রোগ নয়। বয়সের কারণে হাড়ের ক্ষয়। কম বেশি সবার হবে। কাজেই চিন্তা করে লাভ নেই। বরং কিছু সাবধানতা মেনে চলুন। যেমন,

(১) আগে যেমন বলেছি, শক্ত আরাম দায়ক বিছানা এবং নরম তুলোর বালিশ ব্যবহার করুন।

(২) মাথা যথাসম্ভব সামনে কম ঝুঁকিয়ে লেখাপড়া করার অভ্যেস করুন। দরকার হলে, টেবিলের বদলে ডেস্ক ব্যবহার করুন।

(৩) চশমার পাওয়াব ঠিক না থাকলে অনেক সময় মাথা ঝুঁকিয়ে লেখা পড়া করতে হয়। কাজেই পাওয়ার সবসময় ঠিক রাখুন।

(৪) স্পণ্ডাইলোসিসের আক্রমণ কম রাখতে সামান্য কিছু ঘাড়ের ব্যায়াম করুন। সুস্থ অবস্থায় দিনে দু'চার বার করলেই ভাল কাজ দেবে।

প্রথমে, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বা মেরুদণ্ড সোজা রেখে বসে ঘাড় পেছনের দিকে বাকিয়ে সোজা ছাদের দিকে তাকান, তারপর ঘাড় ঝুকিয়ে মেঝের দিকে। এবার ঘাড় সোজা রেখে একবার ডানদিকে তারপর বাদিকে।

দ্বিতীয় ব্যায়াম, বাঁ'হাত দিয়ে মাথাকে ডান দিকে ঠেলুন, মাথা হাতকে বাঁদিকে ঠেলবে।

এবার উল্টো। ডান হাত মাথাকে বাঁদিকে ঠেলবে, মাথা হাতকে ঠেলবে অন্যদিকে। মাথার পেছনে দু'হাত জড়ো করে মাথাকে সামনের দিকে ঠেলুন। মাথা পেছন দিকে যাবার চেষ্টা করবে। কপালে দু'হাত রেখে মাথা পেছনে ঠেলবেন। কিন্তু মাথা আসতে চাইবে সামনের দিকে।

এই হল স্পন্ডাইলোসিসের ব্যায়াম। মূল কাজ ঘাড়ের মাংসপেশি মজবুত রাখা। স্পণ্ডাইলোসিসের সহজতম ব্যায়াম হল খুব আরামদায়ক ভাবে ঘাড় মাথা সোজা রেখে চলাফেরা করা।

প্র: কত বছর বয়স থেকে এসব ব্যায়াম শুরু করতে হবে?

উ: সাধারণত ২২-২৩ বছর বয়সের পর থেকে শরীরের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে ক্ষয়ের সূত্রপাত হতে শুরু করে। ক্ষয়ের সূত্রপাত হয় শুনে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। হয় খুব ধীর গতিতে। অনেক সময় বোঝাই যায় না। কিন্তু ব্যায়াম এই বয়স থেকে শুরু হলে সবথেকে ভাল ফল পাওয়া যায়।

প্র: স্পণ্ডাইলোসিস একবার হয়ে গেলে ব্যায়াম করে আর কোনও ফল হয় কি?

উ: বয়সের কারণে হাড়ের ক্ষয় মানেই স্পনডাইলোসিস। ব্যায়াম এবং জীবনযাপনের অন্যান্য নিয়ম কানুনের উদ্দেশ্য এই ক্ষয়ের হার কমানো। কাজেই কোনওদিন যদি ব্যায়াম নাও করে থাকেন, আজ থেকে শুরু করলেও ফল পাবেন।

প্র: কী ফল? ব্যথা কমে যাবে?

উ: খুব ব্যথা থাকলে ওষুধপত্রের সাহায্যে ব্যথা কমাতে হবে প্রথমে। তাতেও কাজ না হলে অনেক সময় কলাব পরতে হয়। ব্যথা সম্পূর্ণ কমে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে ব্যায়াম শুরু করতে হবে, ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী।

প্র: আমরা তো স্পন্ডাইলোসিস বলি না, বলি স্পন্ডিলাইটিস। দুটো কি একই অসুখ?

উ: স্পন্ডাইলোসিস অসুখ নয়, আগেও বলেছি। কিন্তু স্পণ্ডিলাইটিস অসুখ। কাজেই দুটো কখনও এক হতে পারে না। তবে সাধারণভাবে দেখেছি ঘাড় ব্যথা হলেই সবাই বলে স্পন্ডিলাইটিস হয়েছে। অধিকাংশ সময় না জেনেই।

প্র: স্পন্ডিলাইটিস কি তাহলে বাতকে বলে?

উ: হ্যাঁ, বাতও এক ধরনের স্পন্ডিলাইটিস। আসলে স্পন্ডিলাইটিস এক বিশেষ গোত্রের অসুখ — টনসিলাইটিস বা অ্যাপেনডিসাইটিসের মতো ইনফ্ল্যামেটবি ডিজিজ। এব আবার দু'রকম ভাগ — সাধারণ অথবা সংক্রামিত । সাধারণ স্পন্ডিলাইটিস মধ্যে পড়ে রিউমাটয়েড আর্থাইটিস, বাত বা শরীরেব বিভিন্ন সন্ধি আক্রান্ত হয়ে দেখা দিতে পারে অ্যাঙ্কাইলোসিং স্পন্ডিলাইটিস। আর সংক্রামিত স্পন্ডিলাইটিস হয় টিউবারকুলার বা পায়োজেনিক ইনফেকশনের দরুন।

প্র: ঘাড় ব্যথা স্পন্ডিলাইটিস না স্পন্ডাইলোসিসের দরুন সেটা কীভাবে বোঝা যাবে?

উ: এক্সরে এবং কিছু রক্তপরীক্ষার সাহায্যে।

প্র: চিকিৎসা করালে স্পন্ডিলাইটিস পুরো ভাল হয়ে যায়?

উ: সবক্ষেত্রে পুরো সেবে না গেলেও প্রচুব উন্নতি হয়। এবং চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত নিয়মকানুন মেনে চললে রোগ ভালভাবে আয়ত্বে থাকে।

প্র: **নিয়ম কানুন বলতে?**

উ: **স্পন্ডাইলোসিসের ক্ষেত্রে যা যা বলা হয়েছে সেসব তো করতেই হবে। সঙ্গে ডাক্তারের পরামর্শ মতো প্রতিদিন নিয়ম করে কিছু সাধারণ ব্যায়াম যেমন হাঁটা, সাইকেল চালানো, সাঁতার কাটা বা প্রয়োজনে ফিজিও থেরাপি করতে হবে। বাত বা রিউমাটয়েড আর্থাইটিসের ক্ষেত্রে খাওয়া দাওয়ার কিছু নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়।**

প্র: আর চিকিৎসা?

উ: বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওষুধের সাহায্যে। বাজারে প্রচুর ভাল ভাল ননস্টেরয়ডাল অ্যান্টিইনফ্ল্যামেটরি ড্রাগ পাওয়া যায়। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী এইসব ওষুধ নিয়ম মাফিক খেলে এবং সঙ্গে অন্যান্য নিয়ম কানুন মেনে চললে ভাল ফল পাওয়া যায়। রিউমাটয়েড আর্থাইটিস, টিউবারকুলার স্পন্ডিলাইটিস ইত্যাদির ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হয়।

প্র: এইসব ওষুধপত্রে পেটের সমস্যা দেখা দিতে পারে?

উ: হ্যাঁ, সম্ভাবনা আছে। কাজেই যথাযোগ্য সাবধানতা মেনে ওষুধ খেতে হবে।

প্র: সাবধানতা বলতে?

উ: প্রয়োজন মতো অম্বলের ওষুধ, হজমের ওষুধ খেতে হবে।

প্র: চিকিৎসা চলছে। কিন্তু আচমকা বাতবিরেতে হঠাৎ খুব ব্যথা শুরু হল। কী করতে হবে?

উ: ব্যথা কমার ওষুধ খেতে হবে। সঙ্গে শুকনো গরম সেক, হট ওয়াটার ব্যাগ বা বরফের সেক দেওয়া যেতে পারে।

মুটে মজুরদেরও ফ্রোজেন সোলডার হতে পারে

অধ্যাপক (ডাঃ) দেবব্রত ভট্টাচার্য

দূরভাষ ২৪৪-৩১০২

প্র: কী ধরনের উপসর্গ দেখা দিলে বুঝব ফ্রোজেন সোলডার হয়েছে?

উ: প্রথম দিকে হাত নাড়াতে চাড়াতে অল্প ব্যথা হবে। ধীরে ধীরে ব্যথা বাড়বে। ব্যথার চোটে রাতে ঘুম আসছে না এমনও হতে পারে। দৈনন্দিন কাজকর্মে অসুবিধে হতে শুরু করবে এরপর। যেমন চুল আঁচড়ানো, কিছু তোলা, বাচ্চা কোলে নেওয়া বা রান্নাঘরে খুন্তি নাড়ানো। তৃতীয় ধাপে দেখা যাবে কোনও একটা বিশেষ অবস্থানে রাখলে হাতে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। এরপর আর হাত দিয়ে কিছু করা যাবে না।

প্র: তাহলে আচমকা কাঁধের কাছে হাত আটকে গেছে, নড়ানো চড়ানো যাচ্ছে না, ব্যথা— এটা ফ্রোজেন সোলডার নয়?

উ: ফ্রোজেন সোলডার সময় নিয়ে ধীরে ধীরে হয়। আচমকা হলে প্রথমে কাঁধের হাড় সরে গেছে কিনা সেটা দেখতে হবে।

প্র: ফ্রোজেন সোলডার নাকি নিজে থেকেই সেরে যায়?

উ: ব্যথা সত্ত্বেও হাতের কাজকর্ম বজায় রাখতে পারলে অধিকাংশ সময় নিজে নিজেই ঠিক হয়ে যায়।

প্র: ব্যথাতে হাত নাড়ানো না গেলে কাজ করা যাবে কীভাবে?

উ: ব্যথা খুব বেশি হলে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যথা কমানোর ওষুধ খাওয়া যেতে পারে। সঙ্গে অ্যান্টাসিড খেতে হবে। অল্প ব্যথায় গরম জলের সেঁক অথবা ব্যথা কমানোর মলম হালকা করে ব্যথার জায়গায় লাগালে আরাম পাওয়া যায়। তীব্র ব্যথা কমে যাওয়ামাত্র অল্প অল্প করে হাতের কাজ শুরু করতে হবে।

প্র: কাজ শুরু করলেই সমস্যা মিটে যাবে?

উ: তা মিটবে না। হাত কিছুটা নাড়াচাড়া করতে অবস্থায় পৌঁছলেই ব্যায়াম শুরু করতে হবে। কীভাবে করতে হবে বলি। দুটো হাত নমস্কারের ভঙ্গিতে বুকের কাছে জড়ো করার চেষ্টা করুন। এবার ভাল হাতের চেটোর সাহায্যে অন্য হাতটা ঠেলে যতটা

সম্ভব মাথা বরাবর ওঠানোর চেষ্টা করুন। মাথার পিছনে, কোমরের পিছনে, বিশেষ করে হাত যেখানে যেখানে স্বাভাবিক ভাবে যাচ্ছে না, সেখানে পৌঁছনোর চেষ্টা করুন। সারাদিনে যখনই সময় পাবেন।

প্র: আর ফিজিও থেরাপি?

উ: নিয়মিত ফিজিও থেরাপি করলে খুব দ্রুত ফ্রোজেন সোলডারের সমস্যা দূর করা যাবে। বিশেষ করে চাকা ঘোরানো, পুলিটানা, আলট্রাসনিক রে দেওয়া ইত্যাদি।

প্র: ফ্রোজেন সোলডারের চিকিৎসায় ওষুধপত্রের কোনও ভূমিকা নেই?

উ: হাইড্রোকর্টিসোন ইনজেকশন অনেক সময় কাজে আসে।

প্র: ফ্রোজেন সোলডার কাদের বেশি হয়?

উ: হাতের কাজ যাঁদের বেশি করতে হয়। মুটে মজুর থেকে শুরু করে ফাস্টবোলার, টেনিস প্লেয়ার, ওয়েট লিফটার এমনকি বয়সের সঙ্গেও এই সমস্যা দেখা দিতে পারে। ডায়াবেটিস বা পলি আর্থাইটিসের রোগীদেরও অনেক সময় ফ্রোজেন সোলডার হয়।

প্র: হাতই যাঁদেব মূলধন তাঁদেরই এই সমস্যা হয়?

উ: সমস্যা হয়। কিন্তু এবা আবার চটজলদি সুস্থও হয়ে যান। হাত অকেজো হয়ে গেলে রুজি রোজগারে টান পড়বে এই ভয় থেকেই এরা ঠিক হওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকেন। অনেক সময় ফিজিও থেরাপি বা দামি ওষুধপত্রেরও দরকারই পড়ে না। মুটে মজুরদের কথাই ধরুন। ব্যথা কমানোর জন্য এদের হয়ত দু' একটা ট্যাবলেট দিলাম। তারপর দিনে বেশ কয়েকবার করে গরম সেঁক দিতে বলি। ব্যথা সহ্যের মধ্যে এলে ঘরোয়া ব্যায়ামগুলি চালু করে দেওয়া হয়। ব্যথার জায়গায় যাতে হ্যাঁচকা টান না লাগে সেদিকে বিশেষ করে খেয়াল রাখতে হয়। মোটামুটি এতেই ৪ থেকে ৬ মাসের মধ্যে এরা সুস্থ হয়ে যান।

প্র: ৪ থেকে ৬ মাস! এতদিন কাজকর্ম বন্ধ!

উ: হ্যাঁ, ওয়েট লিফটিং, ফাস্ট বোলিং বা এই জাতীয় ভারী কাজ বন্ধ রাখতে হবে। তবে দৈনন্দিন কাজকর্ম করার ক্ষমতা তার আগেই অল্প অল্প করে ফিরে আসে।

প্র: রোগটা যাতে না হয় সে ব্যবস্থা করাই তো তাহলে ভাল।

উ: সে তো ভালই। তবে এমন কোনও উপায় নেই যাতে করে নিশ্চিত করে বলা যাবে রোগটা হবে না। বয়স বাড়া, চুল পাকা যেমন প্রাকৃতিক নিয়মে হয়, হাড়, মাংস পেশি, টিস্যুর ক্ষয়ক্ষতিও তেমন ব্যাপার। তবে সচেতন থেকে মাংসপেশিগুলোকে সুস্থ সবল রাখতে পারলে সমস্যা কম হয়। কয়েকটি নিয়ম মেনে চলুন।

(১) হাতের বিভিন্ন রকম ব্যায়াম করুন। দাঁড়িয়ে, বসে, সামনে থেকে পিছন ফিরে পুলি টানুন। বাটারফ্লাই এক্সারসাইজ করুন, বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করে নিতে পারেন।

(২) ছোট ছোট চোট আঘাতে ব্যবস্থা নিন

(৩) ডায়াবেটিস আয়ত্তে রাখুন

(৪) হাত ওপরে তোলা অবস্থায় যাতে হাত কাঁধের সংযোগস্থলে কোনও রকম চাপ না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখুন

(৫) খেলাধুলা বিশেষ করে সাঁতার কাটার সময় হাতে আচমকা চোট আঘাত যাতে না লাগে সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে

প্র: চটজলদি কোনও চিকিৎসা নেই ফ্রোজেন সোলডারের?

উ: তাও আছে। অপারেশন করা যেতে পারে। অজ্ঞান করে হাত সটান টেনে ওপরে তুলে দিলে সমস্যার সাময়িক সমাধান। আসলে টিস্যুগুলি পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে গিয়ে সন্ধিকে আঁকড়ে ধরে। এটাকেই টেনে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। কাপড় ছিঁড়লে যে রকম আওয়াজ হয় এখানেও ঠিক সেরকম আওয়াজ করে টিস্যু ছিঁড়ে যায়। তবে একবার ছাড়ানোর পর যদি সে হাত দিয়ে বিশেষ কাজকর্ম করা না হয় আবার আগের মতো অবস্থা হয়ে যেতে পারে।

প্র: ফ্রোজেন সোলডার হলে হাড় ভাঙাব প্রবণতা বাড়ে?

উ: না। তবে অনভিজ্ঞ হাতে এই অপারেশন করতে গেলে হাড় ভাঙার একটা সম্ভাবনা থাকে।

প্র: বাঁ দিকের হাতে ফ্রোজেন সোলডার নাকি অনেক সময় হার্ট অ্যাটাকের প্রারম্ভিক উপসর্গ?

উ: হার্ট অ্যাটাক নয়, ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজে অনেক সময় বাঁ হাতে ফ্রোজেন সোলডাবের মতো মারাত্মক ব্যথা হয়।

নি রিপ্লেসমেন্টের পর লাঠি ব্যবহার করতে হবে

অধ্যাপক (ডাঃ) ইন্দ্রজিৎ সর্দার

দূরভাষ : ২৪৪-২৮৬৮

প্র. টোটাল হিপ বা নি রিপ্লেসমেন্ট কখন করা দরকার?

উ: মূলত কোমর বা হাঁটুর ব্যথা এবং বিকৃতি কমাতে। রিউমাটয়েড আর্থাইটিস, অস্টিও আর্থাইটিস, অ্যাঙ্কাইলোসিং স্পন্ডিলাইটিস, কিছু টিউমার বা চোট আঘাতের ফলে কোমর বা হাঁটুর সন্ধি অনেক সময় ক্ষয়ে যেতে থাকে। ধীরে ধীরে এমন অবস্থা হয় যে যাবতীয় ব্যথা কমানোর ওষুধ, ফিজিওথেরাপি বা অন্যান্য চিকিৎসায় আর কাজ হয় না। রোগী ব্যথায়, বিকৃতিতে প্রায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। তাঁকে এই অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে টোটাল হিপ বা নি রিপ্লেসমেন্ট করার দরকার পড়ে।

প্র: হাড়ে টিবি হলেও তো হাড় ক্ষয়ে যায়?

উ: ক্ষয়ে যায় ঠিকই। তবে শরীরে কোনওরকম সংক্রমণ থাকলে সচরাচর এই জাতীয় রিপ্লেসমেন্ট অপারেশন করা হয় না।

প্র: সেপটিক আর্থাইটিস হলে?

উ: সে ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। সাধারণত করা হয় না।

প্র: কেন?

উ: এসব ক্ষেত্রে অপারেশনের পর সংক্রমণ হাড়ে পৌঁছে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ফলে নানান রকম মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। অবস্থা সামাল দেওয়া না গেলে অনেক সময় বসানো সন্ধি বার করে নিতে হয়। কিছু ক্ষেত্রে আবার নতুন সন্ধি বসানো অর্থাৎ রিভিশন আর্থোপ্লাস্টি করা যায়। নয়তো জায়গাটা ফাঁকা পড়ে থাকে বা হাঁটুর ক্ষেত্রে সন্ধিটাকে জমিয়ে দেওয়া হয়। ফলে হাঁটু আর একদমই ভাঁজ করা যায় না। দু'ক্ষেত্রেই ব্যথা থাকে না, সাধারণ কাজকর্ম সবই করা যায়। তবে সারাজীবন খুড়িয়ে হাঁটতে হয়।

প্র: ফুসফুসে টিবি হলেও কি এই অপারেশন করা বারণ?

উ: রোগ থাকাকালীন করা যাবে না। তবে চিকিৎসা করে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলে আর

কোনও অসুবিধে থাকে না।

প্রঃ পাইয়োরিয়া থাকলেও নাকি আপনার এই জাতীয় রিপ্লেসমেন্ট করেন না?

উঃ শরীরের কোথাও কোনও সংক্রমণ থাকলে, তা সে দাঁতে বা ফুসফুসে যেখানেই হোক, না সারিয়ে অপারেশনে নামা যাবে না। শুধু তাই নয় এ ব্যাপারে সাবধানতা মেনে চলতে হবে অপারেশনের পরও। সারাজীবন। ফোঁড়া থেকে শুরু করে দাঁত ব্যথা এমন কি সর্দি কাশিও একটু বেশি হলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে।

প্রঃ সব কিছু মেনে চলার পরও তো সংক্রমণ হতে পারে?

উঃ এক হাজার জনের মধ্যে একজনের সেরকম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

প্রঃ যে কোনও বয়সেই কি এই অপারেশন করা যায়?

উঃ একটু বেশি বয়সে অর্থাৎ ৫০-৫৫ বছর বয়সের ওপরে এই অপারেশন করা উচিত। তবে রোগ মারাত্মক অবস্থায় পৌঁছলে অর্থাৎ রোগী যদি ব্যথায় একদম শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন, কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়, ৩০-৩৫ বছর বয়সেও কিছু ক্ষেত্রে অপারেশন করতে হতে পারে।

প্রঃ কম বয়সে অপারেশন করলে অসুবিধে কী ?

উঃ টোটাল হিপ বা নি রিপ্লেসমেন্টে কোমর অথবা হাঁটুর খারাপ হয়ে যাওয়া হাড় কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। সে জায়গায় বসানো হয় স্টেইনলেস স্টিল বা বিভিন্ন ধরনের মিশ্র ধাতু দিয়ে তৈরি সন্ধি। প্লাস্টিক, বোন সিমেন্ট ইত্যাদিরও প্রয়োজন হয় জোড়াতালি দেওয়ার কাজে। এত সব কাণ্ড কারখানার পরও কিন্তু সম্পূর্ণ ব্যাপারটা একদম আসলের মতো হয় না। ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে স্টিল, সিমেন্ট খারাপ হতে শুরু করতে পারে, প্লাস্টিক ক্ষয়ে যেতে পারে, ঢিলে হয়ে যেতে পারে পুরো সন্ধিটা। অল্প বয়সে অনেকেই অপারেশন পরবর্তী নিয়ম কানুন ঠিকঠাক মেনে চলেন না বলে সমস্যা বেশি হয়।

প্রঃ নিয়ম কানুন বলতে?

উঃ হিপ রিপ্লেসমেন্টের পর নিচু টুলে বা মাটিতে উবু হয়ে বসা বারণ। অর্থাৎ কোমরের সন্ধি ৯০ ডিগ্রির থেকে বেশি বেঁকবে না। কমোড ব্যবহার করতে হবে। এবং কিছু ক্ষেত্রে চলাফেরা করতে হবে লাঠিতে ভর দিয়ে। যে দিকের কোমরে অপারেশন হয়েছে লাঠি থাকবে তার উল্টোদিকের হাতে।

নি রিপ্লেসমেন্টের পরও হাঁটু ৯০ ডিগ্রির বেশি ভাঁজ করা যাবে না। কমোড ব্যবহার করতে হবে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করা, গাড়ি বা স্কুটার চালানো, বাসে ট্রেনে ঘোরাঘুরি সবই করা যাবে। তবে সব সময়ই যে হাঁটুতে অপারেশন হয়েছে তার উল্টো দিকের হাতে একটা লাঠি থাকা দরকার।

প্রঃ সারাজীবন লাঠিতে ভর দিয়ে চলতে হবে?

উঃ লাঠি ব্যবহার করলে হাঁটু বা কোমরের উপর চাপ কম পড়ে। দেখা গেছে অপারেশনের পর লাঠি নিয়ে চললে মোটামুটি ভাবে ১৫-২০ বছর সন্ধি ভালভাবে কাজ করে। লাঠি ছাড়া এই সময়টা নেমে আসে বছর ১০-১৫-র আশে পাশে। এই একই কারণে অপারেশনের পর ওজন নিয়ন্ত্রণের উপর খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়।

প্র: তার মানে অপারেশনের পর সম্পূর্ণ সুস্থতা ফিরে আসে না?

উ: সম্পূর্ণ সুস্থতা বলতে যদি ছুটোছুটি দৌড়াদৌড়ির কথা বলেন— না, অতটা সম্ভব হয় না। তবে অপারেশনের পর ব্যথা এবং চলাফেরার অসুবিধে সম্পূর্ণ দূর হয়ে যায়। অনেক সময় বিকৃতির জন্য পা এক-দেড় ইঞ্চি ছোট হয়ে যায়। বা বেঁকেচুরে থাকে। তাও প্রায় সময় ঠিক করে দেওয়া যায়।

প্র: কিন্তু যাই করুন, ১৫-২০ বছরের বেশি তো তা টিকবে না?

উ: টোটাল হিপ রিপ্লেসমেন্টে ৭০-৮০ শতাংশ রোগী ১৭-১৮ বছর ভাল থাকেন। নি রিপ্লেসমেন্ট হলে ৯০ শতাংশ মানুষ ভাল থাকেন ১৫-১৬ বছর। অর্থাৎ ৫৫-৬০ বছর বয়সে অপারেশন করলে ৭০-৭৫ বছর বয়স পর্যন্ত ভাল থাকতে পারবেন। তারপরেও যদি প্রয়োজন হয় বা কম বয়সে অপারেশন হলে, পরবর্তী কালে রিভিশন আর্থোপ্লাস্টি করা যেতে পারে। তবে দ্বিতীয়বার অপারেশনে ঝুঁকি একটু বেশি। প্রথমে কৃত্রিম সন্ধি সিমেন্ট সহ খুঁড়ে বার করে আনতে হয়। চেঁছে সব পরিষ্কার ক'রে তারপর নতুন করে সব বসানোর পালা। ফলাফল প্রথম অপারেশনের মতো হয় না। এছাড়া পদ্ধতিটি এমনিতেই যথেষ্ট খরচসাপেক্ষ। দু'বার করানোর ধাক্কা সামলানো সহজ নয়।

প্র: প্রথমবার অপারেশন করাতে কত খরচ পড়ে?

উ: দেশি সন্ধি ব্যবহার করে সাধারণ নার্সিংহোমে অপারেশন করলে টোটাল হিপ রিপ্লেসমেন্টের বেলায় ৫৫,০০০ টাকার মতো। নি রিপ্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে ৭০,০০০-৭৫,০০০ টাকা। বিদেশি সন্ধি হলে টোটাল হিপ রিপ্লেসমেন্টের খরচ ৬৫,০০০-৭০,০০০ টাকা এবং নি রিপ্লেসমেন্টের খরচ ১,০০,০০০-১,২৫,০০০ টাকার মতো, একটা হাঁটু বা এক দিকের কোমরের জন্য।

প্র: এই খরচের মধ্যে ডাক্তারের ফি এবং ওষুধপত্রের দা· • ধরা আছে?

উ: হ্যাঁ।

প্র: ছোট নার্সিংহোমে এই অপারেশন করা সম্ভব?

উ: হ্যাঁ সম্ভব। কারণ সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত পরিবেশ, কিছু যন্ত্রপাতি এবং অভিজ্ঞ নার্স ছাড়া এই অপারেশনে আর তেমন কি্‌ু লাগে না।

প্র: আর্থাইটিসে তো শরীরের সমস্ত সন্ধিই আক্রান্ত হতে পারে। হাঁটু বা কোমর ছাড়া অন্যত্র এই ধরণের অপারেশন করা যায় না'

উ: হাঁটু বা কোমরের উপর শরীরের পুরো ভারটা পড়ে ব'লে ক্ষতি বেশিরভাগ এ সমস্ত জায়গাতেই হয়। আর্থাইটিসে অন্যান্য সন্ধিও আক্রান্ত হতে পারে। তবে অধিকাংশ সময় যেগুলো সামলানো হয় ওষুধপত্রের সাহায্যে। কিছু ক্ষেত্রে কনুই, কাঁধ এবং আঙুলেও রিপ্লেসমেন্ট সার্জারি করা হয়ে থাকে।

সুস্থ থাকতে প্রতিদিন কিছু ব্যায়াম করুন

ডাঃ এম এম ঘটক

দূরভাষ : ৯৮৩০০-৪১৯৪৮

প্র : ৩০-৩৫ পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেব পর থেকে সুস্থ থাকার জন্য জীবনযাপনের কী কী নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে?

উ: ৩০-৩৫ বছর বয়সের পর বিশেষ করে ৪০-এর পর শরীর এবং মন এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়ায় যে কিছু সতর্কতা অন্তত মেনে না চললে সুস্থ থাকা বেশ মুশকিল। এই সময় থেকেই শরীবে নানারকম ক্ষয়ক্ষতির সূত্রপাত হতে শুরু করে। মানসিক চাপ, উৎকণ্ঠা বাড়ে। পরিশ্রম বা দৌড়াদৌড়ির ব্যাপারটা কমে আসে। ফলে ওজন বাড়া, রক্তচাপ বাড়া থেকে শুরু করে হৃদরোগেরও সূত্রপাত হওয়া সম্ভব। পরিসংখ্যান বলছে ৩০-৪০ বছর বয়সী এগজিকিউটিভদের মধ্যে হার্ট অ্যাটাকের প্রবণতা খুব বেশি। এবং আশ্চর্যজনকভাবে এর অনেকটাই নির্ভর করছে পেটের চর্বির ওপর। পেটের মাপ ১০০ সেন্টিমিটারের বেশি হলে স্বাভাবিকের তুলনায় এই জাতীয় অসুখে মৃত্যুর সম্ভাবনা প্রায় ৪ গুণ। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উদ্বেগ উৎকণ্ঠার বাড়াবাড়ি। অতএব বয়স ৪০ এর ধারে কাছে পৌঁছনোর আগেই খাওয়া দাওয়ার সাবধানতা এবং হালকা থেকে ভারী ব্যায়াম শুরু করা দরকার।

প্র: কী রকম?

উ: এই সময় থেকে বেশি খাওয়ার অভ্যেস, অনিয়ম এবং উল্টে াপাল্টা া খাওয়ার প্রবণতা ত্যাগ করতে হবে। বিশেষ কোনও অসুখ থাকলে বিশেষ বিধি নিষেধ মেনে চলতে হবে। ব্যায়াম শুরু করার প্রথম ধাপ হিসেবে চালু করতে হবে মর্নিংওয়াক। দিনে অন্তত ৪ কিলোমিটার। কত জোরে হাঁটবেন না কি দৌড়বেন সেটা ঠিক করার জন্য ট্রেডমিল টেস্ট করে নিলে ভাল হয়। কতখানি চাপ নিতে পারবে সেটা বোঝা যাবে এই টেস্ট করলে। না করাতে চাইলে আস্তে আস্তে হাঁটার গতি বাড়ান। প্রথম দিকে সময় লাগবে। কিন্তু ধীরে ধীরে এক ঘণ্টার মধ্যে ৪ কিলোমিটার হাঁটা অভ্যেসের মধ্যে এসে যাবে। এভাবে কিছুদিন চলার পর ৪৫ মিনিটে ৪ কিলোমিটার

বা একঘণ্টায় ৬ কিলোমিটার পর্যন্ত হাঁটতে পারবেন।

কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে বেশি হাঁটাহাঁটি করলে অসুবিধে হতে পারে। যেমন কিডনি বা হার্টের অসুখ থাকলে, হাঁটু ব্যথা, ফুসফুসের মেয়াদি রোগে বা রক্তাল্পতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে। রোগ আয়ত্তে আসার পর ডাক্তারের পরামর্শমতো হাঁটার ব্যাপারটা বাড়াতে কমাতে হবে। হাঁটু ব্যথা থাকলে হাঁটাহাঁটি হবে মূলত সমতল রাস্তায়। বেশি ব্যথায় হাঁটার বদলে কিছু স্ট্যাটিক এক্সারসাইজ ভাল ফল দেয়।

এই সমস্ত কোনও কারণে হাঁটার পরিমাণ যদি কমাতে হয়, খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে সচেতনতা আরও বাড়াতে হবে।

হাঁটাহাঁটি করে শরীরের সক্ষমতা মোটামুটি একটা জায়গায় আসার পর পেট কমানোর জন্য বিশেষ কয়েকটি ব্যায়াম শুরু করা দরকার।

(১) লেগ রাইজিং উইথ রেসিস্ট্যান্স

(২) সিট আপ,

(৩) কমপ্রেশন বেল্ট।

লেগ রাইজিংয়ে চিত হয়ে শুয়ে দু'পা জড়ো করে সোজা উপর দিকে তুলতে হবে। একজন ট্রেনার থাকবেন যিনি পা দুটোকে ঠেলে নীচেব দিকে নামানোর চেষ্টা করবেন। এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে পেটের উপব চাপ পড়বে। প্রথম দিকে দিনে ২০-২৫ বার করে শুরু করে বাড়াতে বাড়াতে ১০০ পর্যন্ত নিয়ে গেলে ভাল।

সিট আপের নানান ভঙ্গিমা আছে। সহজ থেকে কঠিন। ধীরে ধীরে সহজ থেকে কঠিনের দিকে যেতে হবে। এবং ১০-১৫ বার থেকে বাড়িয়ে ৫০ বা ১০০। সকালে ২ ঘণ্টা বিকেলে ২ ঘণ্টা পেটে চাপা বেল্ট পরতে পারলে পেট চটপট কমবে।

এছাড়া কিছু স্ট্রেচিং এক্সারসাইজ এবং যোগ ব্যায়াম করা যেতে পারে। তবে অবশ্যই বিশেষজ্ঞের পবামর্শ মতো।

প্র: পেটে বেল্ট পরলে নাকি হার্নিয়া হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে?

উ: দিনরাত বেল্ট পরে থাকলে পেটের মাংসপেশি দুর্বল হয়ে হার্নিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে বেল্ট পরার কথা বলা হচ্ছে দিনে ৪ ঘণ্টার জন্য। এবং সিট আপ, লেগ রাইজিংয়ের সঙ্গে। সিট আপ এবং লেগ রাইজিং নিয়মিত করলে পেটের মাংসপেশিব স্থিতিস্থাপকতা বাড়ে।

প্র: লেগ রাইজিং বা সিট আপ করলে তো অনেক সময় কোমরে ব্যথা হয়।

উ: কোমরের কাছে মেরুদণ্ডে কিছু ত্রুটি থাকলে এতে সমস্যা হতে পারে। সেক্ষেত্রে স্ট্যাটিক এক্সার সাইজ করতে হবে। পা বেঁধে বা পায়ের উপর ওজন দিয়ে পা উপরে তোলার চেষ্টা করতে হবে। পা উঠবে না কিন্তু পেটে চাপ পড়বে।

কোমরের মাংসপেশিতে যদি ব্যথা থাকে এতেও ব্যথা বাড়বে। সেক্ষেত্রে পেটের ব্যায়াম করানো একটু মুশকিল। মর্নিং ওয়াক, জগিং এসবের ওপরই নির্ভর করতে হবে।

প্র: হাঁটতে কি সকালেই হবে? বিকেলে হাঁটলে হবে না?

উঃ সকালে হাঁটতে বলার দু'তিনটে কারণ আছে। রাতে ভাল বিশ্রামের পর সকালে খোলা হাওয়ায় হাঁটতে শুরু করলে সমস্ত শরীরে খুব ভাল ভাবে রক্ত সঞ্চালন হতে শুরু করে। শরীরের প্রতিটি প্রত্যঙ্গের কার্যকারিতা শুরু হয় বিজ্ঞান সম্মতভাবে। মন এ সময় কিছুটা হালকা থাকে এবং তাড়াহুড়ো থাকে না বলে হাঁটার সঙ্গে মানসিক তৃপ্তির ব্যাপারটাও জড়িয়ে যায়। সকালে রাস্তাঘাট ফাঁকা থাকে, হাঁটার সুবিধেও।

প্রঃ রাস্তায় না বেরিয়ে যদি ট্রেডমিলে হাঁটা অভ্যেস করা যায়?

উঃ কোনও অসুবিধে নেই। তবে সেক্ষেত্রেও চেষ্টা করবেন সকাল সকাল ব্যাপারটা সেরে ফেলতে।

প্রঃ ট্রেডমিল বেশি করলেও তো অনেক সময় হাঁটুতে কোমরে ব্যথা হয়।

উঃ শুরুতেই বেশি করবেন না। বিশেষ করে যদি ওজন বেশি থাকে। বেশি ওজন নিয়ে হঠাৎ করে দৌড়াদৌড়ি শুরু করলে হাঁটু, কোমরে চাপ পঁড়ে ব্যথা শুরু হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করার কথা বলা হয়।

(১) খুব আস্তে আস্তে হাঁটার গতি বাড়ানো এবং (২) বড় ধরনের ব্যায়াম শুরু করার আগে খাওয়াদাওয়ায় নিয়ন্ত্রণ এনে ওজন অন্তত দু'এক কোজ কমিয়ে আনা।

প্রঃ অনেকক্ষণ একভাবে বসে কাজ করলেও তো হাঁটু বা কোমরে ব্যথা হয়?

উঃ এমনিতে যদি ব্যথা না থাকে, শুধুমাত্র অনেকক্ষণ একভাবে বসার দরুন ব্যথা হয়, মাঝে মাঝে বসার ধরণ পাল্টালে ব্যথা কম থাকবে। ঘণ্টাখানেক একভাবে বসার পর ১০-১৫ মিনিট হাঁটাচলা এবং সামান্য দু একটি ব্যায়াম করে পরের একঘণ্টা যদি একটু অন্যভাবে বসা যায় এবং পর্যায় ক্রমে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় কোমর এবং হাঁটু ব্যথার হাত থেকে মুক্তি পাবেন।

প্রঃ কী ধরনের ব্যায়াম করতে হবে?

উঃ বেশ কয়েকটি ব্যায়াম আছে। বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করে নিয়ে করবেন। দু' একটির কথা বলছি। চিত হয়ে শুয়ে হাঁটু ভাজ করে দুহাতেব ওপর শরীরের ভর রেখে কোমর উঁচু করে খানিকক্ষণ ওই অবস্থায় থাকতে হবে। ৩ বার করে করবেন। ডানপায়ের হাঁটুর উপর বা পায়ের হাঁটু রেখে কোমর থেকে শরীরের নীচের অংশ ডানদিকে ফেরাতে হবে। শরীরের ওপরের অংশ এবং দু'হাত ফেরাতে হবে বা দিকে। দু'দিকেই পর্যায়ক্রমে ৩ বার করে করতে হবে। এছাড়া ভুজঙ্গাসন এবং ধনুরাসন করা যেতে পারে অন্য কোনও সমস্যা না থাকলে কোমর সামনে, পেছনে বা দু'পাশে বাকিয়েও সামান্য ব্যায়াম করা যায়।

এছাড়া কোমর ব্যথা থাকলে বা কোমর ব্যথার প্রবণতা এড়াতে কয়েকটি নিয়ম মেনে চলতে হবে।

(১) কোমরে চাপ পড়ে এমন কাজকর্ম যথাসম্ভব এড়িয়ে যাওয়া দরকার। যেমন ভারী জিনিস তোলা বা নিচু হয়ে হ্যাচকা টানে কোনও কিছু সরানো।

(২) উপুড় হয়ে শুয়ে কিছু পড়া বা লেখা, একটানা একই ভাবে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে বা বসে থাকা, কোমর নিচু করে ঘর ঝাড়া মোছা করা, কনুইয়ে ভর দিয়ে হাতের চেটো মাথার নীচে রেখে দীর্ঘক্ষণ শুয়ে থাকলেও কোমরে বা ঘাড়ে

ব্যথা হতে পারে।

(৩) মাটি থেকে কিছু তুলতে গেলে কোমর ঝুকিয়ে না তুলে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে তোলা দরকার।

(৪) বাসের পেছনে দাঁড়ালে বা মাথার ওপরের রড ধরলে ঝাঁকুনি কোমরে এসে লাগে। কাজেই বাসের সামনে উঠতে হবে এবং উপরের হ্যান্ডেল না ধরে কাঁধের সমান্তরালে কোনও কিছু ধরতে হবে। বিশেষ করে বয়স যদি ৪০-এর উপরে হয়।

প্র: কোমর ব্যথায় মালিশের কোনও ভূমিকা নেই?

উ: মাংসপেশিতে ব্যথা হলে হালকা মালিশে আরাম পাওয়া যায়। তবে এর বিশেষ পদ্ধতি আছে। এছাড়া ক্ষেত্র বিশেষে আলট্রাসনিক রে বা সর্টওয়েভ ডায়াথার্মির কয়েকটা সিটিং নিতে হয়।

প্র: ৪০-এর ওপর বয়সে তো এমনিতেই নানান ব্যথাবেদনা জাঁকিয়ে বসে। কখনও পিঠে, কখনও গোড়ালিতে কখনও বা হাতে। ব্যথার চোটে দৈনন্দিন কাজকর্ম বরবাদ।

উ: এই ধরনের ব্যথা এবং মানসিক অবস্থা সাধারণত সফ্‌ট টিস্যু রিউম্যাটিজমের জন্য হয়। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ব্যথা, বিভিন্ন তাদের নাম। হয়তো কখনও অজান্তে পিঠে হ্যাঁচকা টান লেগেছিল। তারপর আর তার কথা মনে নেই। হঠাৎ করে একদিন পিঠের কোনও একটা মাংসপেশিতে ব্যথা শুরু হল। এবং চলতে থাকল। এর নাম ফাইব্রোমায়োসাইটিস। গোড়ালির নীচে ব্যথা। সকালে ঘুম থেকে উঠে পা ফেলা যায় না মাটিতে। বেশি হাঁটলে ব্যথা বাড়ে। নাম প্ল্যান্টাবফ্যাসাইটিস। গোড়ালির ওপর থেকে পায়ের পেছন দিকে ব্যথা। এক্ষেত্রেও সকালে ঘুম থেকে উঠে পা ফেলতে লাগে। এবং বেশি হাঁটাচলা করলে ব্যথা বাড়ে। রেট্রোক্যালকেনিয়াল বারসাইটিস। কাঁধের কাছে হাত আটকে গেছে; বেশি নড়াচড়া করতে বা উপরে তুলতে ব্যথা— ফ্রোজেন সোলডার। ফাইব্রোমায়ালজিযায় থাইয়ের কাছে, পিঠে, হাতের মাংসপেশিতে হঠাৎ করে ব্যথা হয়। টিপলে বা কাজ করতে গেলে লাগে। টেনিস এলবো আগে বলা হত টেনিস খেলোয়াড়দের রোগ। এখন এতে আক্রান্ত হতে পারেন সবাই। বিশেষ করে মহিলারা। সব থেকে বড় অসুবিধে দেখা দেয় জামা কাপড় নিঙরোতে। এই সমস্ত ব্যাথা যন্ত্রণার একটা বিশেষত্ব আছে। মন যেন ব্যথার জায়গায় আটকে যায়। গাঢ় ঘুম হতে চায় না। চেহারায় মানসিক অশান্তির ছাপ ফুটে ওঠে।

প্র: হাইপোথাইরয়েডিজম হলেও তো নাকি হাতে নানারকম ব্যথা হয়?

উ: হাইপোথাইরয়েডিজম থাকলে সব ধরনের ব্যথা বেদনার প্রকোপ বাড়ে। দু'ধরনের ব্যথার কথা বিশেষ করে বলছি। অনেক সময় দেখা যায় বুড়ো আঙুল নড়ানো যাচ্ছে না বা ব্যথা হচ্ছে। এর নাম ডি কুয়ার ভেন্‌স ডিজিজ। কারপাল টানেল সিনড্রোমে কব্‌জির ভেতর দিকে টোকা দিলে সমস্ত হাত ঝিন ঝিন করে। এই ধরনের ব্যথা নিয়ে এলে আমরা থাইরয়েড টেস্ট করাই। এবং সেইমতো ওষুধপত্র দিলে রোগী ঠিক হয়ে যায়। থাইরয়েডের অসুখ কমে গেলে অন্য ব্যথা বেদনার তীব্রতাও কিছু কমে।

প্রঃ আর হাত পা পিঠের অন্যান্য ব্যথাগুলির ক্ষেত্রে?

উঃ প্রথম কথা ব্যথা হচ্ছে বলে একদম চুপচাপ বসে গেলে চলবে না। আবাব ব্যথাকে অবজ্ঞা করে যা খুশি তাই করাও অনুচিত। কয়েকটি নিয়ম কানুন মেনে চলতে হবে। এবং অন্যান্য চিকিৎসা চলবে। প্রথমে নিয়ম কানুনের কথা বলি।

টেনিস এলবোর ক্ষেত্রে কনুই থেকে কব্জির মাঝের অংশে টাইট ব্যান্ড পরে কাজকর্ম করতে বলা হয়। এতে কাজকর্ম সবই বজায় থাকে অথচ মাংসপেশিতে অনাবশ্যক টান পড়ে না।

প্লান্টার ফ্যাসাইটিস দেখা দেওয়ামাত্র হিল তোলা জুতো পরা বন্ধ করতে হবে। জুতোর গোড়ালি হবে স্পঞ্জ দিয়ে তৈরি। অথবা খুব নরম চপ্পল ব্যবহার করতে হবে।

ফাইব্রোমায়ালজিয়াতে যেখানে ব্যথা সে জায়গাটাকে একটু বিশ্রাম দিতে হবে। যে ধরণের কাজ করলে ব্যথা বোধ হয়, সাময়িকভাবে সেই সমস্ত কাজ বাদ দিতে হবে।

ফ্রোজেন সোলডারে ব্যথার ওষুধ খেয়ে বা যা করে হোক হাতের নাড়াচাড়া বজায় রাখা দরকার। বাকি চিকিৎসা তো আছেই।

চিকিৎসা বলতে নির্দিষ্ট কিছু ব্যায়াম এবং সর্টওয়েভ ডায়াথার্মি বা আলট্রাসনিক থেরাপি। এতেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপকার পাওয়া যায়। কিছু ক্ষেত্রে ব্যথার জায়গায় স্টেরয়েড ইঞ্জেকশন দেওয়ার দরকার পড়ে।

প্রঃ গরম সেঁক বা মালিশে কোনও উপকার হয় না?

উঃ সাধারণ গরম সেঁকের বেশির ভাগটা কাজ করে চামড়ার উপর। সেজন্য আরাম হলেও এ থেকে রোগের কোনও উপকার হয় না। মালিশের ক্ষেত্রেও ব্যপারটা অনেকটা তাই। চামড়ার উপরে রক্তসঞ্চালন বাড়ে। আরাম লাগে কিন্তু স্থায়ী ফল কিছু হয় না।

প্রঃ সর্টওয়েভ ডায়াথার্মি বা আলট্রাসনিক থেরাপির ব্যাপারও তো তাইই।

উঃ না, সর্টওয়েভ ডায়াথার্মির তাপ একটার পর একটা স্তর ভেদ করে একদম ব্যথার উৎসে পৌঁছে যায়। আলট্রাসনিক রে তেও শব্দতরঙ্গ ব্যথার জায়গায় পৌঁছে আশপাশের জট ছাড়িয়ে রক্ত সঞ্চালন বাড়ায়। কাজেই দু'টি ক্ষেত্রেই দিনে ১০ মিনিট করে ১০-১২ টা সিটিংএ প্রচুর উপকার হয়।

প্রঃ সিটিং কি রোজ নেওয়া দরকার?

উঃ প্রথম দিকে একটানা রোজ নিতে হবে। তবে পাকাপাকিভাবে ভাল থাকতে গেলে সফ্ট টিস্যু রিউম্যাটিজ্মে জীবনযাত্রায় কিছু পরিবর্তন আনা কিন্তু একান্ত জরুরি।

প্রঃ কী রকম?

উঃ (১) বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মতো হালকা কিছু ব্যায়াম করা। যেমন অ্যারোবিকস, হাল্কা ওজন নিয়ে বা মেশিনে কিছু ব্যায়াম, সাইক্লিং ইত্যাদি। তবে এমন ব্যায়াম করতে হবে যাতে ব্যথার জায়গায় অনাবশ্যক টান না পড়ে।

(২) ব্যথা চলাকালীন খুব হাল্কা খাবার দাবার খেতে হবে।

(৩) বিদেশে চালু হয়েছে রিক্রিয়েশন থেরাপি বা অপারেন্ট কণ্ডিশনিং থেরাপি বা সহজ কথায় দৈনন্দিন জীবনে ভাল থাকার চেষ্টা। দুটো ধাপে এটা করার চেষ্টা

করি আমরা। প্রথম, ঠিকঠাক ঘুমোনোর ব্যবস্থা করা। দরকার হলে অ্যালপ্রাজোলাম জাতীয় দুশ্চিন্তা কমানোর ওষুধ দিতে হতে পারে। দ্বিতীয়, মানসিক প্রফুল্লতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা। কখনও সাইকলোজিকাল কাউন্সেলিং কখনও বা অবসাদ কমানোর ওষুধ ব্যবহার করতে হয়।

প্র: হাত পা ব্যথা থেকে অবসাদ?

উ: দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা থেকে প্রায়শই অবসাদের জন্ম হয়। আবার অবসাদ থেকেও যে ব্যথা হয় না তা নয়। আসলে এটা ব্যক্তিত্বের ওপর নির্ভর করে। কেউ কেউ অনেক ব্যথা নিয়ে দিব্যি জীবন কাটিয়ে যান। কেউ অল্প ব্যথাতেই অবসাদে আক্রান্ত হন। অবসাদ থেকে আবার ব্যথা বাড়ে।

প্র: কিছু ব্যথা একবার শুরু হলে জীবনভর সারে না এমনও তো হয়?

উ: বয়সের কারণে ক্ষয়ক্ষতি বা দুরারোগ্য কোনও রোগের কারণে ব্যথার ক্ষেত্রে অনেক সময় অপারেশন বা নার্ভ ব্লক করতে হয়। যেমন অস্টিও আর্থ্রাইটিসের শেষ পর্যায়ে হাঁটু বা কোমরের এমন অবস্থা হয় যে তাদের আর বদলে না ফেলে উপায় থাকে না। টোটাল হিপ বা টোটাল নি রিপ্লেসমেণ্ট অপারেশন দরকাব হতে পাবে। তবে এই অপারেশনের পর কিন্তু রোগী একদম সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারেন। বিভিন্ন কারণে হাত, পা বা আঙুল যাঁদের কেটে ফেলতে হয়, যাকে অ্যামপুটেশন বলে, অনেক সময় কাটা অংশে মাঝে মধ্যেই ইলেকট্রিক শক লাগার মতো ব্যথা হয়। এটা নার্ভের ব্যথা। এক্ষেত্রে কিছু ওষুধ ওই অংশে ইনজেকশন দিয়ে নার্ভ ব্লক করে দেওয়া হয়। এরকম ব্যথা অপারেশনের কাটা জায়গাতে হতে পারে। যে কোনও নার্ভের গতিপথে হতে পারে। শেষ পর্যায়ের ক্যান্সারের ব্যথাও সহ্যের অতীত হয় কখনও। অবস্থা বুঝে এ সমস্ত ক্ষেত্রে কখনও কিছু নার্ভ নষ্ট করা হয়, কোথাও অসার করা হয়।

প্র: এতে ক্ষতি হয় না?

উ: ব্যথা খুব অসহ্য না হলে নার্ভ ব্লক করা হয় না। অধিকাংশ সময় লাভের তুলনায় ক্ষতির পরিমাণ খুবই কম।

ডায়েরিয়া থেকেও কিডনি খারাপ হতে পারে

ডাঃ গৌতম মজুমদার

দূরভাষ : ৯৮৩০০৫২৫১৭

প্র : মাথা ব্যথার ওষুধ নিয়মিত খেলে নাকি কিডনি খারাপ হয়ে যায়?

উ : শুধু মাথা ব্যথার ওষুধ কেন, অজস্র ওষুধ আছে যাদের লাগাম ছাড়া ব্যবহারে কিডনির ক্ষতি হতে পারে। যেমন, ফেনাসিটিন, ব্রুফেন, ভোভেরান জাতীয় ব্যথার ওষুধ, অ্যান্টিবায়োটিকের মধ্যে স্ট্রেপ্টোমাইসিন, জেন্টামাইসিন ইত্যাদি। সিটিস্ক্যান, অ্যাঞ্জিওগ্রাফি, আই ভি পি ইত্যাদি করার সময় শরীরে যে ডাই ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় তাও অনেক সময় কিডনির পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। এ তো কয়েকটা উদাহরণ দিলাম। আসল কথা হল যে কোনও ওষুধই ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া দীর্ঘদিন ধরে খেয়ে গেলে বিপদের সম্ভাবনা থাকে।

প্র : কিন্তু ব্যথার ওষুধ তো আমরা আকছার খেয়ে থাকি।

উ : খাবেন না। রোগের চিকিৎসা করান। আর যদি খেতেই হয় প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ খান। এটা ততটা ক্ষতিকর নয়। অন্তত এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।

প্র : আর স্ট্রেপ্টোমাইসিন, জেন্টামাইসিন? এতো খুবই চালু অ্যান্টিবায়োটিক?

উ : সে তো বটেই। এবং উপকারীও। আসলে কী জানেন, কোনও বিশেষ রোগীর ওপর আমবা যখন কোনও ওষুধ প্রয়োগ করি, অনেক অগ্রপশ্চাৎ ভেবে করি। সমস্যা হয় তখন, যখন রোগী নিজের ওপর সেই বিচারের ভার তুলে নেন। পুরনো প্রেসক্রিপশন দেখিয়ে ওষুধ কেনা, হাঁচি কাশিতে অ্যান্টিবায়োটিক কিনে খেয়ে নেওয়া — বিপদ আসে এসব ক্ষেত্রে। কাজেই অযথা ভয় পাবেন না। শুধুমাত্র কথায় কথায় ওষুধ খাওয়ার অভ্যেস ত্যাগ করুন। শরীর খারাপ হলে ডাক্তার দেখান। তারপর তাঁর কথা অনুযায়ী ওষুধ খান।

প্র : চুলকুনি (স্ক্যাবিজ) হলে নাকি ভবিষ্যতে কিডনি খারাপ হয়ে যায়?

উ : সম্ভাবনা আছে। এবং আমাদের দেশে এর প্রকোপ খুব কম নয়। চুলকুনি হল, চিকিৎসা হল, সেরে গেল — তাহলে তেমন সমস্যা নেই। কিন্তু পুষে রাখলে চুলকুনির

জায়গায় স্ট্রেপ্টোকক্কাস সংক্রমণ হতে পারে। এ থেকে অ্যাকিউট নেফ্রাইটিস হয়ে কিডনি সাময়িকভাবে খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু চিকিৎসা করালে শতকরা ৯০ ভাগ ক্ষেত্রে কিডনি ঠিক হয়ে যায়।

প্র : টনসিলাইটিস পুষে রাখলেও তো কিডনি খারাপ হয় শুনেছি ?

উ: টনসিলাইটিস বা ফ্যারিনজাইটিস বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণের দরুন হয়। সংক্রমণের কারণটি যদি হয় স্ট্রেপ্টোকক্কাস, এবং তার সঠিক চিকিৎসা না হয়, অ্যাকিউট নেফ্রাইটিস হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে। তবে আগেই বলেছি চিকিৎসায় শতকরা ৯০ ভাগ ক্ষেত্রে এই রোগ ভাল হয়ে যায়।

প্র : নেফ্রাইটিস হয়েছে কীভাবে বোঝা যাবে?

উ : নানারকম উপসর্গ নিয়ে রোগী আসতে পারেন। প্রথম দিকে গলা ব্যথা, অল্প জ্বর বা চামড়ায় ঘা থাকতে পারে। ঠিকমতো চিকিৎসা না হলে রোগ ছড়িয়ে পড়ে শরীরে। মুখ, শরীর ফুলে যায়, প্রস্রাব কমে যায়, প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত আসতে পারে, রক্তচাপ বেড়ে যায়। প্রস্রাব বন্ধও হয়ে যায় কখনও কখনও। তবে অনেক সময়ই উপসর্গ সে রকম মারাত্মক না হওয়ার দরুন. রোগ ধরা পড়ে দেরিতে। এমনকি কিডনি খারাপ হয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত ধরা পড়ে না এমনও হয়।

প্র : যথাযথ চিকিৎসা হলে তো আর কিডনি নষ্ট হওয়ার ভয় থাকে না?

উ : নেফ্রাইটিস দু' ধরনেব—অ্যাকিউট এবং ক্রনিক। অ্যাকিউট নেফ্রাইটিস বেশি হয় বাচ্চাদের। ২-৩ বছর বয়স থেকে ১৪-১৫ বছব বয়স পর্যন্ত। এবং রোগ ধরা পড়ার পর ৪-৫ বছর ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে থাকলে সম্পূর্ণ হয় চিকিৎসার পর্যায়। সঠিক চিকিৎসা হলে শতকরা ৯০ ভাগ ক্ষেত্রে বোগ ঠিক হয়ে যায়। সমস্যা হয় ক্রনিক নেফ্রাইটিসের বেলায়। এক্ষেত্রে অনেক সময়ই পুরোপুরি সুস্থতা ফিরিয়ে দেওয়া যায় না।

প্র :. হাম সেরে যাওয়ার পর কিডনির অসুখ হতে পারে?

উ : হাম, বসন্ত, ভাইরাল ফিভার এবং আরও .বশ কিছু সংক্রামক অসুখের পর অ্যাকিউট নেফ্রাইটিস হতে পারে।

প্র : আন্ত্রিক থেকেও কিডনি খাবাপ হয?

উ : ঠিক সময় চিকিৎসা না হলে হতে পারে।

প্র : কেন?

উ : আন্ত্রিক জাতীয় অসুখে বারবার বমি পায়খানার দরুন শরীরে জলের ভাগ দ্রুত কমে যেতে থাকে। ফলে রক্ত ভারী হতে শুরু করে। রক্তচাপ কমতে থাকে। কমচাপেব ভারী রক্ত স্বাভাবিকভাবেই প্রয়োজনের তুলনায় কম পরিমাণে কিডনির মধ্যে দিয়ে যায় । এবং একটা সময় আসে যখন রক্ত এত ভারী হয়ে যায় যে কিডনির মধ্যেকার সূক্ষ্ম নালিগুলির মধ্যে দিয়ে যাতায়াতই আর সম্ভব হয় না। ফলে কিডনি কমজোরি হতে হতে এক সময় সাময়িকভাবে খারাপ হয়ে যায়। অর্থাৎ অ্যাকিউট রেনাল

ফেইলিওর দেখা দেয়।

প্র : ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়াও তো কিডনির ক্ষতি করে?

উ : হ্যাঁ, শতকরা ১০ ভাগ ফ্যালসিফেরাম ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত রোগীর কিডনি খারাপ হতে পারে।

প্র : সাপে কাটা বা বিষ খাওয়া রোগীদের অনেক সময় ডায়ালিসিস করা হয়। এদেরও কি কিডনি খারাপ হয়ে যায়?

উ : বোড়া জাতীয় সাপ যেমন চন্দ্রবোড়ার বিষের প্রভাবে রক্ত ভেঙে যেতে শুরু করে এবং সেই ভেঙে যাওয়া রক্ত ছোট ছোট ডেলা পাকিয়ে বিভিন্ন সূক্ষ্ম রক্তবাহী শিরা উপশিরার মধ্যে জমা হতে শুরু করে। যথারীতি কিডনির মধ্যেও একই ব্যাপার ঘটে। এবং কিডনি কমজোরি হয়ে পড়ে। অ্যান্টিভেনোম ইনজেকশন দিয়ে তাড়াতাড়ি ডায়ালিসিস শুরু করলে রোগীকে বাঁচানো যায়।

বিষক্রিয়ার মধ্যে সবথেকে মারাত্মক হল তুঁতে এবং পারদ। এরা সরাসবি কিডনিকে আক্রমণ করে। বাকি ফলিডল, টিক-২০, উকুন মারার বিষ ইত্যাদির বিষক্রিয়ায় ডায়রিয়া হলে শরীরে জলশূন্যা দেখা দেয়। ফলে কিডনি খারাপ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।

প্র : অনেকে বলেন ছোটবেলায় ফাইমোসিস অপারেশন না করালে পরবর্তী কালে কিডনির ক্ষতি হয়?

উ : ফাইমোসিস অপারেশন :প্রত্যেকের জন্য আবশ্যিক এরকম নয় ব্যাপারটা। তবে বাচ্চার যদি সমস্যা থাকে অপারেশন করিয়ে নেওয়া দরকার। না হলে খুব ধীরে ধীরে কিডনির ক্ষতি হতে পারে। যাকে ডাক্তারি ভাষায় আমরা বলি অবস্ট্রাকটিভ ইউরোপ্যাথি। এর ফলে পরবর্তী কালে ক্রনিক রেনাল ফেইলিওর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

প্র : বাচ্চার মধ্যে কী সমস্যা দেখলে বুঝব অপারেশন দরকার?

উ : প্রস্রাব হবে খুব সরু ধারায়। কখনও ফোঁটা ফোঁটা। প্রস্রাব করার সময় বাচ্চা কাঁদবে। এরকম উপসর্গ দেখা দিলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করবেন। ইউরেথ্রাল ভাল্‌ভ নামে আরেকটি রোগের ক্ষেত্রেও এই ধরনের উপসর্গ থাকে। তখনও সাবধানতা নেওয়া দরকার।

প্র : বয়স্ক মানুষদের ক্ষেত্রেও তো অনেক সময় এই ধরনের উপসর্গ দেখা যায়?

উ : হ্যাঁ, পুরুষ, মহিলা দুইয়ের ক্ষেত্রেই বেশি বয়সে এই জাত্রিয় সমস্যা দেখা দিতে পারে। ছেলেদের প্রস্টেট বেড়ে গেলে অবস্ট্রাকটিভ ইউরোপ্যাথি হয়। মহিলাদের ক্ষেত্রে মেনোপজের পর সমস্যা বাড়ে।

প্র : সমাধানের রাস্তা কী?

উ : মহিলাদের ক্ষেত্রে ইস্ট্রোজেন হর্মোন ঘাটতি রয়েছে এর মূলে। স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মতো হর্মোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি করালে ফল পাওয়া যাবে। আর ছেলেদের ক্ষেত্রে ইউরোলজিস্টের পরামর্শ মতো প্রস্টেটের চিকিৎসা। দরকার হলে অপারেশন।

প্র : কিডনি সুস্থ রাখতে গেলে কী কী সাবধানতা মেনে চলতে হবে ?

উ : আকস্মিক অঘটনের ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিলে অ্যাকিউট রেনাল ফেইলিওর এড়িয়ে যাওয়া যায়। সমস্যা দেখা দেয় ক্রনিক রেনাল ফেইলিওয়ের বেলায়। বেশ কিছু রোগ, কিছু ওষুধ এবং ত্রুটিপূর্ণ জীবনযাত্রার দরুণ অনেক সময়ই ধীরে ধীরে জখম হতে থাকে কিডনি। প্রথম দিকে উপসর্গ তেমন কিছু মারাত্মক না থাকায় ব্যাপারটা গুরুত্ব পায় না। প্রায় সময়ই রোগী আসেন খুবই সংকটজনক অবস্থায়। কিডনির কার্যক্ষমতা যখন শতকরা ১০ ভাগের নীচে। অর্থাৎ এ' স্টেজ রেনাল ডিজিজ। এই অবস্থা এড়াতে কয়েকটি জিনিস বিশেষভাবে খেয়াল রাখুন।

(১) অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস ৪-৫ বছরের মধ্যে বিপদে ফেলে দিতে পারে। নিয়মিত ব্লাডসুগার পরীক্ষা করান। ওষুধপত্র এবং খাওয়া দাওয়ার নিয়ম মেনে চলুন।

(২) কিডনির আরেক শত্রু উচ্চ রক্তচাপ। এক্ষেত্রেও একই কথা। ওষুধপত্র এবং খাওয়া দাওয়ার নিয়ম কানুন মেনে চলা দরকার।

(৩) প্রস্রাব বারবার সংক্রমণ হতে থাকলে পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়ে জেনে নিন এটি সাধারণ সংক্রমণ না এর পেছনে পাথর, রিফ্লা' বা টিবি লুকিয়ে আছে কিনা।

(৪) নিজে নিজে ওষুধ খাবেন না। যেকোনও অসুখেই ডাক্তার দেখিয়ে, রোগ নির্ণয় করে সঠিক ওষুধ খান।

(৫) ধূমপান, মদ্যপানে কিডনির সরাসরি ক্ষতি নেই। তবে এর ফলে রক্তচাপ এবং রক্তে কোলেস্টেরল, ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা বাড়লে কিডনির ক্ষতি হতে পারে।

(৬) সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল রাখুন এবং খাওয়া-দাওয়ার দিকে নজর দিন।

প্র : কিডনি ভাল রাখতে কী খাব আর কী খাব না?

উ : প্রচুর জল খেতে হবে। ওজন এবং জীবিকার ওপর নির্ভর করে দিনে কম করে ২-৩ লিটার জল খাওয়া দরকার। সুস্থ মানুষের ক্ষেত্রে খাওয়ার তেমন বিধি নিষেধ নেই। তবে খাওয়া থেকে যাতে সংক্রমণ না হয় সেদিকে নজর রাখা উচিত। বিশেষ রোগের ক্ষেত্রে কিছু বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে। যেমন

(১) ডায়াবেটিস থাকলে মিষ্টি একদম বন্ধ। চিনি, গুড়, পাকা ফল ইত্যাদি খাবেন না।

(২) উচ্চরক্তচাপের রোগী ভাজাভুজি, পাঠার মাংস, তৈলাক্ত খাবার বা কাঁচা নুন যথাসম্ভব কম খাবেন।

(৩) গেঁটেবাতের রোগী এড়িয়ে চলবেন পাঠার মাংস, ডিম, তৈলাক্ত মাছ, মাছের ডিম, দুধ বা দুধজাতীয় খাবার।

(৪) কিডনিতে পাথর হওয়ার প্রবণতা থাকলে দুধ, ছানা, ডিম, তৈলাক্ত মাছ, কুচো মাছ, মাছের মাথা, মাংসের হাড়, পাঁঠার মাংস, পালং শাক, শুকনো ফল, যেমন কাজু, কিশমিশ ইত্যাদি কম খেতে হবে।

প্র : আর জীবনযাত্রা?

উ : কিডনি সুস্থ রাখতে তেষ্টা পেলেই জল খেতে হবে আর ৪-৫ ঘন্টা বাদে বাদে বাথরুম

যেতে হবে। কারণ প্রস্রাবের বেগ চেপে রাখলে পরবর্তীকালে সমস্যা দেখা দিতে পারে।

কিছু কিডনির অসুখ যেমন, পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ বংশানুক্রমে বাহিত হয়। এর ফলে কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারোর এই অসুখ থাকলে সন্তানের জন্ম দেওয়ার আগে জেনেটিক কাউন্সেলিং অথবা অ্যামনিওসিন্টেসিস করে জেনে নেওয়া দরকার সন্তানের রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা।

বংশে কারোর যদি কিডনির অসুখ থাকে বা আপনার হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে বোঝেন, আগে থেকে স্বাস্থ্যবীমা করিয়ে নিতে হবে। কারণ রেনাল ফেইলিওয়ের চিকিৎসা খুবই ব্যয়বহুল।

ঠিক সময়ে এলে সাপে কাটা রোগীকেও ডায়ালিসিস করে সুস্থ করে দেওয়া যায়

ডাঃ এ আর নন্দী

দূরভাষ ২৪৭-৭৪৪৩

প্র: কিছুদিন আগে কাগজে পড়লাম ক্রনিক রেনাল ফেইলিওরে (সি আর এফ) আক্রান্ত এক বৃদ্ধ ডায়ালিসিসের খরচ সামলাতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন। ডায়ালিসিস কি সত্যিই এতটা ব্যয়বহুল নাকি সি আর এফের সঙ্গে অবসাদ জড়িত থাকে?

উ: দুটো কথাই সত্যি। সারাজীবন ডায়ালিসিস চালিয়ে যাওয়া খুবই খরচ সাপেক্ষ ব্যাপার। এবং শুধু সি আর এফ বলে নয়, যে কোনও দুরারোগ্য অসুখে ভোগা মানুষই অল্প বিস্তর অবসাদ বা হতাশায় ভোগেন।

প্র: তার ফলে আত্মহত্যাও করতে পাবেন?

উ: হ্যাঁ। এরকম ঘটনা ঘটতে পারে।

প্র: কেন এমন হয়?

উ: একজন স্বাভাবিক বা অল্পবিস্তর অসুখে ভোগা মানুষ যখন আচমকা জানতে পারেন যে তিনি দুরারোগ্য কোনও অসুখে, এক্ষেত্রে রেনাল ফেইলিওরে ভুগছেন, মানসিক ধাক্কা পান তিনি। তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে তিনি বিভিন্ন ডাক্তার দেখাতে থাকেন। কেউ কেউ আবার বিধি নিষেধ কোনওটাই মানতে চান না। একটা সময় কিন্তু তাঁকে মানতে হয় যে রোগটা হয়েছে। এই সময় দু'ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে পারে। কেউ মেনে নেন। কেউ ভেঙে পড়েন। যাঁরা ভেঙে পড়েন তাঁদের কারো কারোর মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দিতে পারে। এটা আবার কেটে যায় যখন ২-৪ টি ডায়ালিসিসের পর রোগী সুস্থ বোধ করতে থাকেন। এরপর ২-৩ বছরের মাথায় যখন দেখা যায় ডায়ালিসিস চলছে, জলের মতো টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে অথচ রোগ দাঁড়িয়ে আছে একই জায়গায় বা অবস্থার অবনতি হচ্ছে। হতাশা দেখা দেয়, সেখান থেকে অবসাদ আসে।

প্র: ডায়ালিসিস ২-৩ বছর ধরে চালিয়ে গেলেও অবস্থার অবনতি হতে পারে?

উ: ক্রনিক রেনাল ফেইলিওরের উত্তর হচ্ছে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট। ডায়ালিসিস নয়। ট্রান্সপ্লান্টের জোগাড়যন্ত্র হওয়ার আগে পর্যন্ত ডায়ালিসিস করে রোগীর কষ্ট কমানো হয়। কিন্তু কেউ যদি ট্রান্সপ্লান্টের কথা না ভেবে ডায়ালিসিস করিয়ে যান, ধীরে ধীরে অবস্থার অবনতি হবে।

প্র: কিন্তু ডায়ালিসিস করে যে অনেকে সুস্থ হয়ে যান শুনেছি।

উ: ডায়ালিসিস করে সুস্থ হওয়া যায় যদি কিডনি খারাপ হয় আকস্মিক কোনও অঘটনের দরুন। যেমন, সাপ বা বিষাক্ত পোকামাকড়ের কামড়, ওষুধ বা কোনও রাসায়নিকের বিষক্রিয়া, কোনও অ্যাক্সিডেন্ট বা বড় ধরনের অপারেশন চলাকালীন প্রচুর রক্তপাত, বমি বা ডায়েরিয়ার দরুন শরীরে জলের ঘাটতি, পুড়ে যাওয়া ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে সঠিক সময়ে রোগী এলে সপ্তাহে ২-৩ টি করে ডায়ালিসিস চালিয়ে ২-৪ সপ্তাহের মাথায় কিডনির কার্যকারিতা ফিরিয়ে আনা যায়।

সমস্যা হয় ক্রনিক রেনাল ফেইলিওর অর্থাৎ যখন কোনও রোগ যেমন, জটিল ধরনের নেফ্রাইটিস, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, কিছু বংশগত রোগ যেমন সিস্টিক কিডনি ডিজিজ, কিডনি স্টোন ইত্যাদির কবলে পড়ে ধীরে ধীরে কিডনি খারাপ হতে থাকে। এক্ষেত্রে ডায়ালিসিস চালিয়ে গেলে খুব দ্রুত খারাপ হওয়ার হাত থেকে রোগীকে বাঁচানো যায় মাত্র। তার বেশি কিছু নয়।

এই দুইয়ের মাঝে রয়েছে আরেকটি গ্রুপ। অ্যাকিউট অন ক্রনিক। সাধারণত এঁদের অল্প মাত্রায় ক্রনিক রেনাল ফেইলিওর থাকে কিন্তু হঠাৎ কোনও কারণে তার মাত্রা এক লাফে বেড়ে যায় বহুগুণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সমস্ত রোগীদের তৎক্ষণাৎ ডায়ালিসিস শুরু করে দেওয়া হয়। কিন্তু যথাযথ ভাবে রোগীর ইতিহাস জানতে পারলে শতকরা অন্তত ১০ ভাগ ক্ষেত্রে ডায়ালিসিসের ধকল এবং অবশ্যই খরচের হাত থেকে রোগীকে বেশ কিছুদিনের জন্য মুক্ত রাখা যায়।

প্র: তার মানে ডায়ালিসিস ছাড়াও রোগীকে কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখা যায়?

উ: শুধু বাঁচিয়ে রাখা নয়, রোগীর কর্মক্ষমতার শতকরা ৬০ ভাগ অন্তত বজায় রাখা যায়।

প্র: কীভাবে?

উ: রোগের তীব্রতা বাড়ার নানান কারণ থাকতে পারে। রক্তচাপ বেড়ে যাওয়া বা খুব কমে যাওয়া, ডায়াবেটিস ঠিকঠাক আয়ত্তে না রাখা, কিডনি বা ইউরেটারে পাথর হয়ে বা অন্য কোনও কারণে প্রস্রাব চলাচলের পথে বাধার সৃষ্টি হওয়া, রক্তপাতের দরুণ এমন কি কিছু ওষুধপত্রের প্রভাবেও অল্প ক্রনিক রেনাল ফেইলিওরের রোগীর কিডনি হঠাৎ করে অনেকখানি খারাপ হয়ে যেতে পারে। কী কারণে খারাপ হল সেটা যদি জানতে পারা যায়, কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা, বিশেষ করে আলট্রাসনোগ্রাফি করে যদি দেখা যায় কিডনির আকার ঠিক আছে এবং রোগীর অবস্থা খুব খারাপ নয়, ওষুধপত্রের সাহায্যে চিকিৎসা করে রোগীকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া যায়।

প্র: তার মানে আর ডায়ালিসিস দরকার হল না?

উ: পরবর্তী কালে হয়তো লাগবে। কিন্তু এভাবে অন্তত ২-৪ বছরও যদি ঠেকিয়ে রাখা যায় ২ থেকে ৪ লাখ টাকা বাঁচবে এবং রোগীর জীবনীশক্তি টিকিয়ে রাখা যাবে আরও বেশ কিছু দিন।

প্র: অনেকে বলেন সময়ে ডায়ালিসিস না করালে অবস্থা খারাপ হয়ে যেতে পারে?

উ: সে তো নিশ্চয়ই। অ্যাকিউট অন ক্রনিক রোগীর চিকিৎসা খুব সাবধানতার সঙ্গে করা দরকার।

প্র: কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট তো বেশ খরচ সাপেক্ষ ব্যাপার?

উ: হ্যাঁ। তবে হিসেব করে দেখা গেছে ৫ বছর বাদে যিনি ট্রান্সপ্লান্ট করিয়েছেন তাঁর মোট খরচ, যিনি পুরোটাই ডায়ালিসিসে আছেন তার থেকে কম। তাঁর থেকেও বড় কথা জীবন যাত্রার মান। কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করিয়ে নিলে জীবন প্রায় স্বাভাবিক হয়ে যায়।

প্র: ৬০ বছরেব বেশি বয়স হলে তো আপনারা ট্রান্সপ্লান্ট বারণ করেন। সেক্ষেত্রে ডায়ালিসিস চালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কী উপায় আছে?

উ: আজকের দিনে বয়স আর তেমন কোনও সমস্যা নয়। তবে অন্য কোনও অসুবিধে থাকলে অনেক সময় ডায়ালিসিস চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে জীবনযাত্রার নিয়ন্ত্রণ কিন্তু খুবই জরুরি। না হলে পুরোপুরি সুফল পাওয়া যাবে না।

প্র: শুধু ডায়ালিসিসের ওপর থাকতে চাইলে কী কী সাবধানতা মেনে চলতে হবে?

উ: অনেক লম্বা ফিরিস্তি। এবং প্রতিটি কথা একদম বেদবাক্যের মতো মেনে চলতে হবে।

(১) দু'চারটে ডায়ালিসিস করে খরচ বেশি বলে বন্ধ করে দিলে চলবে না। সপ্তাহে ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা অর্থাৎ ২ থেকে ৩ বার ডায়ালিসিস করাতে হবে।

(২) খাবার দাবারে নিয়ন্ত্রণ। আগে প্রোটিন জাতীয় খাবারে খুব বেশি কড়াকড়ি ছিল। এখন ডায়ালিসিস নিয়মিত করা হলে সে রকম বিধি নিষেধ আর রাখা হয় না। তবে কিডনির ওপর যাতে অতিরিক্ত চাপ না পড়ে সে দিকে খেয়াল রাখা দরকার।

প্রোটিনের হিসেব মোটামুটি ০.৫ গ্রাম/ কেজি। অর্থাৎ ৬০ কেজি ওজন হলে দিনে ৩০ গ্রামের বেশি প্রোটিন সচরাচর দেওয়া হয় না। এই পরিমাণ প্রোটিন পাওয়া যাবে দু'টো ডিমের সাদা অংশ, ৫০ গ্রাম মাছ অথবা মুরগির মাংস, ২৫ গ্রাম ছানা, সবজি, রুটি এবং ভাত থেকে। সবজি, রুটি এবং ভাতের পরিমাণও মেপে দেওয়া হয়।

রক্তচাপ বেশি থাকলে, ঘাম বেশি হলে, খাবারে নুন দেওয়া হয় মেপে। চায়ের চামচের ১ চামচের মতো দিনে। অর্থাৎ ৪ থেকে ৫ গ্রাম। সবজি এবং অন্য খাবার দাবার থেকে ১ গ্রামের মতো আসে। অতএব রান্নায় ব্যবহার করা যাবে আধ চামচ থেকে পৌনে এক চামচের মতো।

পটাসিয়াম বেশি আছে এমন খাবার প্রায় দেওয়াই হয় না। যেমন ডাবের জল, ডাল, ট্যাটো, প্রায় সব ধরনের টক ফল ইত্যাদি। পাকা পেঁপে বা কলার মধ্যে পটাসিয়াম কম থাকে বলে অল্প পরিমাণে দেওয়া যেতে পারে।প্র: কলকাতায় কোথায় কোথায়

টমেটো, প্রায় সব ধরনের টক ফল ইত্যাদি। পাকা পেপে বা কলার মধ্যে পটাসিয়াম কম থাকে বলে অল্প পরিমাণে দেওয়া যেতে পারে।

আসলে এই খাবারের ব্যাপারটা পুরোটাই নির্ভর করে রোগীর শারীরিক অবস্থার ওপর। ট্রান্সপ্লান্ট না করালে সি আর এফ সারবার রোগ নয়। এগোতে এগোতে সে অ্যান্ড স্টেজ রেনাল ডিজিজে পৌঁছবে অর্থাৎ কিডনির কার্যকারিতা শতকরা ১০ ভাগের নীচে নেমে যাবে। খাবারের হিসেব নিকেশ এই পর্যায়ের ওপরই নির্ভর করে। অবস্থা ভাল থাকলে বিধি নিষেধ কম। খারাপ থাকলে বেশি।

(৩) রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিস আয়ত্তের মধ্যে রাখতে হবে। এখানে আবেক প্রস্থ খাওয়া দাওয়ার বিধি নিষেধ। মিষ্টি এবং নুনে। সাথে ওষুধ'পত্র।

(৪) রক্তাল্পতা নিয়ন্ত্রণ ভীষণ জরুরি। বারে বারে রক্ত দেওয়া আবার একটু বিপজ্জনক হয়ে যায়। কারণ রক্তের মধ্যে দিয়ে শরীরে কোনও সংক্রমণ ঢুকলে এই অবস্থায় তা খুব ক্ষতিকর। এটা খানিকটা এড়ানো যেতে পারে হেপাটাইটিসের টিকা নেওয়া থাকলে। খরচায় কুলোতে পারলে সব থেকে ভাল সপ্তাহে দু' থেকে তিনবার এরিথ্রোপোয়েটিন ইনজেকশন নেওয়া। অনেকের পক্ষেই তা সম্ভব হয় না। কারণ এক একটা ইনজেকশনের দাম ৭৫০-৮০০ টাকা।

(৫) এদের হৃদরোগ এবং হাড়ের অসুখে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা থাকে। সে ব্যাপারে খেয়াল রাখা দরকার।

(৬) নিয়মিত ডাক্তারি পরীক্ষা নিরীক্ষা।

(৭) মন ঠিক রাখার জন্য সাইকলোজিকাল কাউন্সেলিং।

প্র: এ তো বিরাট খরচের ধাক্কা!

উ: হ্যাঁ, সারাজীবন ডায়ালিসিসের ওপর বেঁচে থাকতে চাইলে মাসে কম করে ১৩,০০০-১৫,০০০/ টাকার মতো খরচ। অনেক দূরদূরান্ত থেকে যাঁরা আসেন তাঁদের খরচ আরও বেশি।

প্র: জীবন যাত্রার মানই বা কী রকম! স্রেফ বেঁচে থাকার জন্য বেঁচে থাকা!

উ: তা ঠিক নয়। নিয়মকানুন ঠিকমতো মেনে চললে কম করে ৫/১০ বছর এমনকি ১৫ বছরও প্রায় স্বাভাবিক কর্মক্ষম জীবনযাপন করা যায়। কিন্তু অধিকাংশ সময় বাধা হয়ে দাঁড়ায় মানসিক অবসাদ।

প্র: কর্মক্ষম জীবন বলছেন, কিন্তু সপ্তাহে দু' থেকে তিন দিন তো ডায়ালিসিস চলবে। সে ক'দিন ছুটি নিতে হবে। আর ধকলও তো আছে।

উ: এমন অনেকে আছেন যাঁরা চারটে পর্যন্ত কাজ করে তারপর ডায়ালিসিস নেন। আবার পরদিন সকালে অফিস করেন। কাজেই নিয়ম ঠিকঠাক মেনে চললে ওটা তেমন কোনও সমস্যা নয়।

প্র: আপনার মতে প্রধান সমস্যা তাহলে মানসিক অবসাদ?

উ: না, প্রথম সমস্যা আর্থিক। অনেক সময় এখান থেকেও মানসিক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে।

প্র: কলকাতায় কোথায় কোথায় ডায়ালিসিস হয়?

উ: বেসরকারি সংস্থার মধ্যে উডল্যান্ডস, বেলভিউ, কোঠারি, ক্যালকাটা হসপিটাল, এ এম আর আই, ওক হার্ড, হেলথ পয়েন্ট, লাইফলাইন, মে ফ্লাওয়ার, কিওর সেন্টার, রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান, শঙ্কর নাথ ডায়ালিসিস সেন্টার ইত্যাদি। সরকারি সংস্থার মধ্যে পিজি হাসপাতাল, নীলরতন সরকার, এবং শম্ভুনাথ পণ্ডিত। তবে সরকারি সংস্থায় সি আর এফের রোগীদের ট্রান্সপ্লান্ট করার আগে পর্যন্তই কেবল ডায়ালিসিস করার অনুমতি আছে। অথবা রোগী যদি খুব খারাপ হয়ে যায় তবেই।

প্র: খরচ কোথায় কী রকম?

উ: বেসরকারী সংস্থায় খরচ মোটামুটি ১০০০ থেকে ১৩০০ টাকার মধ্যে। পি জির পেয়িং বেডে ডায়ালিসিস পিছু খরচ ৫০০ টাকা। ফ্রি বেডে ফ্রি। নীলরতন সরকাবে পয়সা লাগে না।

প্র: কিছু ডায়ালিসিস নাকি অনেক কম খরচে ঘরে বসে করা যায়?

উ: ঘরে করা যায়। কিন্তু খরচ কম নয়। সি এ পি ডি বা ক্রনিক অ্যাম্বুলেটরি পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিসের কিছু সুবিধে আছে। এই ডায়ালিসিস বাড়িতে বসে করা যায় এবং রোগী কাজকর্ম করতে পারেন। শুয়ে বসে থাকার দরকার হয় না। তবে খরচ বেশ বেশি। এই পদ্ধতিতে যাওয়ার আগে পেটে একটি অপারেশন করে পেটের উপরের মাংসপেশির ঠিক নীচে একটি ক্যাথিটার লাগিয়ে দেওয়া হয়। এর জন্য হাসপাতালে ভর্তি থাকতে হয় দু থেকে তিন দিন। ১২,০০০ - ১৫,০০০ টাকার মতো খরচ। এরপর প্রতিদিন ৫০০-৬০০ টাকা। ওষুধ বা আনুষঙ্গিক খরচ তো আছেই।

কিডনি ট্রান্সপ্লাণ্টের পর খাওয়া দাওয়ার তেমন বিধি নিষেধ থাকে না

ডাঃ অভিজিৎ তরফদার

দূরভাষ : ২২৩-১১২৪

প্র : কিডনি ট্রান্সপ্লাণ্ট হওয়া মানে তো ধনে প্রাণে শেষ?

উ: মোটেই তা নয়। কিডনি ট্রান্সপ্লাণ্ট বলতেই আমরা বড় বড় বেসরকারি সংস্থার কথা ভাবি। যেখানে স্বাভাবিক ভাবেই খরচ বেশ বেশি। বাড়ির কেউ না দিয়ে কিডনি কিনতে বেরোই। সেখানে খরচ বাড়ে। এবং সে বাবদ ওষুধ পত্রেব খরচও বাড়ে। ঘনিষ্ট আত্মীয়দের মধ্যে কেউ কিডনি দিলে যেখানে অপারেশনেব বছর খানেক পর প্রতিমাসে গড় খরচ ৫০০-৬০০ টাকা, অনাত্মীয়দের মধ্যে থেকে সংগ্রহ করা হলে সেখানে খরচ বেড়ে দাঁড়ায় মাসে প্রায় ৪ হাজার টাকার কাছাকাছি। নিকটাত্মীয়র কিডনি পেলে এবং সরকারি সংস্থায় অপারেশন করালে ১ লক্ষ ২০-৩০ হাজার টাকার মধ্যে অপারেশন এবং এক বছরের ওষুধের খরচ হয়ে যায়। অন্যথায় ৩-৪ লক্ষ টাকা। নিকটাত্মীয়র কিডনি পেলে শুধু যে খরচ কম হয় তা নয়, অপারেশন-পরবর্তী জটিলতাও কমে। প্রায় ক্ষেত্রেই রোগী ১০-১২ বছর বেশ ভাল ভাবে বেঁচে থাকে।

প্র: ট্রান্সপ্লাণ্টের পর ১০-১২ বছর ভালভাবে বাঁচতে তো বেশি মানুষকে দেখা যায় না?

উ: ভালভাবে বাঁচতে গেলে তিনটে নিয়ম মানতে হবে।

(১) কিডনি খারাপ হয়েছে, ট্রান্সপ্লান্ট করতে হবে জানতে পারা মাত্র চিকিৎসার জন্য এসে উপস্থিত হতে হবে। এবং অপারেশন করিয়ে নিতে হবে যথাশীঘ্র সম্ভব।

(২) কিডনি সংগ্রহ করতে হবে নিকটাত্মীয় কারোর কাছ থেকে।

(৩) অপারেশনের পর নিয়ম কানুন সব ঠিকঠাক মেনে চলতে হবে। তার মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল, ওষুধ ঠিকমত খাওয়া এবং কোনও জটিলতা দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া।

প্র: কিডনি খারাপ হয়েছে সেটাই তো প্রায় সময় বুঝতে পারা যায় দেরিতে?

উ: সবসময় কিন্তু বুঝতে না পারার জন্য দেরি হয় এমন নয়। কিডনি আর ভাল হবে না, পাল্টাতে হবে জানতে পারা মাত্র মানুষের মধ্যে দিশেহারা ভাব দেখা দেয়। ট্রান্সপ্লাণ্ট করাব কি করাব না ভাবতে ভাবতে অধিকাংশ পয়সা খরচ হয়ে যায় ডায়ালিসিসে। তারপর যখন বুঝতে পারা যায় ডায়ালিসিসে চলবে না ট্রান্সপ্লান্ট করতে হবে, ততদিনে পয়সা শেষ। পয়সা জোগাড় হল তো ডোনার পাওয়া যাচ্ছে না। এইসব করে দেরি হয় ।

প্র: রোগ ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ট্রান্সপ্লান্টের প্রস্তুতি নিতে হবে?

উ: নিশ্চয়ই। তার কারণ সাধারণ মানুষের যে ধারণা কিডনি শরীরে শুধু ছাঁকনির কাজ করে তা পুরোপুরি ঠিক নয়। নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থ শরীর থেকে বার করে দেওয়া তার প্রধান কাজ ঠিকই, এই দায়িত্ব ডায়ালিসিস নিতে পারে, কিন্তু এরই সঙ্গে সে পালন করে আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। অংশ নেয় নানান জৈব বিপাকীয় কাজে—রক্ত তৈরিতে সাহায্য করা, রক্তচাপ ঠিকঠাক রাখা, হাড়ের গঠনে সাহায্য করা, শরীরে জল এবং লবণের সঠিক মাত্রা বজায় রাখা ইত্যাদি। শরীরের ভেতরকার তরলের অম্লত্ব, ক্ষারত্ব বজায় রাখাও তার কাজ। কাজেই কিডনি পুরোপুরি খারাপ হয়ে গেলে ছাঁকনির কাজ ছাড়াও অন্যান্য সব দিক বজায় রাখার জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি সুস্থ কিডনি এনে বসিয়ে দেওয়া দরকার।

প্র: কী কী উপসর্গ দেখা দিলে বুঝতে হবে কিডনি পাল্টানো দরকার?

উ: কিছু উপসর্গ যেমন ক্লান্তি, অবসাদ, রক্তচাপ খুব বেড়ে যাওয়া, সমস্ত শরীর বিশেষত পা ফুলে যাওয়া, ইউরিনের পরিমাণ কমে যাওয়া, মানসিক উৎকণ্ঠা বাড়া, খিদে কমে যাওয়া বা খিদে হল কিন্তু খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হয়ত বমি হয়ে গেল, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি দেখা দিলে দ্রুত নেফ্রোলজিস্টের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

প্র: কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের জন্য কী প্রস্তুতি নিতে হয়?

উ: প্রথমেই প্রয়োজনমতো শুরু করা হয় ডায়ালিসিস। এর সঙ্গে রোগী যাতে ট্রান্সপ্লান্টের ধকল সামলাতে পারেন তার জন্য চলে অন্যান্য চিকিৎসা। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে আনা হয়, অপুষ্টি কমানো হয়, কোনও ভাবে শরীরে যাতে অন্য কোনও রোগ সংক্রমণ না হয় তার দিকে খেয়াল রাখা হয়। ট্রান্সপ্লান্টের আগে শরীরের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যঙ্গ যেমন, হৃৎপিন্ড, মস্তিকে ইত্যাদি যাতে কোনওভাবে আক্রান্ত না হয় সেদিকেও খেয়াল রাখা হয়। এর সঙ্গে চলে উপযুক্ত ডোনার খুঁজে বার করার পরীক্ষার-নিরীক্ষা।

প্র: যিনি কিডনি দেবেন তাঁর বয়স এবং শারীরিক সুস্থতার ব্যাপার নিশ্চয়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ?

উ: ডোনারের বয়স হওয়া চাই ১৮-৬০ এর মধ্যে। তাঁকে শারীরিক ভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ হতে হবে। বিশেষ করে কিডনি সংক্রান্ত কোনও গোলযোগ, উচ্চ রক্তচাপ বা ডায়াবেটিসের রোগী কখনও ডোনার হিসেবে বিবেচিত হবেন না।

প্র: এরকম কাউকে পাওয়া গেলে তো সমস্যা মিটে গেল?

উ: না সমস্যা মেটে না। দাতা সম্পূর্ণ সুস্থ প্রমাণ হওয়ার পর দাতা এবং গ্রহীতার মধ্যে টিস্যু ম্যাচিংয়ের স্বরূপ জানতে করা হয় 'টিস্যু টাইপিং টেস্ট'। এও আসলে এক

জাতীয় রক্ত পরীক্ষাই। রক্তের সম্পর্কযুক্ত আত্মীয়দের মধ্যে টিস্যুম্যাচিংয়ের ফল সাধারণভাবে ভাল হয়। টিস্যু ম্যাচিংয়ের ফল যত ভাল হয়, অপারেশন পরবর্তী জটিলতা তত কমে।

প্রঃ অপারেশন পরবর্তী জটিলতা বলতে?

উঃ কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের পর ৬ মাস কি ১ বছরের মধ্যে ৩ টি বিপর্যয় দেখা দিতে পারে।

(১) রোগ সংক্রমণ

(২) শরীরের নতুন কিডনিকে সহ্য করতে না পারা

(৩) ওষুধ পত্রের বিরূপ প্রতিক্রিয়া

প্রঃ ট্রান্সপ্লান্টের পর রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা বেড়ে যায় কেন?

উঃ নতুন কিডনি শরীরের পক্ষে একটি বহিরাগত বস্তু। শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা ওষুধপত্রের সাহায্যে কমিয়ে না দিলে শরীর চাইবে তাকে বর্জন করতে। এটা করতে গিয়ে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কমে যায়। সংক্রমণের সম্ভাবনা বাড়ে।

প্রঃ কী ধরনের সংক্রমণ হতে পারে?

উঃ সব ধরনের। ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, প্রোটোজোয়া, ফাংগাস সব কিছুর সংক্রমণ হতে পারে।

প্রঃ শরীরের সব প্রত্যঙ্গেই কি সংক্রমণ ছড়াতে পারে?

উঃ হ্যাঁ। বেশি সম্ভাবনা নিউমোনিয়া হওয়ার। প্রস্রাবে সংক্রমণ হতে পারে। ম্যানিনজাইটিস, এনকেফেলাইটিস বা সমস্ত শরীরে সংক্রমণ ছড়িয়ে সেপটিসিমিয়াও হওয়া সম্ভব। তবে এ নিয়ে এত ভয় পাওয়ার কিছু নেই। যথোপযুক্ত সাবধানতা মেনে চললে এরকম বিপদ কমই হয়।

প্রঃ যথোপযুক্ত সাবধানতা বলতে? বেরিয়ার নার্সিং?

উঃ সামান্য কিছু ক্ষেত্র ছাড়া বেরিয়ার নার্সিংয়ের দরকার পড়ে না। অর্থাৎ সবার থেকে আলাদা করে প্রায় জীবাণুমুক্ত পরিবেশে রাখার প্রয়োজন হয় খুব কম ক্ষেত্রে। সাধারণ কয়েকটি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে বলা হয়।

(১) বাড়িতে কারোর কোনও রোগ সংক্রমণ হলে, তা হাঁচি, কাশি, জ্বরজারি বা পেট খারাপ যাই হোক, তার থেকে দূরে থাকতে হবে। আলাদা ঘরে থাকতে পারলে ভাল।

(২) খাবার জল এবং বাসনপত্র জীবাণুমুক্ত হতে হবে। জল, খাবার দাবার ভাল করে ফুটিয়ে খেতে হবে। বাসনপত্র ধুতে হবে পরিষ্কার জলে।

(৩) সারা বাড়ি বিশেষ করে রান্নাঘর, বাথরুম পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

(৪) বাজারের খাবার, বাইরের জল এবং নিষিদ্ধ খাবার ছোঁয়া যাবে না।

(৫) ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ না করে কোনও ওষুধপত্র খাওয়া যাবে না। ইত্যাদি।

প্রঃ তাহলে তো ঘন ঘন ডাক্তারের কাছে যেতে হবে?

উঃ প্রথম ৩ মাস সপ্তাহে কমপক্ষে একবার করে আসতে হবে। পরের ৩ মাস ২ সপ্তাহে একবার। ৬ মাস থেকে ১ বছর মাসে একবার করে। আর ১বছরের পর ৩ মাসে

একবার। শরীরে কোনও সংক্রমণ হচ্ছে কিনা, নতুন কিডনির সঙ্গে শরীরে মানিয়ে চলতে পারছে নাকি, সে সব বুঝে নিয়ে ওষুধ পত্রের মাত্রা কম বেশি করবার জন্য এতবার আসা দরকার। সাধারণত যত দিন যায় তত ওষুধপত্রের পরিমাণ কমতে থাকে। আসার ব্যাপারটাও কমে যায়। তবে স্বাভাবিকতায় সামান্য বিচ্যুতি এলেই কিন্তু ডাক্তারের কাছে আসতে হবে।

প্র: কী রকম বিচ্যুতি?

উ: (১) সামান্য কাশি বা জ্বর হলে

(২) প্রস্রাবের পরিমাণ কমে গেলে। সাধারণত ট্রান্সপ্লান্টের পর দিনে ৩-৪ লিটার জল খেতে হয়। এবং প্রস্রাব হওয়া উচিত ২.৫-৩.৫ লিটার

(৩) খিদে কমে গেলে

(৪) বমিবমি ভাব বা বমি হলে

(৫) রক্তচাপ বেড়ে গেলে

(৬) অপারেশনের জায়গা ফুলে গেলে বা ব্যথা হলে

প্র: ট্রান্সপ্লান্টের পর খাওয়া দাওয়া কী রকম হওয়া উচিত?

উ: সেটা অনেকটা সুস্থতার উপর নির্ভর করে। তবে সাধারণ ভাবে ক্যালরির হিসেব নিকেশ কিছুটা বেধে দেওয়া হয়। চর্বিজাতীয় খাবার, ভাজাভুজি যথাসম্ভব বাদ দিতে পারলে ভাল। যাঁদের ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ বা হৃদরোগের প্রবণতা আছে বা রোগগুলি আছে তাঁদের ক্ষেত্রে চিনি, মিষ্টি অথবা শর্করা জাতীয় খাবারে নিষেধাজ্ঞা, নুন ও নোনতা খাবার এবং বেশি কোলেস্টেরল আছে এমন খাবারে বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়।

প্র: ট্রান্সপ্লান্টের ৮-১০ বছরের মাথায় নাকি ক্যান্সার হতে পারে?

উ: সম্ভাবনা থাকে। তবে সেটা যে ধরনের ক্যান্সার তা নিয়ে বেশি চিন্তা করার দরকার নেই। যে সমস্ত নিয়ম কানুন বলা হয়েছে তা মেনে চললে রোগী দীর্ঘদিন স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারবেন।

প্র: হেপাটাইটিস, এডস এ সমস্ত রোগও কি ট্রান্সপ্লান্টের পর বেশি হয়?

উ: আগেই বলেছি অপারেশনেব পর শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। ফলে সংক্রমণের সম্ভাবনা বাড়ে। তবে দু'চার বছর ভাল থাকার পর আস্তে আস্তে ইমিউনো সাপ্রেসেন্টের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হয়। সংক্রমণের সম্ভাবনা কমে আসে।

প্র: একই ভ্রূণ থেকে জন্মানো ভাই বা বোন যদি কিডনি দেয় তাহলে নাকি ইমিউনোসাপ্রেসেণ্ট দেওয়ার দরকার পড়ে না?

উ: কম দরকার পড়ে। আর খুব তাড়াতাড়ি এর পরিমাণ কমিয়ে আনা যায়। সাফল্যের হারও খুব ভাল।

প্র: আর মা সন্তানে?

উ: সেখানেও ভাল। তবে একই ভ্রূণ থেকে জন্মানো যমজ ভাইবোনের ক্ষেত্রে সব থেকে ভাল।

প্রঃ কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের পর স্বাভাবিক বিবাহিত জীবন যাপন করা যায়?

উঃ পুরোপুরি। পুরুষের পক্ষে বাবা হওয়াও সম্ভব। কিন্তু ট্রান্সপ্লান্টের পর কোনও মহিলা মা হবেন কিনা সেটা ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করা উচিত।

একটি ইতিহাস/আমার অভিজ্ঞতা

৯৬ সালের জুন মাসে কৃষ্ণনগর থেকে আমার বাঙ্গুর অ্যাভিন্যুর বাড়িতে দেখা করতে এসেছিল বন্দনা। আসার কথা ছিল। তবু দরজা খুলে বুঝতে পারিনি কে। বছর ২৫-২৬ এর তরতাজা মেয়ে। কাঁধে ভারী ব্যাগ। ভেবেছি শ্লেলস গার্ল টার্ল হবে। ও পরিচয় দিল। অবাক হয়ে গেলাম। ৮ বছর আগে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট হয়েছে তবু এত তারুণ্য!

বন্দনার ব্যাপারটা বিশেষ এই কারণে যে ৮ বছর আগে ওর শরীরে বসেছে ওরই মৃত বাবার কিডনি। ভারতে প্রথম জীবিতের শরীরে মৃতের কিডনি প্রতিস্থাপনের অর্থাৎ রিলেটেড ক্যাডাভার কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের দরুণ ও এক ইতিহাসের শরিক।

বন্দনার জীবন যুদ্ধের ধরন দেখে ভাল লেগেছিল। সে সময় ও স্কুলে পড়াত, টিউশনি করত, বিধবা মার সঙ্গে মিলে মিশে সংসারের খুটিনাটি কাজ করত। আর প্রেম করত চুটিয়ে। মার ভয় ভাঙতে দেরি হওয়ায় বিয়ে হল এই গত বছর।

আজ ১২ বছর ধরে ভাল আছে, স্বাভাবিক আছে বন্দনা। ইউরোলজিস্ট ডাঃ মোহন শীল এবং নেফ্রোলজিস্ট ডাঃ এ আর নন্দীর তত্ত্বাবধানে ১৯৮৮ সালের ৬ই জুন বেলভিউ নার্সিং হোমে অপারেশনটি হয়।

জল কম খেলে কিডনিতে পাথর হতে পারে

ডাঃ শিবাজী বসু

দূরভাষ : ৪৬৪-০৫৩৫

প্র: পালংশাক খেলে কিডনিতে পাথর হয়?

উ: ঠিক তা নয়। আপনার মধ্যে যদি পাথর হওয়াব প্রবণতা থাকে অথবা একবার পাথর হয়ে গিয়ে থাকে সেক্ষেত্রে পালংশাক খেতে নিষেধ করা হয়।

প্র: পাথর হওয়ার প্রবণতা বলতে?

উ: পাথর কেন হয় তা আমরা এখনও পুরোপুরি জানি না। তবে পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা গেছে নীচের কারণগুলির এক বা একের বেশী যদি কারোব মধ্যে থাকে তার ক্ষেত্রে পাথর হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

(১) বংশগত। নিকটাত্মীয়ে:়র মধ্যে কাবোর যদি পাথর থাকে

(২) ত্রুটিপূর্ণ খাদ্যাভ্যাস

(৩) জল কম খাওয়া

(৪) ওষুধ। নির্বিচাবে মাথাব্যথাব ওষুধ খেয়ে যাওয়া—যাকে বলে 'অ্যানালজেসিক অ্যাবিউজ

প্র: কীরকম খাওযা দাওয়া করলে পাথর হওয়াব সম্ভাবনা কম থাকবে?

উ: চিজ, পাঁঠা-খাসির মাংস খাবার তালিকায় কম থাকা ভাল। দুধের বদলে ছানা বা দই খাওয়া। আর প্রচুর পরিমাণে জল। দিনে ২-৩ লিটার। স্বাভাবিক ধারায় প্রচুর প্রস্রাব হলে পাথর হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

প্র: কিডনিতে পাথর হয়েছে কীভাবে বোঝা যাবে?

উ: এর কোনও নির্দিষ্ট হিসেব নেই। একেক জনের ক্ষেত্রে একেক রকম উপসর্গ দেখা দেয়। কারো কারো পিঠের কাছে কোমরের ওপর দিকটায় খুব যন্ত্রণা হয়। ব্যথা সেখান থেকে সামনের দিকে আসে এবং ওঠানামা করে। কখনও আবার প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত

পড়ে। শুধু পিঠে ব্যথা হলে অনেকে আর্থাইটিস ভেবে ব্যথা কমার ওষুধ খেয়ে যান। ফলে বিপদ বাড়ে। অনেকের বারবার জ্বর আর প্রস্রাবে সংক্রমণ হতে থাকে। সব থেকে বিপদ হয় তাঁদের নিয়ে যাঁদের কোনওরকম কষ্টই থাকে না।

প্র: কোনও কষ্টই থাকে না?

উ: হয়ত কিছু থাকে, অম্বল, হজমের গণ্ডগোল, কোষ্ঠকাঠিন্য, অর্থাৎ এমন কিছু যা থেকে সহজে বোঝবার উপায় নেই কি পাথর আছে।

প্র: তবে তো খুব বিপদ!

উ: হ্যাঁ, হতে পারে। আবার হয়ও না। লাগাতার অম্বল, হজমের গণ্ডগোল দেখে ডাক্তার হয়তো ভাবলেন গলব্লাডারে কোনও সমস্যা হয়েছে কিনা। সেইমতো আলট্রা-সনোগ্রাফি করানো হল। দেখা গেল গলব্লাডার ঠিকই আছে। পাথর রয়েছে কিডনিতে।

প্র: তাহলে রোগ যথাসময়ে ধরা নাও পড়তে পারে?

উ: সেটাই তো সমস্যা। যাঁদের রোগের সূত্রপাতেই প্রস্রাবে দিয়ে রক্ত আসতে শুরু করে তাঁরা সেই অর্থে ভাগ্যবান। ভয় পেয়ে দৌঁড়ে আসেন ডাক্তারের কাছে। ফলে চটপট চিকিৎসা হয়ে দ্রুত সুস্থ হয়ে যান। যাঁদের উপসর্গ কেবল পিঠ ব্যথা তাঁরা হয় মুঠো মুঠো ব্যথা কমানোর ওষুধ খান। নয়তো হোমিওপ্যাথি করান। ফলে শেষমেশ যখন আসেন, কিডনিও কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে। অল্প জ্বর, প্রস্রাবে সংক্রমণের সঙ্গে যদি ব্যথা না থাকে অ্যান্টিবায়োটিক খেতে থাকা খুব চালু অভ্যেস। ফলে রোগ বেশ জাঁকিয়ে বসে। অথচ একটু সচেতন হলে রোগ নির্ণয় কঠিন কিছু নয়।

প্র: কীভাবে হবে রোগ নির্ণয়?

উ: প্রথমে সাধারণ প্রস্রাব পরীক্ষা করে দেখে নিতে হবে রক্ত আছে কিনা। পেটের একটা এক্সরে। এবং সম্ভব হলে ওপর পেটের আলট্রাসনোগ্রাফি। পাথর থাকলে এতেই সব কিছু জানা যাবে। এরপর চিকিৎসা শুরু করার আগে পেটের একটি বিশেষ ধরনের এক্সরে, ইন্ট্রাভেনাস ইউরোগ্রাম বা আই ভি ইউ করে দেখে নিতে হবে কিডনির কার্যক্ষমতা ঠিক আছে কিনা।

প্র: পাথর হলে কি অপারেশন করাতেই হবে?

উ: সব সময় নয়। ছোট পাথবের ক্ষেত্রে অনেক সময় অপারেশন দরকার হয় না। কিছু ওষুধপত্র আর দিনে ৪ লিটার জল। এছাড়া ৪ চামচ কুলত্থ কলাই এক গ্লাস জলে সারারাত ভিজিয়ে রেখে রোজ সকালে সেই জল খেতে হবে। ছোট পাথর এতেই অনেক সময় প্রস্রাবে মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে যায়। এর সঙ্গে অবশ্য নিয়ম করে ৬ মাস বাদে বাদে আলট্রাসনোগ্রাফি করে দেখে নিতে হবে কিডনি ঠিক আছে কিনা।

প্র: হোমিওপ্যাথিতে শুনেছি পাথর গলিয়ে দেয়?

উ: আমি ঠিক জানি না। তবে শুনেছি ছোট পাথর অনেক সময় প্রস্রাবের মধ্যে দিয়ে বার করে দিয়েছেন ওঁরা। তবে আমি বলব হোমিওপ্যাথি ওষুধ খান আর যাই করুন ৬ মাস অন্তর অন্তর আলট্রাসনোগ্রাফি করিয়ে দেখবেন পাথর সত্যিই বেরিয়ে গেছে কিনা। বা কিডনির অবস্থা কী।

প্র: পাথর বড় হলে অপারেশন করতে হবে?

উ: পাথর বার করার আপাতত তিনটি পদ্ধতি আছে।

(১) পেট কেটে অপারেশন করে।

(২) আলট্রাসাউন্ডের সাহায্যে পাথর গুঁড়িয়ে প্রস্রাবের মধ্যে দিয়ে বার করে আনা। যার নাম লিথোট্রিপসি।

(৩) এন্ডোস্কোপিক পদ্ধতির সাহায্যে পিঠে ছোট একটি ফুটো করে সেখান দিয়ে যন্ত্রপাতি ঢুকিয়ে তার মাধ্যমে। এর নাম পি সি এন এল বা পারকিউটেনিয়াস নেফ্রোলিথোটমি।

পেট কাটার কয়েকটি অসুবিধেজনক দিক থাকায়, খরচ সাপেক্ষ হলেও দ্বিতীয় আর তৃতীয় পদ্ধতি দুটি জনপ্রিয়তা পেয়েছে বেশি।

প্র: অসুবিধেজনক দিক বলতে? ঘরে বেশিদিন আটকে থাকা?

উ: তা তো আছেই। এছাড়া পাথর একবার হলে সাবধানতা যথাযথ পালন করলেও আবার হওয়ার একটা সম্ভাবনা থেকে যায়। কিডনির ওপর বারবার কাটাছেঁড়া বাঞ্ছনীয় নয়। তবে আমার ব্যক্তিগত মত, পাথরের ধরন যদি খুব জটিল না হয় আর রোগীর আর্থিক সঙ্গতিও যদি সে রকম না থাকে, প্রথমবার অপারেশন করানো যেতে পারে।

প্র: তবে কি, কী পদ্ধতিতে পাথর বার করবেন তা পাথরের ধরনের ওপর নির্ভর করে?

উ: কিছুটা তাই। তবে রোগীর মর্জির ওপরও ব্যাপারটা নির্ভর করে। পাথরেব আকার খুব বড় হলে পি সি এন এল করা উচিত। ইউরিন পাইপে পাথর থাকলে লিথোক্লাস্ট অর্থাৎ ইউরিনের রাস্তা দিয়ে সরু নল ঢুকিয়ে আলট্রাসাউন্ডোর সাহায্যে পাথর গুঁড়িয়ে বার করে আনা যায়। কেউ যদি মনে করেন পুরোপুরি যন্ত্রণাবিহীন অপাবেশন লিথোট্রিপসি করাবেন, তাও করা যেতে পারে। আর সার্জারি তো আছেই।

প্র: লিথোট্রিপসিতে পাথর পুরোপুরি বেরোয়?

উ: একবারে না বেরোতেও পারে। বড় পাথর হলে বেশ কয়েকটা সিটিং দরকার হয়। এবং পাথর পুরোপুরি বেরোলো কিনা তা এক্সরে করে দেখে নেওয়া হয়।

প্র: লিথোট্রিপসিব খরচ কী রকম?

উ: কটা সিটিং দরকার তার ওপর নির্ভর করে। মোটামুটি ১৫-২৫ হাজার টাকার মতো।

প্র: লিথোট্রিপসি করার ৬ মাস পরে দেখা গেছে পাথর রয়ে গেছে। এরকম কেন হয়?

উ: পাথর রয়ে গেছে এই ধারণাটা ঠিক নয়। প্রতি ৪ কিডনি স্টোন রোগীর মধ্যে একজনের বারবার হওয়াব সম্ভাবনা থাকে। এবং পাথব মুক্ত হওযাব ৬ মাসেব পব থেকে যে কোনও সময় আবার পাথর হতে পারে।

প্র: তাহলে কি বারবারই এসব পদ্ধতি চালিয়ে যেতে হবে?

উ: না। ব্যাপারটা ঠিক সেরকম নয়। যাঁদের দু'টো কিডনিতেই পাথর হয় বা বারবার হওয়ার প্রবণতা থাকে তাঁদের কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে বলি আমরা। সাধারণত যদি কারোর গাউট থাকে, রক্তে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ বেশি থাকে বা প্যারাথাইরয়েড টিউমার থাকলে এরকম হতে পারে। সেক্ষেত্রে রোগের চিকিৎসা করলে পাথরের সমস্যাও কমে আসে।

প্র: অপারেশনের পর কী কী নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়?

উ: পেট কেটে অপারেশন হলে হাসপাতালে থাকতে হবে ৭-১০ দিন। তারপর একমাস বিশ্রাম। পি সি এন এল করলে হাসপাতালে ৩ দিন আর বাড়িতে দিন ৪-৫। লিথোট্রিপসির ক্ষেত্রে সে দিনই রোগী বাড়ি চলে যেতে পারেন। তবে পাথরের আকার এবং কাঠিন্যের ওপর নির্ভর করে ২-৩ বার এমনকি কখনও ৫-৬টা সিটিংয়েরও দরকার হয়। প্রতিটি সিটিংয়ের মধ্যে ১০-১২ দিনের পার্থক্য থাকে।

এবার খাবার দাবার। প্রথমেই পাথরের চরিত্র নির্ধারণ করে জেনে নেওয়া হয় কী কারণে পাথর হয়েছিল। তারপর সেই অনুযায়ী খাওয়া দাওয়ার নিয়ম কানুন বেঁধে দেওয়া হয়।

সাধারণত দুধ, চিজ, পাঁঠা-খাসির মাংস, কচু, পালংশাক, স্যালাড ইত্যাদি না খাওয়া উচিত। আর জল খাওয়া উচিত দিনে কম করে ৪ লিটার।

এছাড়া, প্রতি বছর নিয়ম করে এক্সরে এবং প্রস্রাব পরীক্ষা অবশ্যই করতে হবে। যদি মনে হয় ভুলে যাবেন তাহলে আপনার জন্মদিনের দিনটি এ বাবদ ধার্য করুন। তাহলে আর ভোলার সম্ভাবনা থাকবে না।

প্র: লিথোট্রিপসি করালে নাকি কিডনির কার্যক্ষমতা কিছুটা কমে যায়? এবং পরবর্তী কালে উচ্চ রক্তচাপ দেখা দেবার প্রবণতা থাকে?

উ: লিথোট্রিপসি করার পর ২-৩ সপ্তাহ কিডনি একটু কম কাজ করে। তবে ধীরে ধীরে সেটা আবার ঠিক হয়ে যায়। আর উচ্চ রক্তচাপের ব্যাপারটা এখনও গবেষণাধীন। তবে সেরকম কিছু নজরে পড়লে ডাক্তারকে জানানো উচিত।

প্রস্টেট ক্যান্সার নিয়েও দীর্ঘদিন সুস্থ্ জীবন কাটানো যায়

ডাঃ মোহন চন্দ্র শীল

দূরভাষ : ২৪৪-০০১৫

প্র : টি ইউ আর পদ্ধতিতে অপারেশন করলে নাকি পুরো প্রস্টেট বাদ দেওয়া হয় না? থেকে যাওয়া অংশ থেকে আবার সমস্যা হতে পারে?

উ: শুধু টি ইউ আর কেন পেট কেটে অপারেশন করলেও প্রস্টেট টিউমারই কেবল বাদ দেওয়া হয়। ক্যান্সার হলে অবশ্য কিছু ক্ষেত্রে পুরো প্রস্টেট বাদ যায়। সামান্য যে অংশটুকু থেকে যায় সেখান থেকে সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

প্র: প্রস্টেটে টিউমার হয়? তবে যে শুনেছি সংক্রামিত হওয়ার ফলে প্রস্টেট বড় হয়ে গিয়ে সমস্যা বাধায়?

উ: প্রস্টেট অপারেশন করতে হয় টিউমার হলেই। প্রস্টেটে সংক্রমণও হতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে ওষুধপত্র দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। সংক্রমণ এবং টিউমার দুইয়ের কারণেই প্রস্টেট আকারে বাড়তে পাবে। কিন্তু উপসর্গ দেখা না দিলে শুধু বড় হওয়া নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই।

প্র: কী কী উপসর্গ দেখা দিলে বুঝতে হবে অপারেশন দরকার?

উ: প্রস্টেটে সংক্রমণ হলে প্রস্রাব করতে খুব কষ্ট হবে। তলপেট এবং নীচে ব্যথা হবে খুব। অল্প অল্প জ্বর হবে মাঝেমাঝেই। টিউমার এবং ক্যান্সার দুইয়ের ক্ষেত্রেই ব্যথা যন্ত্রণা খুব একটা থাকে না। সবসময়ই মনে হয় প্রস্রাব সম্পূর্ণ হয়নি। পেট ভারি ভারী লাগে। রাত্রে বারবার উঠতে হয়। কখনও প্রস্রাবের সঙ্গে রক্তও আসতে পারে। এই হল উপসর্গ। এবার কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে এবং ডাক্তার দেখাতে হবে। তার ভিত্তিতে এবং ওষুধ কাজ না করলে তবে অপারেশনের প্রশ্ন।

প্র: কী কী পরীক্ষা করতে হয়?

উ: উপসর্গ দেখা দিলে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। তাঁর যদি মনে হয় প্রস্টেটের সমস্যা দেখা দিয়েছে, তল পেটের আলট্রাসনোগ্রাফি করতে বলবেন তিনি। সংক্রমণ হলে

ওষুধপত্র দিয়ে চিকিৎসা শুরু হবে। টিউমার হলে, এমনি টিউমার না ক্যান্সার সেটা জানার জন্য আরও কিছু পরীক্ষা করা দরকার হয়। যেমন রক্তের পি এস এ, অ্যাসিড ফসফাটেজ, লাম্বার স্পাইন এবং পেলভিক বোনের এক্সরে, রেডিও আইসোটোপ স্টাডি, এফ এন এ সি, পার অপারেটিভ ফ্রোজেন সেকশন বায়োপ্সি ইত্যাদি। এবার শুরু হবে চিকিৎসা।

প্র: ক্যান্সার বা টিউমার হলে চিকিৎসা কী?

উ: প্রথমে ওষুধপত্র দেওয়া হবে। অনেক সময় ওষুধেই কাজ হয়। যদি কাজ না হয় এবং প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত আসতে শুরু করে বা পেচ্ছাপ বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো হয়— অপারেশন করা হয়।

প্র: অপারেশন মানে টি ইউ আর?

উ: হ্যাঁ, প্রস্টেট টিউমার অপারেশনের জন্য টি ইউ আর বা ট্রান্স-ইউরেথ্রাল রিসেকশন খুব কার্যকর পদ্ধতি। এক্ষেত্রে ইউরেথ্রার মধ্যে দিয়ে ঢোকানো হয় আলো এবং ক্যামেরা লাগানো সরু টিউব, এন্ডোস্কোপ। আলোর দরকার শরীরের মধ্যেটা আলোকিত করার জন্য, ক্যামেরার মাধ্যমে শরীরের ভেতরের ছবি ফুটে উঠবে ভিডিও মনিটরে যা দেখে ডাক্তার অপারেশন করবেন। এন্ডোস্কোপের মধ্যে দিয়ে ঢোকানো হবে নারকোল কুড়ুনির মতো দেখতে অপারেশনের যন্ত্রপাতি। বিদ্যুতের সাহায্যে এই যন্ত্র একদম নারকোলের মতো করে প্রস্টেট গ্যান্ডের যতখানি দরকার কুরিয়ে নেবে। এবার সেই কোরানো অংশ বার করা হবে সাকশন করে।

প্র: প্রস্টেট তো সাধারণত বেশি বয়সের সমস্যা। এই বয়সে অনেকের হাঁপানি বা হার্টের অসুখ থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে অপারেশনের সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে না?

উ: সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। কারণ টি ইউ আরে পুরো অজ্ঞান করা হয় না। কোমর থেকে শরীরের নীচের অংশ অবশ করে এবং ঘুমের ইনজেকশন দিয়েই পুরো অপারেশন করা হয়।

প্র: রক্ত দরকার পড়ে না?

উ: অবস্থা খুব জটিল না হলে রক্ত প্রায় লাগেই না।

প্র: জটিল মানে কি বড় প্রস্টেট?

উ: না, অপারেশনের সময়ে বা পরে, কতখানি রক্তক্ষরণ হলো তার উপর জটিলতা নির্ভর করে।

প্র: এই অপারেশনে কত দিন হাসপাতাল বা নার্সিং হোমে থাকতে হয়?

উ: ৩ থেকে ৭ সাধারণত।

প্র: কতদিনে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে আবার কাজ কর্ম শুরু করা যাবে?

উ: ২ সপ্তাহ থেকে ৪ সপ্তাহের মধ্যে।

প্র: প্রস্টেট গ্ল্যাণ্ড তো পুরুষের যৌন ক্ষমতা রক্ষায় সাহায্য করে। অপারেশনের পর সে ব্যাপারে অসুবিধে হয় না?

উ: পুরো গ্ল্যাণ্ডটাতো বাদ দেওয়া হচ্ছে না যে অসুবিধে হবে। তবে একটা অসুবিধে হতে পারে, সিমেন বাইরে না বেরিয়ে ব্লাডারের মধ্যে ঢুকে যেতে পারে। একে ডাক্তারি

ভাষায় বলে রেট্রোগ্রেট ইজাকুলেশন। তবে তার সঙ্গে শারীরিক সক্ষমতার কোনও সম্পর্ক নেই।

প্র: কিন্তু সিমেন না এলে তো মানসিক সমস্যা দেখা দেবে। বা ব্লাডারে চলে যাওয়ার দরুণ কোনও শারীরিক অসুবিধে দেখা দেবে না?

উ: শারীরিক কষ্ট খুব তীব্র হলে তবেই প্রস্টেট অপারেশন করা হয়। সেই কষ্টের তুলনায় এই সামান্য অসুবিধে কোনও ব্যাপারই নয়। রোগীকে আগে থেকে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলা হয়। এবং রোগীর মানসিক প্রস্তুতি থাকে।
সিমেন ব্লাডারে যাওয়ার জন্য কোন শারীরিক ক্ষতি হয় না।

প্র: প্রস্টেট যখন বাড়তে শুরু করে তখন নাকি পুরুষের শারীরিক চাহিদা বেড়ে যায়?

উ: প্রস্টেট জন্ম থেকেই ছেলেদের শরীরে থাকে। বয়ঃসন্ধির সময় পূর্ণতা শুরু হয়। চলে ৭০-৮০ বছর বয়স পর্যন্ত কি তারও বেশি। বয়ঃসন্ধির সময় চাহিদা বাড়ার পেছনে এর ভূমিকা আছে। কিন্তু পরবর্তী কালে রোগের কারণে যখন এ বাড়তে থাকে, ৫০/৫৫ বছর বয়সে, ওই জাতীয় কোনও সমস্যা দেখা দেয় না।

প্র: প্রস্টেটে নাকি অনেক সময় পাথরও হয়?

উ: সাধারণত প্রস্টেটাইটিস থেকে পাথর হতে পারে। তার জন্য বিশেষ চিকিৎসার দরকার হয় না। অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করলেই হয়। তবে কিডনি, ইউরেটর বা ব্লাডার থেকে পাথর এসে এখানে আটকে প্রস্রাব বন্ধ করে দিতে পারে।

প্র: প্রস্টেট ক্যান্সার তো জীবন মরণ সমস্যা?

উ: না, প্রস্টেট ক্যান্সারের সমস্যা তেমন বেশি কিছু নয়। শুধুমাত্র ওষুধ পত্রের সাহায্যে দীর্ঘদিন সুস্থ জীবন যাপন করা যায়।

প্র: কিন্তু প্রস্টেট ক্যান্সারে যে অপারেশন দরকার হয় বললেন?

উ: কিছু ক্ষেত্রে অপারেশন লাগে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হর্মোন অ্যাবলেশন বা অর্কিডেকটমি অর্থাৎ দুটো টেস্টিস কেটে বাদ দেওয়া হয়। কখনও বা পুরো প্রস্টেট বাদ দেওয়ার দরকার পড়ে।

প্র: এর সাথে রেডিও থেরাপি বা কেমোথেরাপি দরকার পড়ে না?

উ: হ্যাঁ-কিছু ক্ষেত্রে রেডিও থেরাপি লাগে। কেমোথেরাপি লাগে না বললেই হয়।

প্র: টেস্টিস বাদ হয়ে যাওয়া মানে তো যৌন ক্ষমতা শেষ?

উ: তা বটে। তবে এই অপারেশন সাধারণত একটু বেশি বয়সের দিকেই দরকার হয়।

ডায়াবেটিসের রোগী লাল আটার রুটি খান

ডাঃ সুদীপ চ্যাটার্জি

দূরভাষ : ২৪০-১১৭০

ডায়ালিসিস করতে আসা রোগীদের শতকরা ৩০-৪০ জনেরই ডায়াবেটিস থাকে

অধ্যাপক (ডাঃ) জয়ন্ত বসু

দূরভাষ : ২২৩-২৫৭০

প্রঃ ডায়াবেটিসে আজকাল সব কিছু খাওয়া যায়?

উঃ না, কিছু বিধিনিষেধ আছে। তবে আগে যে রকম ধারণা ছিল মাটির নীচের সবজি, ভাত, ফল ইত্যাদি খাওয়া যায় না, সে ধারণা এখন বদলেছে। রিফাইনড্ কার্বোহাইড্রেট অর্থাৎ চিনি, গুড়, মিষ্টি মধু, জ্যাম জেলি ইত্যাদি বাদ দিয়ে বাকি সব কিছুই অল্পবিস্তর খাওয়া যেতে পারে। তবে ডায়াবেটিসে ওজন নিয়ন্ত্রণও কিন্তু খুব জরুরি। কাজেই খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে একটু সতর্ক থাকা দরকার।

প্রঃ কী ধরনের খাবার খেতে হবে?

উঃ সঠিক ভাবে মেপে খেতে পারলে এক বেলা ভাত একবেলা রুটি খাওয়া যায়। নয়তো ভাত রুটি মিশিয়ে। রুটি হবে লাল আটার। কারণ রক্তে সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে ফাইবার জাতীয় খাবারের ভূমিকা আছে। ময়দা রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেটের পর্যায়ে পড়ে। অতএ· খাওয়া চলবে না। সব ধরনের শাকসবজি মিলিয়ে মিশিয়ে খেতে হবে। সম্ভব হলে ে.সাসুদ্ধ। বেশি ফাইবার পাওয়া যাবে। ওল, কচু, আলু ইত্যাদি যথাসম্ভব কম খাওয়া দরকার।

.ডায়াবেটিস রোগীর রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ খুব জরুরি। কাজেই ডিমের কুসুম বা খাসির মাংসের বদলে যে কোনও মাছ, ডিমের সাদা অংশ এবং মুরগির মাংস খাওয়া ভাল। ঘি, মাখন, বনস্পতি যথাসম্ভব এড়িয়ে চলা দরকার। রোজ কিছু না

কিছু ফল অল্প পরিমাণে খেতে হবে। পেঁপে, মুসুম্বি, আম, কলা, পেয়ারা, আপেল, আতা, সবেদা ইত্যাদি খেতে পারেন।

প্র: বেশি মিষ্টি খেলে কি ডায়াবেটিস হয়?

উ: না, ডায়াবেটিস হয় শরীরে ইনসুলিনের ঘাটতি হলে। নানা কারণে তা হতে পারে। প্যানক্রিয়াস থেকে ইনসুলিন একেবারে না বেরোলে ইনসুলিন ডিপেনডেন্ট ডায়াবেটিস্ (IDDM) বা টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস হয়। মোট ডায়াবেটিব রোগীর এরা মাত্র ৫ থেকে ৭ শতাংশ।

ইনসুলিন প্রয়োজনের তুলনায় কম বেরোলে হয় নন ইনসুলিন ডিপেনডেন্ট ডায়াবেটিস (NIDDM) বা টাইপ টু ডাযাবেটিস। ৯০-৯৫ শতাংশ ডায়াবেটিস রোগীই এতে ভোগেন। সামান্য কিছু ক্ষেত্রে কোনও রোগেব কারণেও ডায়াবেটিস হতে পারে। তাকে বলে সেকেন্ডারি ডায়াবেটিস।

প্র: গর্ভাবস্থায়ও তো ডায়াবেটিস হয়?

উ: অনেক সময় আগে থেকে থাকে, ধরা পড়ে গর্ভাবস্থায় রক্ত পরীক্ষা করাতে এসে। কিছু ক্ষেত্রে সূত্রপাতই হয় গর্ভাবস্থায়। তাকে বলে জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস। সন্তান জন্মের পর জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস ঠিক হয়ে যায়।

প্র: উচ্ছে, করলা, নিমপাতা, মেথির গুঁড়ো নিয়মিত খেলে ডায়াবেটিস আয়ত্তে থাকে?

উ· ডায়াবেটিস প্রতিরোধের ক্ষমতা রাখে এমন প্রায় শ পাঁচেক প্রাকৃতিক উপাদান আছে। মেথি, নয়নতারা পাতা বা তেলকুচা পাতা তার মধ্যে অন্যতম। নয়নতারা পাতার উপর বেশ কিছু গবেষণা হযেছে। দেখা গেছে এর মধ্যে ক্যান্সার প্রতিরোধী কিছু রাসায়নিকও আছে। তাই ডায়াবেটিস প্রতিরোধের জন্য নয়নতারা পাতা খাওয়ার কথা বলা হয়ত নিরাপদ নয়। মেথিতে ক্ষতি তেমন কিছু নেই। উচ্ছে, করলা বা নিমপাতা তো খাওয়া যেতেই পারে। তবে এর ফলে ডায়াবেটিস কতটা কমবে বা আদৌ কমবে কিনা সেটা সঠিকভাবে বলা যাবে না।

প্র: স্যাকারিন থেকে নাকি ক্যান্সার হয়?

উ: না, স্যাকারিন থেকে ক্যান্সার হয় না। ডায়াবেটিস রোগী দিনে বার তিনেক স্যাকারিন দেওয়া চা খেতে পারেন।

প্র: ভোরবেলা বাসি জল খেলে বা সবুজ ঘাসে হাঁটলে ডায়াবেটিসের কিছু উপকার হয়?

উ: না।

প্র: কিন্তু ডায়াবেটিস রোগীদের তো নিয়ম করে হাঁটতে বলা হয়?

উ: শুধু হাঁটা নয়। সাঁতার কাটা, সাইকেল চালানো, জগিং, ফ্রি হ্যান্ড এক্সার সাইজ বা কিছু আসন নিয়মিত করা দরকার।

প্র: মোটা মানুষদেব কি ডায়াবেটিস বেশি হয়?

উ: হ্যাঁ, তবে ওজন কমিয়ে ফেললে, দ্রুত ফল পাওয়া যায়।

প্র: ডায়াবেটিস কি বংশগত রোগ?

উ: নন-ইনসুলিন ডিপেনডেন্ট ডায়াবেটিস রোগীদের শতকরা ৫০ জনের পারিবারিক ইতিহাস থাকে।

প্র: বাকিদের?

উ: অতিরিক্ত ওজন, বেশি খাওয়া বিশেষ করে ঝাল তেল মশলা দেওয়া খাবার এবং ফাস্টফুড, ধূমপান, নিয়মিত ব্যায়াম না করা ইত্যাদি এক বা একাধিক কারণের ফলে ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।

প্র: ডায়াবেটিস হলে খাওয়ার ইচ্ছে বেড়ে যায়?

উ: যাঁরা খেতে ভালবাসেন তাঁদের যেমন ডায়াবেটিস বেশি হয়, বারবার খিদে পাওয়াও এর অন্যতম উপসর্গ।

প্র: অন্যান্য উপসর্গ কী?

উ: বারবার তেষ্টা পাওয়া এবং প্রস্রাবের বেগ আসা, দুর্বলতা, মাথা ঘোরা, ওজন কমে যাওয়া, ঘা হলে বা কেটে গেলে চট করে না শুকোনো, চুলকুনি, হাতপায়ের পেশির দুর্বলতা, চোখে কমদেখা, সহবাসে অনীহা ইত্যাদি। কখনও আবার কোনও উপসর্গই থাকে না।

প্র: উপসর্গ না থাকলে রোগ বোঝা যাবে কী ভাবে?

উ: রক্ত পরীক্ষা করে। বাবা মা বা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের কারোর ডায়াবেটিস থাকলে অল্পবয়স থেকেই ওজন নিযন্ত্রণ এবং নিয়মিত ব্যায়াম করে যেতে হবে। এবং বয়স ৪০এর কাছাকাছি এলে বছরে অন্তত একবার রক্তপরীক্ষা করতে হবে।

প্র: রক্তপরীক্ষার রিপোর্ট একেক জায়গায় একেক রকম হয় কেন?

উ: রিপোর্টের সামান্য হেরফের নানা কারণে হতে পারে। একই ল্যাবরেটরিতে পরপর কয়েকদিন টেস্ট করালে ফাস্টিং ব্লাড সুগারে শতকরা ১০ ভাগ তারতম্য হতে পারে। পিপি ব্লাড সুগার অর্থাৎ পেট ভরে খাওয়ার ২ঘন্টা পরে যে রক্ত পরীক্ষা হয়, সেখানে শতকরা ২৫-৩০ ভাগ তারতম্য থাকতে পারে। এ নিয়ে অত ভাবনা চিন্তা করার কিছু নেই।

প্র: ডায়াবেটিস আয়ত্তে না থাকলে শরীরের সর্বত্র তার প্রভাব পড়ে?

উ: হার্ট, কিডনি, চোখ, নার্ভ, চামড়া—অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসের প্রভাব পড়ে সর্বত্র। শতকরা ৮০-৮৫ ভাগ ডায়াবেটিস রোগীর মৃত্যু হয় হার্ট অ্যাটাক অথবা স্ট্রোকের দরুন। বাকি ১৫-২০ শতাংশ আক্রান্ত হন কিডনির অসুখে। কারোব ক্ষেত্রে একসঙ্গে একাধিক প্রত্যঙ্গ আক্রান্ত হয়।

প্র: এই পরিণতি ঠেকিয়ে রাখা যায় না?

উ: নিয়ম কানুন মেনে চললে অবশ্যই যায়। তবে অনেক সময়ই তা হয় না। কিছু নিয়মকানুন মেনে এবং ওষুধপত্র খেয়ে যে মুহূর্তে সুগার স্বাভাবিক মাত্রায় নেমে আসে অনেকেই তখন চিকিৎসা বন্ধ করে মেথি ভেজানো জল, নিমপাতার রস, বা উচ্ছে সেদ্ধ র উপর নির্ভর করতে শুরু করেন। একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি হতে থাকে বার বার। ফলে তার স্থায়ী প্রভাব পড়ে শরীরে।

প্র: অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসে সাইলেন্ট হার্ট অ্যাটাক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে?

উ: ডায়াবেটিসে কিছু ক্ষেত্রে শরীরের বিভিন্ন স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষতি হৃৎপিন্ডের স্নায়ুতে হলে তলে তলে ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজ কিছুটা এগিয়ে গেলেও ব্যথা কম হওয়া বা

না হওয়ার দরুন অনেক সময় তা ধরা পড়ে না। ফলে ব্যথা বেদনা ছাড়াও হার্ট অ্যাটাক হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

প্রঃ কিডনি বাঁচানোর জন্য ডায়াবেটিক রোগীর কিছু বিশেষ সাবধানতা মেনে চলতে হবে?

উ: হ্যাঁ, বেশ কিছু সাবধানতা মেনে চলতে হবে। যেমন-

(১) ডায়াবেটিসের সঙ্গে উচ্চরক্তচাপ থাকলে খুব দ্রুত কিডনি খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা। অতএব রক্তের সুগারের মাত্রা যেমন বাড়তে দেওয়া যাবে না, রক্তচাপও তেমনি বাড়তে না দেওয়া উচিত।

(২) কিডনি আক্রান্ত হওয়ার সামান্যতম সম্ভাবনা বোঝা গেলে খাবারে প্রোটিনের পরিমাণ কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। প্রতি কেজি ওজনের জন্য ১-০.৫গ্রাম প্রোটিনই যথেষ্ট।

(৩) শরীরে কোনওরকম সংক্রমণ হলে দ্রুত তা সারিয়ে ফেলার ব্যবস্থা কবতে হবে।

(৪) ব্যথার ওষুধ এবং অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার আগে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে নেওয়া উচিত। কারণ বেশ কিছু ওষুধ আছে যা খেলে কিডনিতে একটু বেশি চাপ পড়ে।

(৫) কিছু এক্সরে এবং সিটিস্ক্যানে কৃত্রিম রঞ্জক ইনজেকশন দিতে হয়। এসব করাবার আগে কিডনির কার্যকারিতা দেখে নেওয়া দরকার।

প্রঃ ডায়াবেটিস থেকে তো চোখও খারাপ হয়?

উ: ১০ বছরের ওপর যাঁরা ডায়াবেটিসে ভুগছেন তাদের শতকরা ৫০ জনেরই ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। রেটিনার কিছু রক্তবাহী নালি নষ্ট হয়ে গিয়ে ইস্কিমিক মনোনিউরোপ্যাথিরও সূত্রপাত হতে পারে। দুটি ক্ষেত্রেই দৃষ্টিশক্তির ঘাটতি দেখা দেওয়া সম্ভব। অতএব ডায়াবেটিসের রোগীকে নিয়মিত চোখের ডাক্তাবের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতে হবে।

হাইপোথাইরয়েডিজম থেকে অবসাদ দেখা দিতে পারে

ডাঃ মণি ছেত্রী

দূরভাষ : ৪৪০-৯৮৪৭

প্র: কী করে বোঝা যাবে থাইরয়েডের সমস্যা দেখা দিয়েছে?

উ: থাইরয়েডের সমস্যা দু' ধরনের। হাইপোথাইরয়েডিজমে অর্থাৎ যেখানে থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড প্রয়োজনের তুলনায় কম কাজ করে, ওজন বাড়া, ক্লান্তি, পিরিয়ডের গণ্ডগোল, কোষ্ঠকাঠিন্য, চুলপড়া, চামড়ায় রুক্ষতা ইত্যাদি নানান উপসর্গ দেখা দিতে পারে। থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড বেশি কাজ করলে অর্থাৎ হাইপারথাইরয়েডিজমের ক্ষেত্রে উপসর্গ অন্যরকম। হাত পা-কাঁপা, বুক ধরফর করা, বারবার খিদে পাওয়া অথচ ওজন কমতে থাকা, ঘাম হওয়া, চোখ ঠেলে খানিকটা বাইরে বেরিয়ে আসা ইত্যাদি।

প্র: অনেকের যে গলার কাছটা ফুলে যায়?

উ: থাইরয়েডের সমস্যা থাকলে গলগণ্ড বা গয়টাব থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে গলার কাছটা ফোলা থাকবে। তবে গয়টার আছে মানেই থাইরয়েডের সমস্যা আছে সব সময় এরকম নাও হতে পারে।

প্র: থাইরয়েডের চিকিৎসা মানে তো সারাজীবন ওষুধ খেয়ে যাওয়া?

উ: সবসময় নয়। হাইপোথাইরয়েডিজমের ক্ষেত্রে অনেক সময় সারাজীবন ওষুধ খেতে হয়। অটোইমিউন থাইরয়েডিটিস রোগে হাইপো হাইপার দু'রকম সমস্যাই দেখা দিতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে চিকিৎসার সেরকম প্রয়োজন হয় না।

প্র: এই সমস্ত ওষুধের কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই?

উ: হাইপোথাইরয়েডিজমের চিকিৎসায় সাধারণত এলট্রক্সিন ব্যবহার করা হয়। এলট্রক্সিন ব্যবহারে কারোর ক্ষেত্রে হাত কাঁপা, বুক ধরফর ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিতে পারে। হার্টের অসুখ থাকলে এলট্রক্সিন শুরু করার আগে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে নেওয়া দরকার।

প্র: ওষুধ হঠাৎ বন্ধ করলে কি ক্ষতি হতে পারে?

উ: ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ বন্ধ করলে উপসর্গগুলি মারাত্মকভাবে ফিরে আসতে পারে।

প্র: হাইপারথাইরয়েডিজ্‌মের চিকিৎসাও কি একই রকম?

উ: দু'তিনরকম চিকিৎসা পদ্ধতি চালু আছে। ওষুধ পত্রের সাহায্যে, রেডিওঅ্যাকটিভ আয়োডিন দিয়ে, বেশি বাড়াবাড়ি হলে অনেক সময় অপারেশনও করতে হতে পারে।

প্র: অপারেশনে কোনও ক্ষতি হয় না?

উ: সাধারণ অবস্থায় তো অপারেশন করা হয় না। থাইরয়েড গ্ল্যান্ড খুব বড় হয়ে গেলে বা ক্যান্সার হলে তবেই অপারেশন করা হয়। থাইরয়েড অপারেশন হলে সারাজীবন এলট্রক্সিন খেয়ে যেতে হয়। অন্যান্য ওষুধও দেওয়া হয় অনেক সময়। এবং নিয়মিত ওষুধ পত্র খেলে কোনও অসুবিধে হয় না।

প্র: অপারেশনের পর বিশেষ কোনও নিয়ম কানুন মেনে চলতে হয়?

উ: ওষুধপত্র নিয়মিত খাওয়া জরুরি। এছাড়া আর কোনও বিধি নিষেধ নেই।

প্র: থাইরয়েডের চিকিৎসা চললে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়?

উ: হাইপারথাইরয়েডিজমে ব্যবহৃত কিছু ওষুধপত্র খেলে রক্তের শ্বেতকণিকার পরিমাণ কমে যেতে পারে। তবে সঠিক নজরদারির সাহায্যে ব্যাপারটা অনেকটাই সামাল দেওয়া যায়।

প্র: থাইরয়েডের চিকিৎসা চলাকালীন অনেক সময় গলাব্যথা হয়। সেটা কি গলগণ্ড রোগের জন্য?

উ: হাইপারথাইরয়েডিজমের চিকিৎসা চলাকালীন কিছু ক্ষেত্রে এরকম হতে পারে। গলাব্যথার সঙ্গে সামান্য জ্বরও থাকতে পারে। এ সাধারণ জীবাণু সংক্রমণ। এর সঙ্গে গলগণ্ডর কোনও সম্পর্ক নেই।

প্র: থাইরয়েডের অসুখ সেরে গেলে লিউকিমিয়া হয়?

উ: না। অনেক সময় হাইপারথাইরয়েডিজমের চিকিৎসায় রেডিও অ্যাকটিভ আয়োডিন ব্যবহৃত হয়। দীর্ঘদিন চিকিৎসা চললে বোনম্যারোর কিছু ক্ষতি হতে পারে। যথাযথ চিকিৎসা হলে সব ঠিক হয়ে যায়।

প্র: থাইবয়েডের সমস্যা থাকলে পেটের অসুখ বেশি হয়?

উ. হ্যাঁ, হতে পারে।

প্র: সহবাসে অনীহা?

উ: তাও থাকা সম্ভব।

প্র: থাইরয়েডের অসুখ মহিলাদের বেশি হয়?

উ: পুরুষের তুলনায় মহিলাদের এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় ৭-৮ গুন বেশি।

প্র: থাইরয়েডের অসুখের সঙ্গে মানসিক অবসাদের কোনও সম্পর্ক আছে?

উ: হাইপোথাইরয়েডিজম থাকলে অবসাদ থাকতে পারে। তবে চিকিৎসা চলাকালীন রক্তে থাইরয়েড হর্মোনের মাত্রা সঠিক জায়গায় পৌঁছে গেলে অবসাদ ঠিক হয়ে যাওয়ার কথা।

প্রঃ তার মানে কিছু ক্ষেত্রে ঠিক নাও হতে পারে?

উঃ অনেক সময় অবসাদের পেছনে অনেক কারণ মিলেমিশে থাকে। হয়ত থাইরয়েড হর্মোনের কমতির সঙ্গে অন্য কোনও মানসিক বা শারীরিক কারণ রয়েছে। সেক্ষেত্রে থাইরয়েডের চিকিৎসা হলেও অবসাদ পুরোপুরি যাবে না।

প্রঃ বারবার গর্ভপাত এবং গর্ভসঞ্চার না হওয়ার পেছনেও তো রোগটির হাত আছে?

উঃ থাইরয়েড কম কাজ করলে গর্ভসঞ্চার হতে অসুবিধে হতে পারে। আর বেশি কাজ করলে গর্ভপাতের সম্ভাবনা থাকে। তবে চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে এ সমস্ত সমস্যা মিটে যায়।

প্রঃ আয়োডিন যুক্ত লবণ খেলে কি হাইপোথাইরয়েডিজমের সম্ভাবনা ঠেকানো যায়?

উঃ হ্যাঁ।

প্রঃ আর হাইপারথাইরয়েডিজম?

উঃ প্রতিরোধের কোনও পথ জানা নেই।

রক্তাল্পতার কারণ খুঁজে বার করা খুব জরুরি

অধ্যাপক (ডাঃ) দিলীপ ভট্টাচার্য

দূরভাষ : ২৪৪-৩১০২

প্র : কী করে বুঝব রক্তাল্পতা হয়েছে?

উ : খুব ধীরে ধীরে রক্তাল্পতা বাড়লে শরীর আস্তে আস্তে মানিয়ে নিতে শুরু শুরু করে। সে ক্ষেত্রে সামান্য বুক ধড়ফড় ও নিঃশ্বাসের কষ্ট ছাড়া আর তেমন কিছু বোঝা যায় না। সাধারণ ভাবে রক্তাল্পতাব উপসর্গ বলতে নিঃশ্বাসের কষ্ট, রং ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া, দুর্বলতা, পা ফোলা এবং বুক ধড়ফড় করা।

প্র : হিমোগ্লোবিন কত হলে বুঝব রক্তাল্পতা হয়েছে?

উ : ছেলেদের ক্ষেত্রে ১২ এবং মেয়েদের বেলায় ১১-র নীচে হলে রক্তাল্পতা ধরা হয়। তবে অনেকে আছেন ৯-১০ গ্রাম হিমোগ্লোবিন নিয়েও দিব্যি উপসর্গহীন জীবনযাপন করেন।

প্র : মহিলারা কি রক্তাল্পতায় বেশি ভোগেন?

উ : হ্যাঁ।

প্র : কেন?

উ : মেয়েদের ঋতুস্রাব এবং সন্তান প্রসবের সময় প্রচুর বক্ত শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। ঠিকভাবে তা পূরণ না হলে রক্তাল্পতা হতে পারে। আমাদের দেশের মেয়েদের রক্তাল্পতার আরেকটি বড় কারণ অপুষ্টি। এছাড়া অন্যান্য কারণ তো আছেই।

প্র : যেমন?

উ : রক্তাল্পতার মূল কারণ তিনটি।

(১) শরীর থেকে রক্ত বেরিয়ে যাওয়া

(২) শরীরে কম রক্ত তৈরি হওয়া

(৩) রক্ত তৈরি হলেও, দ্রুত তা খরচ হয়ে যাওয়া

মেয়েদের ক্ষেত্রে পিরিয়ড এবং সন্তান জন্মের সময় প্রথমটা আকছার ঘটে। ছেলেদের

বেলায় প্রথম কারণটির জন্য রক্তাল্পতা হলে খুব দ্রুত রক্তপাতের উৎস খুঁজে বার করা দরকার। কারণ ডিওডেনাম আলসার বা ক্যান্সার, গ্যাসট্রাইটিস, আলসারেটিভ কোলাইটিস ইত্যাদি রোগ দেরি হলে গুরুতর হয়ে উঠতে পারে। বাচ্চাদের বেলায় কৃমির জন্যও অনেক সময় আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া দেখা দেয়।

শরীরে রক্ত কম তৈরি হয় যদি বোনম্যারো ঠিকভাবে কাজ না করে বা ভিটামিন বি-১২ ও ফলিক অ্যাসিডের অভাব হয় শরীরে।

রক্তাল্পতার তৃতীয় কারণটি দেখা দেয় জেনেটিক কিছু অসুখে।

এই তিনটি কারণের জন্য প্রাইমারি রক্তাল্পতা হয়। কখনও অন্য কোনও রোগের পূর্বাভাস হিসেবেও রক্তাল্পতা দেখা দিতে পারে। যেমন, রেনাল ফেইলিওর, ক্যানসার, টিবি, এইডস ইত্যাদি।

প্র : যে কোনও বয়সেই কি রক্তাল্পতা হতে পারে?

উ : হ্যাঁ।

প্র : বাচ্চার রক্তাল্পতা হয়েছে কীভাবে বোঝা যাবে?

উ : বাচ্চা অল্পেই ক্লান্ত হয়ে পড়বে। পড়াশোনা, খেলাধুলা কোনও কিছুতেই উৎসাহ থাকবে না। অল্প অল্প জ্বর হবে। ওজন বাড়বে না। রক্তাল্পতা খুব বেড়ে গেলে হৃদযন্ত্রের গতিও বেড়ে যেতে পারে।

প্র : বাচ্চার রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কত হলে বুঝব রক্তাল্পতা হয়েছে?

উ : ১ থেকে ৬ মাসের শিশুর রক্তে হিমোগ্লোবিন ৯ গ্রামের কম হলে বুঝতে হবে তার রক্তাল্পতা হয়েছে। ৬ মাস থেকে ৪ বছরে ১১ গ্রামের নীচে হলে।

প্র : কেন হয় এরকম?

উ : বাচ্চার খাবারে আয়রণ, ফলিক অ্যাসিড বা ভিটামিন বি-১২-র ঘাটতি হলে রক্তাল্পতা হতে পারে। এছাড়া কোনও অসুখের ফলে নিয়মিত অল্প মাত্রায় রক্তক্ষরণ হলেও রক্তাল্পতা দেখা দেয়।

প্র : কীভাবে এর সমাধান হবে?

উ : বাচ্চার মধ্যে ক্লান্তি, উৎসাহের অভাব দেখলে শিশুরোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। যদি কোনও রোগের কারণে রক্তাল্পতা হয়, তার চিকিৎসা হলেই রক্তাল্পতা সেরে যাবে। এর সঙ্গে প্রচুর আয়রন আছে এমন খাবার দাবার খাওয়াতে হবে বাচ্চাকে। যেমন , ১-৬ মাসের বাচ্চার ক্ষেত্রে গরুর দুধ বা কৌটোর দুধের চেয়ে মায়ের দুধে উপকার হবে বেশি। বড় বাচ্চার ক্ষেত্রে রোজকার খাদ্যতালিকায় ডিম, পাঁঠার মাংস, মেটে, কিডনি, সবুজ পাতাবহুল তরিতরকারি, ছোলা শাক, পালং শাক ইত্যাদির কিছু না কিছু থাকা উচিত। ফলিক অ্যাসিডযুক্ত খাবার ও ফলিক অ্যাসিড খাওয়ানোরও প্রয়োজন হতে পারে। ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে নেবেন।

প্র : গর্ভাবস্থায় রক্তাল্পতা হলে কী করতে হবে?

উ : গর্ভাবস্থায় অন্য কোনও জটিলতা ছাড়াই মায়ের রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। সমস্যা এড়াতে ডাক্তারের পরামর্শ মেনে চলতে হবে।

প্রথম হল খাওয়া দাওয়া। সুষম, পুষ্টিকর, আয়রন সমৃদ্ধ খাবার পরিমাণ মতো খেতে হবে। অনেকের এ সময় বমি বমি ভাব থাকে বা বমি হতে থাকে। দরকার হলে বমি কমানোর ওষুধ খেতে হবে। কিন্তু দিনে ৪-৫ বার খাওয়া বন্ধ করা চলবে না। সকালের খাবারে অন্য জিনিসের সঙ্গে দুধ এবং ডিম যেন থাকে। ১০টার দিকে টাটকা ফল দুপুরে ডাল, ভাত, সবজির মধ্যে পালংশাক, কাঁচকলা, থোড়, ডুমুর, বিনস, গাজর ইত্যাদি, মি'ড স্যালাড, মাছের ঝোল বা মেটের তরকারি অথবা মুরগি বা খাসির মাংস, বিকেলে অঙ্কুরিত ছোলা, মুগ বা ছানা। রাত্রে আবার দুপুরের মতো খাবার খেতে হবে।

খাওয়া দাওয়ার সঙ্গে কিছু ওষুধপত্র খাওয়াও জরুবি। আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া ঠেকাতে এসময় দিনে ১০০ মিলিগ্রাম ফেবাস সালফেট ট্যাবলেট খেতে হবে।

প্র : আয়রন ট্যাবলেট খেলে তো কোষ্ঠবদ্ধতা হয়?

উ : হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ইসবগুলের ভুষি অথবা মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়া খেতে হতে পারে।

প্র : কিন্তু বেশ কিছু খাবার তো আছে যা খেলে শবীরে আয়বন পায়। আয়রন ট্যাবলেট খেতে হবে কেন?

উ : গর্ভাবস্থায় আয়রনের প্রয়োজন দিনে ২ মিলিগ্রাম থেকে বেড়ে ৪ মিলিগ্রাম হয়। শেষের দিকে এটা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৬ মিলিগ্রামে। খাবার থেকে পুরোমাত্রায় শোষণ করার পবেও তাই ঘাটতি দেখা দিতে পারে। ওষুধ খেতে হয় সে জন্যই।

প্র : ফলিক অ্যাসিডের অভাব থেকেও কি গর্ভাবস্থায় রক্তাল্পতা হতে পারে?

উ : আয়রনের মতো এর চাহিদাও প্রায় ৬ গুণ বেড়ে যায় গর্ভাবস্থায়। নানা কারণে এর ঘাটতি দেখা দিতে পারে শরীরে—

(১) খাদ্যে যদি এর অভাব থাকে

(২) গর্ভাবস্থায় যদি মা ডায়েবিয়ায় আক্রান্ত হন

(৩) শরীরে কোনও রোগ সংক্রমণ হলে

(৪) যমজ সন্তান পেটে থাকলে

(৫) ফেনিটয়েন জাতীয় কোনও ওষুধ খেলে

প্র : কুলেখাড়া পাতার রস বা থোড়ের রস খেলে নাকি রক্তাল্পতায় উপকার হয়?

উ : জানা নেই।

প্র : গেঁড়িগুগলি খেলেও শুনেছি রক্তাল্পতা ভাল হয়ে যায়?

উ : গেঁড়িগুগলিতে যথেষ্ট পরিমাণে প্রোটিন ভিটামিন রয়েছে। যাদের মাছ, মাংস, ডিম, দুধ খাবার সামর্থ নেই তাঁরা কম খরচে এ থেকে প্রায় সমান উপকার পাবেন।

প্র : তার মানে মাছ মাংস ডিম দুধ খেলেই সবথেকে উপকার হবে?

উ : ব্যাপারটা সে রকম নয়। খাদ্যতালিকায় প্রোটিন ভিটামিন যুক্ত সুষম খাবার থাকা উচিত। মাছ, মাংস, ডিম, ছানা, দুধ যেমন খেতে হবে তেমনই মোচা, থোড়, অঙ্কুরিত ছোলা, পালং, কলমি শাক, টাটকা ফল, ডাল ইত্যাদি খেলেও উপকার হবে।

প্র : দীর্ঘদিন আয়রন ট্যাবলেট খেয়ে গেলে কোনও ক্ষতি আছে কি?

উ : শরীরের প্রয়োজন থাকলে ক্ষতি নেই। তবে অনেকে আছেন ক্লান্ত লাগলে বা মাথা ঘুরলে আয়রন খাওয়া শুরু করেন। এটা অনুচিত। কারণ রক্তাল্পতা যদি হয়েও থাকে, কী কারণে হয়েছে সেটা জানা খুব জরুরি। তা না হলে রোগ চাপা পড়ে বিপদ বাধতে পারে। তবে আমাদের দেশে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়াই বেশি হয়। তার চিকিৎসা ভিটামিন, আয়রন বা ফলিক অ্যাসিড এবং সুষম খাদ্য।

জেনেটিক কাউন্সেলিং করে থ্যালাসেমিয়া নির্মূল করা যায়

অধ্যাপক (ডাঃ) প্রশান্ত কুমার সরকার

দূরভাষ : ২৪৬-৭১৩০

প্র: থ্যালাসেমিয়া রোগীকে তো মাঝে মধ্যেই রক্ত দিতে হয়?

উ: হ্যাঁ, কখনও প্রতি মাসে, কখনও বা সপ্তাহে। খুব খারাপ অবস্থায় পৌঁছলে বছরে ৪০- ৫০টাও দিতে হতে পারে। তবে আজকাল আমরা ব্যাপারটাকে কমিয়ে আনার চেষ্টা করছি।

প্র: রক্ত দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে কীভাবে বোঝা যাবে?

উ: বাচ্চা নিস্তেজ হয়ে পড়বে, খিদে কমে যাবে, পড়াশোনা বা কাজে উৎসাহ থাকবে না, ফ্যাকাশে হয়ে যাবে শরীর।

প্র: এ তো সবই সাধারণ রক্তাল্পতার উপসর্গ। থ্যালাসেমিয়া এবং রক্তাল্পতা আলাদা করা যাবে কীভাবে?

উ: থ্যালাসেমিয়াও রক্তাল্পতাই। অর্থাৎ রক্তে প্রয়োজনীয় হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কমে যাওয়া। তবে তার ধরনধারণ কিছুটা আলাদা। বিশেষ রক্ত পরীক্ষা করে রক্তাল্পতার কারণ থ্যালাসেমিয়া কিনা সেটা বুঝতে পারা যায়।

প্র: শুরুতে এ রোগের কী উপসর্গ থাকে?

উ: বাচ্চা জন্মায় এই রোগ নিয়ে। কিন্তু মোটামুটি ৬মাসের আগে রোগ বিশেষ বুঝতে পারা যায় না। বাচ্চার রঙ ধীরে ধীরে ফ্যাকাশে হতে থাকে এবং দেখে খুব সুস্থ স্বাভাবিক মনে হয় না। সর্দি, কাশি, জ্বর লেগে থাকে। সাধারণ রক্ত পরীক্ষায় রক্তাল্পতা ধরা পড়ে। কিন্তু এ সময় প্রচলিত আয়রন দিয়ে চিকিৎসা করার আগে থ্যালাসেমিয়ার কথা ভেবে নেওয়া দরকার এবং সেই অনুযায়ী বিশেষ রক্ত পরীক্ষা করে তবে চিকিৎসা শুরু করা উচিত।

প্র: কেন?

উ: অত ছোট বয়সে বিনা কারণে রক্তাল্পতা হলে সাধারণ ভাবে তা থ্যালাসেমিয়ার কারণেই হয়। তবে আমাদের দেশে অপুষ্টি জনিত রক্তাল্পতাও একদম হতে পারে না তা নয়।

প্র: সে ক্ষেত্রে প্রথমে সাধারণ রক্তাল্পতার কথা না ভেবে থ্যালাসেমিয়ার কথা ভাবা হবে কেন?

উ: তার কারণ দুটো। প্রথমত আমাদের দেশে মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ১০ জন থ্যালাসেমিয়ার বাহক অথবা রোগী। এবং দ্বিতীয় কারণ সাধারণ রক্তাল্পতা ভেবে আয়রন দিয়ে চিকিৎসা করলে রোগীর জীবন সংশয় হতে পারে।

প্র: থ্যালাসেমিয়া রোগীদের আয়রন দেওয়া কি একেবারেই নিষেধ?

উ: একদম।

প্র: এর চিকিৎসা তাহলে কি কেবল রক্ত দেওয়া?

উ: থ্যালাসেমিয়া রোগীর শরীরে হিমোগ্লোবিন খুব দ্রুত ভাঙতে থাকে। রক্তের ঘাটতি পূরণ কবার জন্য তাই মাঝে মধ্যে রক্ত দিতে হয়।

প্র: সেই সব রক্তও তো শরীরে ভেঙে গিযে আয়রন তৈরি করবে?

উ: হ্যাঁ, সেইজন্য মাঝে মধ্যে শরীরে জমা হওয়া আয়রন বার করবার জন্য ওষুধপত্র দিতে হয়।

প্র: এই সমস্ত ওষুধের দাম তো খুবই বেশি?

উ: হ্যাঁ, এক একটি কোর্সের খরচ প্রায় ৪ হাজার টাকার মতো।

প্র: বছরে ক'টা এরকম কোর্স দরকার হতে পারে?

উ: সেটা নির্ভর করবে কত বোতল রক্ত শরীরে যাচ্ছে তার উপর। থ্যালাসেমিয়া মেজর রোগীদের ক্ষেত্রে বছরে ৪টেও লাগতে পারে।

প্র: থ্যালাসেমিয়া মেজর মানে?

উ: থ্যালাসেমিয়া তিন রকমের হয়। প্রথম থ্যালাসেমিয়া মেজর বা বিটা থ্যালাসেমিয়া। ই বিটা থ্যালাসেমিয়া মাঝারি এবং মাইনর দু' হিসেবেই থাকতে পারে। থ্যালাসেমিয়া মাইনরের অনেক সময় সেরকম চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। এদের রক্তে হিমোগ্লোবিন মোটামুটি ৮-৯ গ্রাম মতো থাকে। এবং পিলে সামান্য বড় হয়। থ্যালাসেমিয়া মেজর হলে রক্তাল্পতা মাঝে মধ্যেই খুব বেড়ে যায়। ঘন ঘন রক্ত দিতে হয়। পিলে এবং লিভার বেশ বড় হয়ে যায়। ই-বিটা থ্যালাসেমিয়া মাঝারি হিসেবে থাকলে সঠিক চিকিৎসার সাহায্যে প্রায় ৫০-৬০ বছর বয়স পর্যন্ত স্বাভাবিক কর্মক্ষম জীবন দেওয়া যায়।

প্র: থ্যালাসেমিয়া থাকার ফলে কি শরীরে আরও অন্যান্য অসুস্থতা দেখা দিতে পারে?

উ: সময়ে যথাযথ চিকিৎসা না করালে শরীরের মূল প্রত্যঙ্গগুলির অনেকগুলিই অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। এই ব্যাপারটা একটু খুলে বলা দরকার।

আমাদের শরীরে রক্ত তৈরি করে বোন ম্যারো বা অস্থিমজ্জা, এবং স্বাভাবিক

হিমোগ্লোবিনকে ১০০-১২০ দিন বাদে বাদে ভাঙার কাজ করে পিলে, লিভার এবং বাকি অঙ্গ প্রতঙ্গে। এর মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ কাজ করার কথা পিলে, লিভার শতকরা ৮ ভাগ, এবং বাকী ২ শতাংশ সমস্ত শরীর মিলে। থ্যালাসেমিয়ার ক্ষেত্রে বোনম্যারো অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন তৈরি করে । এবং অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিনের হদিশ পাওয়ামাত্র পিলে এবং লিভার সক্রিয় হয়ে ওঠে তাকে ভাঙতে। থ্যালাসেমিয়ায় এক একটি হিমোগ্লোবিনের গড় আয়ু ৩০-৬০ দিন। কাজেই পিলে এবং লিভারের উপর অতিরিক্ত কাজের বোঝা চাপে। আয়তনে বেড়ে গিয়ে তারা সামলায় পুরো ব্যাপারটা। বেশি হিমোগ্লোবিন ভাঙা মানে শরীরে বেশি আয়রন জমতে শুরু করা। আয়রন দ্বারা আক্রান্ত হয় হার্ট এবং প্যানক্রিয়াস। ফলে ডায়াবেটিস, জন্ডিস, গলব্লাডারে পাথর, ফুসফুসে জল জমা থেকে হার্ট ফেইলিওর পর্যন্ত সবই হতে পারে।

প্র: পিলে এবং লিভার কি কেবল অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিনকেই ভাঙে?

উ: অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন ভাঙতে ভাঙতে পিলে এবং লিভারের মধ্যে যখন অতি সক্রিয়তা এসে যায় তখন স্বাভাবিক হিমোগ্লোবিনকেও একটু বেশি দ্রুততায় ভাঙতে থাকে এরা। এই ব্যপারটা বেশি হয় থ্যালাসেমিয়া মেজর রোগীদের বেলায়। ই বিটায় আক্রান্তদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন ভাঙার হার তুলনামূলক ভাবে কম। সে জন্য আমরা সবসময় চেষ্টা করি শরীরের অধিকাংশ রক্তই যাতে স্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন দিয়ে তৈরি থাকে।

প্র: কীভাবে এটা করা সম্ভব?

উ: রোগ ধরা পড়া মাত্র রোগী এসে উপস্থিত হলে, প্রথমদিকে শুধুমাত্র রক্ত দিয়েই আমরা অভ্যন্তরীণ প্রত্যঙ্গ গুলিকে আক্রান্ত হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে পারি। হিমোগ্লোবিন ১০এর কাছাকাছি নেমে এলেই ২-৪বোতল রক্ত দিয়ে ১২ থেকে ১৪ গ্রামের কাছাকাছি তুলে দেওয়া হয়। শরীরে স্বাভাবিক রক্ত প্রচুর থাকলে অস্বাভাবিক রক্ত কম তৈরি হয়। ফলে পিলে এবং লিভারের অস্বাভাবিক কার্যকারিতা বাড়ানোর তেমন প্রয়োজন পড়ে না। রক্ত কম তৈরি হলে অন্যান্য প্রত্যঙ্গেরও আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমে আসে।

প্র: অনেক সময় তো স্পিলনেক্টমি করা হয়।

উ: স্পলনেক্টমির বেশ কয়েকটি সুবিধেজনক দিক আছে। প্রথম হল, এই অপারেশনের পর রক্ত দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনেক কমে যায়। থ্যালাসেমিয়া মেজর রোগীদের ক্ষেত্রে যেখানে এমনি অবস্থায় বছরে ৪০ থেকে ৫০ বোতল রক্ত লাগে এবং ওষুধপত্রের সাহায্যে আয়রন বার করবার কোর্স করতে হয় বছরে প্রায় ৯টা, অপারেশনের পর বছরে ১২-১৩ বোতল রক্ত এবং এক থেকে দেড়টি আয়রন বার করে দেওয়ার কোর্স করলেই চলে। ই বিটার রোগীদের লিভার এবং পিলে খুব বড় হওয়ার আগে অপারেশন করা হলে রক্ত দেওয়ার প্রয়োজন প্রায় হয়ই না।

বারবার রক্ত দেওয়া হলে রক্তের মাধ্যমে বেশ কিছু সংক্রমণ শরীরে ঢুকতে পারে। পুরোপুরি প্রতিষেধক নেওয়া থাকলেও এড্‌সের সম্ভাবনা এড়ানো যায় না।

থ্যালাসেমিয়াতে খরচ একটা ভয়াবহ ব্যাপার। স্পিলনেকটমির পর খরচ প্রচুর কমে যায়। রোগী সুস্থও থাকে বেশি দিন।

প্র: পিলে বাদ দিলে শরীরের কোনও ক্ষতি হয় না?

উ: থ্যালাসেমিয়া রোগীদের ক্ষেত্রে পিলে মূলত ক্ষতিই করে। কাজেই তাকে বাদ দিলে তেমন অসুবিধে কিছু হয় না।

প্র: একজন ই বিটা রোগীকে সুস্থ কর্মক্ষম জীবন দিতে গেলে বছরে কত খরচ?

উ: খুব তাড়াতাড়ি সঠিক চিকিৎসা শুরু করে দিলে অর্থাৎ নিয়ম মেনে রক্ত দেওয়া, জমা আয়রন বার করে দেওয়া এবং স্পিলনেকটমি করে নিলে খরচ ১-২ হাজার টাকার বেশি নয়। স্পিলনেকটমির খরচ আমাদের কাছে বারো থেকে পনেরো হাজার টাকার মধ্যে।

দেরিতে চিকিৎসা শুরু হলে এবং সঠিক সময়ে স্পিলনেকটমি না করালে খরচ বাড়তেই থাকে।

প্র: তার মানে আপনি বলতে চাইছেন থ্যালাসেমিয়া রোগীমাত্রেই এই অপারেশন করাতে হবে?

উ: থ্যালাসেমিয়া মাইনরদের করানোর দরকার নেই। মেজর অনেক সময় এমন অবস্থায় এসে পৌঁছয় যে করে বিশেষ লাভ হয় না। মাঝারিরা যেহেতু সুস্থভাবে অনেক দিন বেঁচে থাকতে পারেন, তাঁদের ক্ষেত্রে করিয়ে নেওয়া খুব জরুরি।

প্র: থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধ করা যায় না?

উ: শরীরে থ্যালাসেমিয়ার জিন থাকলে করার কিছুই করার থাকে না। কিন্তু সঠিক আচরণ বিধি মানলে পরবর্তী প্রজন্মকে এর হাত থেকে মুক্ত রাখা যায়। যেমন

(১) যদি জানা যায় শরীরে থ্যালাসেমিয়ার জিন আছে অথবা আয়ত্তে হলেও রোগটি আছে শরীরে, সেই ছেলে বা মেয়েকে বিয়ে করতে হবে এমন একজনকে যাঁর শরীরে এই জিন নেই। সেক্ষেত্রে তাঁদের সন্তানের সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা ৫০ ভাগ। বাকি ৫০ জন বাহক হতে পারেন। কিন্তু মা এবং বাবা দু'জনেই যদি বাহক হন বা একজন রোগী একজন বাহক, সন্তানের বাহক এবং রোগী দুইই হওয়ার সম্ভাবনা সমান সমান। কাজেই সেক্ষেত্রে আমরা চাই তাঁরা সন্তানের জন্ম না দিক। যদিও এদের নিজেদের শারীরিক দিক থেকে কোনও অসুবিধে থাকে না।

(২) গর্ভাবস্থায় যদি ধরা পড়ে মা থ্যালাসেমিয়ার বাহক বা মাইনর থ্যালাসেমিয়ার রোগী, স্বামীর রক্ত পরীক্ষা করানো হয়। স্বামী সুস্থ থাকলে সন্তানের জন্ম দেওয়া যায়। কারণ সেক্ষেত্রে বাচ্চার রোগ হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

(৩) বাড়িতে একজন যদি বাহক বা রোগী থাকেন রক্তের সম্পর্ক যুক্ত প্রত্যেককে রক্ত পরীক্ষা করে শরীরে জিন আছে কি নেই সেটা জেনে নিতে হবে। এবং বিয়ের ক্ষেত্রে সাবধানতা নিতে হবে।

এই তিনটি পদ্ধতি মেনেই সাইপ্রাস প্রায় নির্মূল করে ফেলেছে থ্যালাসেমিয়াকে।

কাজেই আমাদেরও না পারার কারণ নেই।

প্র: বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট করালে নাকি থ্যালাসেমিয়া ভাল হয়ে যায়?

উ: থ্যালাসেমিয়ার চাবিকাঠিই লুকিয়ে আছে বোনম্যারোর মধ্যে। খারাপ বোন ম্যারো যথাসময়ে বদলে ফেলতে পারলে রোগ নির্মূল হবে অবশ্যই। তবে এরজন্য খরচ প্রায় ১৫-২০ কুড়ি লক্ষ টাকা।

প্র: কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট, হার্ট বা লিভার ট্রান্সপ্লান্টের মতো এ ক্ষেত্রেও তো শরীর নতুন বোনম্যারো বর্জন করতে পারে?

উ: হতে পারে না তা নয়। তবে সম্ভাবনা কিছু কম।

প্র: কোথায় কোথায় এই অপারেশন করা হয়?

উ: দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্সেস, মুম্বইয়ের টাটা মেমোরিয়াল হসপিটাল এবং ক্রিশ্চিয়ান মেডিকেল কলেজ, ভেলোরে।

প্র: প্রচুর টাকা থাকলে তার মানে থ্যালাসেমিয়ার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যেতে পারে?

উ: ডাক্তারের নির্দেশমতো চললে কিছুটা কমেও যে রেহাই পাওয়া যেতে পারে সে তো আগেই বলেছি।

যথাসময়ে সাবধান হলে শতকরা ৩০ ভাগ বন্ধ্যাত্ব সারিয়ে তোলা যায়

ডাঃ সুদর্শন ঘোষ দস্তিদার

দূরভাষ : ৪৬৪-১৭৫৬

প্র: প্রথম সন্তান নষ্ট করলে নাকি বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়?

উ: সঠিক পদ্ধতিতে অপারেশন না হলে কিছু ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্ব হতে পারে বা গর্ভসঞ্চার হলেও বারবার গর্ভপাত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

প্র: আর গর্ভ নিরোধক বড়ি? সে ক্ষেত্রেও তো শুনেছি অনেকের বাচ্চাই হয় না।

উ: না, এ ব্যাপারটা ঠিক এরকম নয়। কিছু ক্ষেত্রে প্রথম দু'এক মাস গর্ভসঞ্চার না হতে পারে। তার কারণ গর্ভ নিরোধক বড়ি ডিম্বাণু তৈরির প্রক্রিয়া সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেয়। ওষুধ বন্ধ করে দেওয়ার পরও ব্যাপারটা স্বাভাবিক হতে কারও কারও ক্ষেত্রে কিছু সময় লাগে। এর মধ্যে শতকরা ৯৮ জন ওষুধপত্র ছাড়াই ঠিক হয়ে যান। বাকি ২ সামান্য চিকিৎসা দরকার হতে পারে। আসলে সঠিক ভাবে জীবন যাপন করলে এ সমস্ত অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।

প্র: সঠিক জীবন যাপন বলতে?

উ: স্বাভাবিক বিবাহিত জীবন। এর সঙ্গে আরও কয়েকটা জিনিস খেয়াল রাখা দরকার। যেমন মদ্যপান বা ধূমপান যেন মাত্রা না ছাড়ায়, স্বাস্থ্যসম্মত খাওয়া দাওয়া যাতে অপুষ্টি বা রক্তাল্পতা দেখা না দেয়. ডায়াবেটিস বা রক্তচাপ বেশি থাকলে তা যেন আয়ত্তে থাকে, এবং ওজন না বাড়ে।

প্র: ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপ থাকলে সন্তান ধারণে অসুবিধে দেখা দেয়?

উ: চিকিৎসার মাধ্যমে রোগ আয়ত্তে থাকলে গর্ভসঞ্চারে তত অসুবিধে থাকে না। কিন্তু এই রোগগুলি আয়ত্তে থাকলেও যেহেতু নিয়মিত ওষুধ খেতে হয়, গর্ভাবস্থা সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে যেতে চাইলে নিয়মিত ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলা উচিত। সামান্য অমনযোগেই এদের ক্ষেত্রে গর্ভপাত হয়ে যেতে পারে।

প্র: খুব বেশি মোটা মহিলারাও তো অনেক সময় বাচ্চা না হওয়ার সমস্যায় ভোগেন।

উ: খুব বেশি মোটা যাঁরা, অনেক সময়ই দেখা যায়, তাঁদের কিছু না কিছু রোগ আছে, যার ফলে সন্তান ধারণে অসুবিধে দেখা যাচ্ছে। যেমন হাইপোথাইরয়েডিজম, পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজ ইত্যাদি। যথাযোগ্য চিকিৎসা এবং সাবধানতার সাহায্যে এদের ক্ষেত্রে খুব সহজেই গর্ভসঞ্চার সম্ভব হয়।

প্র: কী রকম?

উ: পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজের কথা বলি প্রথমে। কারণ বন্ধ্যা মহিলাদের শতকরা ১০-১৫ ভাগ এই অসুখে আক্রান্ত। অথচ এই রোগ বোঝা, সাবধান হওয়া এবং চিকিৎসা খুবই সহজ।

১৫-১৮/১৯ বছর বয়সে কোনও মেয়েকে যদি দেখেন হঠাৎ করে মোটা হতে শুরু করেছে, মাঝে মধ্যেই ঋতুচক্রের গণ্ডগোল হচ্ছে এবং অবাঞ্ছিত লোমের উৎপাত হচ্ছে শরীরে— পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজ বা পি সি ও থাকার খুব সম্ভাবনা। এদের চামড়া খসখসে হয়, মুখে ব্রণ থাকে, ঘাড়ে কাঁধে চর্বি জমতে থাকে। যদি দেখা যায় তার বোনেরও একই রকম উপসর্গ আছে তাহলে তো আর কথাই নেই। সব সময় লক্ষণগুলি একসঙ্গে থাকে না। তবে দুটো থাকলেই মোটামুটিভাবে ধরে নেওযা যায় রোগটি আছে। সেক্ষেত্রে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ করলে বন্ধ্যাত্ব তো বটেই, উচ্চরক্তচাপ, ডায়াবেটিস হৃদরোগ ইত্যদির এড়ানো সম্ভাবনাও কমে যায়।

প্র: এর চিকিৎসা কী?

উ: ওষুধপত্র এবং কিছু সাবধানতা। বছর ২০ আগে অপারেশন দরকার হত। কিন্তু আজকাল এত ভাল ওষুধপত্র বেরিয়ে গেছে যে খুব সামান্য কিছু ক্ষেত্র ছাড়া অপারেশনের আর প্রয়োজন পড়ে না।

প্র: কী কী সাবধানতা মেনে চলতে হবে?

উ: এঁরা যেহেতু খুব মোটা হন এবং সঙ্গে উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস থাকে বা থাকার সম্ভাবনা থাকে, খাওয়া দাওয়ার নিয়ন্ত্রণ ও ব্যায়াম খুব জরুরি।

(১) মিস্টি খাওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ। কার্বোহাইড্রেট অর্থাৎ ভাত, রুটি, মাটির নীচের সবজি যেমন, কচু, আলু, ইত্যাদি কম খেতে হবে। ঘি, মাখন, চিজ, পাঁঠার মাংস, তৈলাক্ত মাছ, ডিমের কুসুম খাবার তালিকায় কম থাকবে। চকলেট, আইসক্রিম, কোল্ডড্রিঙ্কস, বেশি তেল মশলাদার খাবার না খেলেই ভাল।

(২) ছোট মাছ, চিকেন ডিমের সাদা অংশ খাওয়া যাবে। প্রচুর সবুজ শাক সবজি, গাজর, ঝিঙ্গে, স্যালাড, ডাল, অঙ্কুরিত ছোলা, মুগ, সয়াবিন ইত্যাদি খেতে হবে। এদের প্রচুর ফাইবার খাওয়া উচিত। সেক্ষেত্রে ভাতের বদলে লাল আটার রুটি, দালিয়া ইত্যাদি খাওয়া যায়৷

(৩) খোলা হাওয়ায় হাঁটিতে হবে, ব্যায়াম করতে হবে।

(৪) বছরে অন্তত একবার ব্লাড সুগার এবং লিপিড প্রোফাইল টেস্ট করা দরকার।

(৫) নিয়মিত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতে হবে।

প্র: হাইপো থাইরয়েডিজমের ক্ষেত্রেও কি এত বিধি নিষেধ?

উ: মোটামুটি প্রায় একই। তবে ওষুধপত্র আলাদা।

প্র: যে সমস্ত মহিলা সাদা স্রাবে ভোগেন তাঁদেরও নাকি গর্ভসঞ্চারে অসুবিধে দেখা যায়?

উ: অল্প স্বল্প হলে তেমন অসুবিধে নেই। কিন্তু বেশি সাদা স্রাব হলে এবং এর কারণ যদি হয় পেলভিক ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজ বা পি আই ডি, গর্ভসঞ্চারে অসুবিধে শুধু নয় এমন অসুবিধে হবে যে আই ভি এফ ছাড়া তার সমাধান আর হবে না।

প্র: সাদা স্রাবের পেছনে পি আই ডি আছে কিনা কী করে বুঝব?

উ: পি আই ডির সমস্যা হচ্ছে অনেক সময়ই উপসর্গ তেমন্ মারাত্মক হয় না। তাই নজরে আসে না। সাধারণভাবে দুর্গন্ধযুক্ত সাদা স্রাবের সঙ্গে তলপেটে ব্যথা থাকতে পারে। পিরিয়ডের সময় ব্যথা বেড়ে যাবে। মাঝে মাঝে প্রস্রাবের সংক্রমণ হতে পারে। এই পর্যায়ে চিকিৎসা না হলে ব্যথা চলে যায়। তেমন কষ্ট আর থাকে না। কিন্তু তলে তলে বন্ধ্যাত্বের প্রস্তুতি চলতে থাকে। অথচ একটু সচেতন হলে পুরোপুরি এড়িয়ে যাওয়া যায় রোগটিকে।

প্র: কী রকম?

উ: অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ থেকেই মূলত রোগটির সৃষ্টি। নোংরা হয়ে থাকা, নোংরা পুকুরে স্নান করা, অপরিচ্ছন্ন জামাকাপড় পরা সর্বোপরি যৌন রোগে আক্রান্ত পুরুষের সঙ্গে সহবাস। রোগের শুরুতে অল্পস্বল্প জ্বালা বা সাদা স্রাবকে গুরুত্ব না দেওয়া, প্রস্রাবের সংক্রমণ হলে সতর্ক না হওয়া ইত্যাদির ফলেই রোগটি থাবা গেড়ে বসে। যার ফলে যেখানে গর্ভসঞ্চার হয় সেই টিউবের মুখ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যেতে পারে বা তার কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়। টিউব, ওভারি সব মিলেমিশে ডেলা পাকিয়ে যেতে পারে (টি ও মাস)। অর্থাৎ বন্ধ্যাত্ব। প্রথমেই রোগ ধরা গেলে শুধুমাত্র ওষুধপত্রের সাহায্যে পুরোপুরি সুস্থ করে তোলা যায়।

প্র: জরায়ুতে টিউমার থাকলেও কি গর্ভসঞ্চারে অসুবিধে দেখা দেয়?

উ: কিছু ক্ষেত্রে হতে পারে। তবে এর খুব ভাল চিকিৎসা আছে। রোগ ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা করালে সমস্যা মিটে যায়।

প্র: আজকাল শুনছি জরায়ুর টিউমার অপারেশন না করিয়েও গর্ভসঞ্চার হচ্ছে?

উ: টিউমার, সঙ্গে পেট ব্যথা এবং রক্তপাতের উপসর্গ আছে— আগে অপারেশন না করিয়ে গর্ভসঞ্চারের কথা ভাবাই যেত না। আজকাল কিছু ক্ষেত্রে ওষুধের সাহায্যে টিউমার ছোট করে দেওয়া হচ্ছে। টিউমারের বৃদ্ধিও রোধ করা সম্ভব হচ্ছে। সঙ্গে বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসা করে গর্ভসঞ্চার করানো যাচ্ছে।

প্র: স্বামীর ডায়াবেটিস থাকলেও নাকি গর্ভসঞ্চারে অসুবিধা হয়?

উ: কিছু ক্ষেত্রে হতে পারে।

প্র: চিকিৎসায় এঁদের সারিয়ে তোলা যায়?

উ: অধিকাংশ ক্ষেত্রে যায়।

প্র: ব্লাডার নেক সার্জারি করিয়েও তো অনেকে অক্ষম হয়ে যান?

উ: অনেকে নয়। খুব সামান্য ক্ষেত্রে অপারেশনের ত্রুটির জন্য এরকম হতে পারে।

প্রঃ পুরুষের ক্ষেত্রে কি এমন কোনও নিয়ম কানুন আছে যা মেনে চললে গর্ভসঞ্চারে কোনও অসুবিধে হবে না?

উঃ সাধারণভাবেই মদ্যপান, ধূমপান, অপুষ্টি ইত্যাদি এড়িয়ে চলতে বলা হয়। আর শুক্রাণুর সংখ্যা বা গতিশীলতায় যদি কোনও সমস্যা থাকে দু'একটি নিয়ম কানুন মানতে বলা হয়। যেমন-

(১) খাবারের শতকরা ৩০ ভাগ থাকবে স্যালাড। টমেটো, শশা, গাজর, বীট, ধনেপাতা, লেটুস পাতা, অঙ্কুরিত ছোলা, মটর, কপি পাতা — সব মিশিয়ে স্যালাড তৈরি করলে প্রচুর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট পাওয়া যাবে। শুক্রাণুর সমস্যা দূর করতে এর ভাল ভূমিকা আছে।

(২) জাঙ্গিয়া খুব টাইট করে পরা যাবে না।

(৩) দিনে দু'তিনবার অন্তত ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে হবে।

(৪) সুষম খাবার খেতে হবে। এবং ব্যায়াম করতে হবে নিয়মিত।

(৫) শুক্রাণুর সমস্যা থাকলে নিয়মিত ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে ইত্যাদি।

প্রঃ কতদিন অপেক্ষা করার পর বুঝব স্বামী বা স্ত্রী কারর মধ্যে ত্রুটি আছে, ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার?

উঃ স্বামী-স্ত্রী যদি স্বাভাবিক জীবন যাপন করেন তবে স্ত্রীর বয়স ২০ থেকে ২৫-এর মধ্যে হলে ২ বছর, ৩০ থেকে ৩৫ হলে ১ বছর এবং ৩৫ এর ওপরে হলে ৬ মাস অপেক্ষা করার পরও যদি গর্ভসঞ্চার না হয়, তবে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

গর্ভাবস্থায় টাটকা ফল, শাকসব্জি বেশি খেতে হবে

ডাঃ সুব্রত চট্টোপাধ্যায়

দূরভাষ : ৪৬৪-১০৮৬

প্রঃ কী করে বুঝব যে মা হতে চলেছি?

উঃ তারিখ পার হয়ে যাওয়ার দু'তিন সপ্তাহ পরেও যদি পিরিয়ড না হয় তাহলে গর্ভসঞ্চারের ব্যাপারটা মাথায় রাখতে হবে। ডাক্তার দেখিয়ে ইউরিন পরীক্ষা করিয়ে নিলেই নিঃসন্দেহ হওয়া যাবে।

প্রঃ কোনও উপসর্গ নেই যা দেখে বোঝা যাবে গর্ভসঞ্চার হয়েছে?

উঃ হ্যাঁ, মাথা ঘোরা, গ্যাস, অম্বল, বমি ভাব, দুর্বলতা, হজমের গণ্ডগোল কোষ্ঠকাঠিন্য এসব থাকে কারোর কারোর মধ্যে। তবে এ থেকে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না।

প্রঃ এদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার কী উপায়?

উঃ অল্পস্বল্প মাথা ঘোরা নিয়ে বেশি চিন্তা করার দরকার নেই। দু'তিন মাসের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে। বেশি হলে একটু বিশ্রামে থাকা দরকার। না হলে হঠাৎ করে পড়ে গিয়ে বিপদ হতে পারে। গ্যাস অম্বল বেশি হলে ডায়াজিন জাতীয় ওষুধ দিনে দু' তিনবার খাবার আগে বা যখন অম্বল হচ্ছে তখন খান। কিন্তু খাওয়া দাওয়া কমাবেন না। খাবারও খাবেন। ওষুধও খাবেন। বমিভাব কমাতেও ওষুধ দিই আমরা। হজমের গণ্ডগোল এই সময় একটু হয়। দুপুরে এবং রাতে খাবার পরে দু' চামচ কার্মোজাইম খেতে পারেন। বা অন্য কোনও এনজাইম। কোষ্ঠকাঠিন্য এড়াতে ফাইবার জাতীয় খাবার বেশি করে খান। যেমন কর্নফ্লেক্স, ব্রাউনব্রেড, শাক সবজি বিশেষ করে ঝিঙে, ভেণ্ডি, গাজর, সবরকম ফল। জল খান বেশি করে। আর রোজ দু'চামচ করে ইসবগুল। রাতে শোয়ার আগে। দরকার হলে ইসবগুল দিনে দু'বারও খাওয়া যেতে পারে। তাতেও সমস্যা না মিটলে মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়া বা ক্রিমাফিন জাতীয় ওষুধ দেওয়া হয়।

প্রঃ একদম যাঁরা খেতে পারেন না, খাওয়া মাত্র বমি হয়ে যায়, তাঁরা কী করবেন?

উঃ বমি হলেও খেতে হবে। সাধারণত এই সময় আমিষ খাবারে বেশি সমস্যা হয়।

অনেকেই তার ফলে মাছ, মাংস, ডিম সব ছেড়ে দিয়ে শুধু আলু সেদ্ধ ভাত বা শাক ভাত খেয়ে দিন কাটান। ফলে অপুষ্টি, দুর্বলতা, রক্তাল্পতা ইত্যাদি দেখা দেয়। এ থেকে ভবিষ্যতে বাচ্চা এবং মা দুইয়েরই বিপদ হতে পারে।

প্র: খেয়ে যদি বমিই হয়ে গেল তাহলে আর খেয়ে কী লাভ ?

উ: বমি হয়ে গেলেও খেতে হবে। কারণ যা খাবেন তার পুরোটা তো আর বমি হবে না। কিছু পেটে থাকবে। তাতেই কাজ হবে। যাঁদের বমির ধাত, খালি পেটে থাকলে তাঁদের আরও বেশি বমি হয়। অল্প অল্প করে বারবার খেলে অত বমি হবে না। এবং আমিষ খাবার, খেতে হবে। সঙ্গে বমি বন্ধ করাব ওষুধ।

প্র: গর্ভাবস্থায় কী খাব আর কী খাব না ?

উ: গর্ভাবস্থায় বেশি খেতে হবে টাটকা ফল, শাক-সবজি, পরিমিত পরিমাণে মাছ, মাংস, ডিম, মেটে ইত্যাদি আমিষ প্রোটিন। পাঁঠাব মাংস বাদ বাখাই ভাল। দুধ, দই, ছানার মধ্যে কোনও একটা অন্তত নিয়মিত খেতে হবে। তবে দোকানের মিষ্টি দই নয়, ঘরে পাতা দই। ডায়াবেটিস না থাকলে চিনি মিশিয়ে খাওয়া যেতে পারে। কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার, যেমন, ভাত, রুটি, চিড়ে, মুড়ি, আলু ইত্যাদি খুব বেশি নয়। মাপ মতো। চর্বি জাতীয় খাবার, তেল মশলাদাব খাবার, ভাজাভুজি, আইসক্রিম, কোল্ডড্রিঙ্কস, চা, কফি ইত্যাদি না খাওয়াই ভাল।

প্র: খাবারেব তে[illegible] সকালে কাবোহাইড্রেট খাওয়া উচিত। রাত্রে ফল খাওয়া উচিত নয় ইত্যাদি। তো মোটামুটি একটা চার্ট করে দিন—যেভাবে খেলে সব ঠিকঠাক হবে।

উ সকালে এক কাপ চা, বিস্কুট দিযে খান। ৭-৮টার দিকে ব্রেকফাস্টে রুটি-সবজি, কর্নফ্লেক্স-দুধ, টোস্ট, দালিয়ার মধ্যে যে কোনও একটা। সঙ্গে একটা ডিম সেদ্ধ এবং কোনও একটা ফল। দশটা সাড়ে দশটার সময় একটু ছানা, এক গ্লাস ডাবের জল বা ফলের রস। বারোটায় ভাত বা রুটি, ডাল, স্যালাড (অতি অবশ্যই), সবজি, মাছ বা মুরগির মাংস (৭৫গ্রাম), ১০০ গ্রাম টক দই। চা খাওয়ার অভ্যেস থাকলে তিনটের দিকে এককাপ চা দুটো বিস্কুট দিয়ে খেতে পারেন। চারটে নাগাদ ছোলা সেদ্ধ আলু দিয়ে আলুকাবলির মতো করে বা ঘুঘনি, উপমা, চিঁড়ের পোলাও, মুড়ি বাদাম খাওয়া যেতে পারে। রাতের খাবার খান ৭.৩০-৮.০০টার মধ্যে। খাবার দুপুরের মতোই। রাত্রে ৯.৩০-১০.০০টার সময় এক গ্লাস মাঝারি গরম দুধ। ডায়াবেটিস থাকলে খাবারে মিষ্টির পরিমাণ, ভাত-রুটি-আলুর ব্যাপাবে একটু সাবধানতা মেনে চলতে হবে। আর ব্লাড প্রেশার বেশি হলে নুন।

প্র: গর্ভাবস্থায় স্বাভাবিক কাজকর্ম করা যাবে?

উ: নিশ্চয়ই। প্রথম তিন মাস একটু সাবধানে থাকা দরকার। তারপর ঘরের স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে অসুবিধে কিছু নেই। তবে ভারী কাজ না করা উচিত। যাঁরা অফিস কাছারিতে কাজ করেন তাঁরাও প্রায় শেষ পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যেতে পারেন। তবে নিয়মিত ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতে হবে।

প্র: নিয়মিত বলতে?

উ: পিরিয়ড বন্ধ হবার ২-৩ সপ্তাহের মাথায় প্রথমবার। তারপর আড়াই থেকে তিন মাস বাদে। এরপর ৭মাস পর্যন্ত প্রত্যেক মাসে একবার করে। তারপর থেকে দু'সপ্তাহ অন্তর। এবং শেষের দিকে প্রতি সপ্তাহে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।

প্র: গর্ভাবস্থায় অনেক সময় গা হাত পা চুলকোয়।

উ: রক্তে বাইল সল্ট এবং পিগমেণ্টের পরিমাণ বাড়লে গা হাত পা চুলকোতে পারে। অনেক সময় ডেলিভারির দিন যত এগিয়ে আসে চুলকুনি তত বাড়ে। এরকম হলে সাধারণত ক্যালাড্রিল জাতীয় লোশন গায়ে মাখতে বলা হয়। অথবা ইউডিলিভ জাতীয় ওষুধ খেতে হয়। বাড়াবাড়ি হলে রক্ত পরীক্ষা করে সেইমতো ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

প্র: মা ঠাকুমারা বলেন গর্ভাবস্থায় চেহারা খারাপ হলে ছেলে হয়, আর ভাল হলে মেয়ে।

উ: এই সমস্ত কথার কোনও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই। চেহারা খারাপ হয় ঠিকভাবে খাওয়া দাওয়া না করলে, ওষুধপত্র না খেলে বা যদি অন্য কোনও রকম অসুস্থতা সঙ্গে থাকে। তবে সাধারণভাবে অনেকেরই চুল পড়ে যায়, চামড়া একটু খসখসে হয়ে যায়। ডেলিভারির পরে আবার ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে আসে।

প্র: অনেকে বলেন গর্ভাবস্থায় পেটে হাল্কা করে তেল মালিশ করলে পরবর্তী কালে ফাটা দাগ হয় না।

উ: গর্ভাবস্থার চার পাঁচ মাসের পর থেকে পেটে দাগ হতে শুরু করে। স্ট্রেচনিল বা অ্যালোভেরা জাতীয় ক্রিম হাল্কা মালিশ করলে এবং ডেলিভারির পর নিয়মিত ব্যায়াম করলে ব্যাপারটা কমানো যায়।

প্র: এ সময় পা ঝুলিয়ে বসলে যে পা ফুলে যায়?

উ: এ সময় শরীরে জলের ভার একটু বাড়ে। কাজেই সামান্য হাত পা ফুলতে পারে। পা ঝুলিয়ে বসলেই বেশি হয় ব্যাপারটা। সেক্ষেত্রে চেষ্টা করবেন যতটা সম্ভব পা না ঝুলিয়ে বসতে। রাত্রিবেলা শোয়ার সময় পায়ের নীচে বালিশ দিয়ে শোবেন। এতে যদি ঠিক হয়ে যায় তবে ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু ফোলা যদি থেকেই যায় এবং টিপে দিলে গর্ত হয়ে থাকে, ডাক্তারের পরামর্শ একান্ত জরুরি। এই পরিস্থিতি অবহেলা করলে বিপদ হতে পারে।

প্র: কীরকম?

উ: টক্সিমিয়া নামের বিপজ্জনক অবস্থাটির সূত্রপাত প্রাথমিক ভাবে এভাবেই হয়। এই অবস্থায় রক্তচাপ এবং প্রস্রাব পরীক্ষা করিয়ে রোগ নির্ণয় হয়ে গেলে অল্পের ওপর দিয়ে যায়। না হলে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা করতে হয়।

প্র: গর্ভাবস্থায় আপনারা তো নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করান, ওষুধপত্র দেন। সেই সময় বিপদের সম্ভাবনা আছে কিনা বোঝা যায় না?

উ: অনেকটাই বোঝা যায়। যেমন রক্তাল্পতা আছে কিনা জানার জন্য হিমোগ্লোবিন, ডায়াবেটিসের জন্য সুগার, কিডনি ঠিকঠাক আছে কিনা জানতে রক্তের ইউরিয়া,

ক্রিয়াটিনিন পরীক্ষা করা হয়। হেপাটাইটিস বি আছে কিনা জানতে অস্ট্রেলিয়া অ্যান্টিজেন বা থাইরয়েডের অসুখের জন্য টি এস এইচ লেভেল। এর সঙ্গে রুটিন পেচ্ছাপ এবং মল পরীক্ষা। কারণ উপসর্গহীন প্রস্রাব সংক্রমণ থাকলে বাচ্চা ঠিকমতো বাড়তে পারে না বা সময়ের আগেই ডেলিভারি হয়ে যায়। মলে যদি রক্ত বা কৃমি থাকে তাও ভাল কিছু নয়। চিকিৎসা দরকার হয়।

এবার ওষুধপত্র। গর্ভাবস্থায় শরীরে রক্ত এবং ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন বাড়ে। গর্ভাবস্থার প্রথম দিকে ফলিক অ্যাসিড দেওয়া হয়। ৩-৪ মাসে আয়রন এবং ফলিক অ্যাসিড। এবং ৪-৫ মাসের পর থেকে আয়রন, ফলিক অ্যাসিড এবং ক্যালসিয়াম। এটা সুস্থ মায়েদের ক্ষেত্রে বললাম। এর সঙ্গে যদি কিছু অসুস্থতার হদিশ পাওয়া যায়, যেমন ধরুন রক্তে হিমোগ্লোবিন ৯ এর নীচে, থ্যালাসিমিয়ার টেস্টও করা দরকার। মা যদি থ্যালাসিমিয়ার বাহক হন আয়রন দেওয়া যায় না। শুধু ফোলিক অ্যাসিডের ওপর রাখতে হয়। ডায়াবেটিস, ব্লাড প্রেসার থাকলে ও বিশেষ ওষুধপত্রের দরকার হয়।

প্র: গর্ভাবস্থায় অনেকের মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে যায় কেন?

উ: এই সময় শরীরে হর্মোনের নানা রকম পরিবর্তন হয়। সেইজন্যই এই সমস্ত নানা রকম ব্যাপার হয়। কিন্তু গর্ভাবস্থার পুরোটাই অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় থাকা জরুরি। মাকে এই সময় বেশি কিছু বোঝাতে না যাওয়াই ভাল। মোটামুটি তাঁর তালে তাল দিন। হাল্কা বইপত্র পড়তে দিন, সিনেমা থিয়েটার দেখান। বুঝিয়ে দিন যে আপনারা সবাই তাঁর সঙ্গে আছেন। কোনও বকম উত্তেজনার ঘটনা এ সময় না ঘটাই ভাল। বা ভয় পেতে পারে এমন কোনও ঘটনা। রক্তচাপ যদি বেশি থাকে বা ডায়াবেটিস, আরও একটু সাবধান হবেন।

প্র: গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস, ব্লাড প্রেশার বেশি হয় কি?

উ: বেশি হয় ঠিক তা নয়। তবে হয়। আগে ছিল না গর্ভাবস্থায় ধরা পড়ল, এরকম হতে পাবে। একে বলে 'প্রেগন্যান্সি ইনডিউজড্ হাইপারটেনশন বা ডায়াবেটিস'। আবার আগে হয়ত ছিল, জানা ছিল না। গর্ভাবস্থায় পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে গিয়ে ধরা পড়ল, এরকমও হয়। পরিবারের কারোর যদি ডায়াবেটিস বা ব্লাডপ্রেশার থাকে তবে এরকম হতে পারে। দু' ক্ষেত্রেই খাওয়া দাওয়ার নিয়ম কানুন, ওষুধপত্র এবং বিশ্রাম জরুরি।

প্র: ওষুধপত্র বলতে ইনসুলিন বা প্রেশার কমানোর ট্যাবলেট?

উ: হ্যাঁ।

প্র: এইসব মারাত্মক ওষুধে বাচ্চার কোনও ক্ষতি হয় না?

উ: রোগ দুটি আরও বেশি মারাত্মক। তেমন তেমন ক্ষেত্রে মাকে হাসপাতালে ভর্তি রেখে কড়া নজরদারির মধ্যে চিকিৎসা করতে হয়।

প্র: একেই কি 'হাই রিস্ক প্রেগন্যান্সি' বলে?

উ: হ্যাঁ। তবে শুধু এ দুটো নয়, আরও বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে গর্ভাবস্থায় বিশেষ সাবধানতা নিতে হয়। যেমন,

(১) মায়ের বয়স যদি ৩৫ এর ওপরে হয়, বিশেষ করে প্রথম বাচ্চার ক্ষেত্রে।

(২) আগে যদি দু'একবার বাচ্চা নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে অথবা নষ্ট করা হয়ে থাকে।

(৩) খুব মোটা মহিলাদের ক্ষেত্রে,

(৪) মায়ের যদি রক্তাল্পতা থাকে। বাঙালি, ওড়িয়া এবং অসমিয়া মহিলাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা বেশি । আরও ভয়ের কথা এদের মধ্যে শতকরা প্রায় ২-৩জনই থ্যালাসেমিয়া রোগের বাহক। তাঁদের ক্ষেত্রে তো আরও সাবধানতা দরকার।

(৫) যদি অ্যাজমা থাকে।

(৬) ভ্রূণের কিছু সমস্যা থাকে অনেক সময়। যেমন, বাচ্চা বাড়ছে না বা ঘুরে আছে বা উল্টে আছে।

(৭) আগে দু'তিনটি অপারেশন হয়ে থাকলেও গর্ভাবস্থায় সাবধানতা জরুরি।

(৮) গর্ভাবস্থায় যদি জল বা রক্ত বেরোয়

প্র: এরকম হলে নিজেরা কী সাবধানতা নেবে?

উ: প্রথম থেকেই নিয়মিত ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ রেখে চলবে। সামান্য অসুবিধে হলেই ডাক্তারকে জানাবে। ডাক্তারের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবে। এবং ডেলিভারির সময় খুব ভাল পরিকাঠামো আছে এমন হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে ভর্তি করতে হবে।

প্র: 'হাই রিস্ক প্রেগন্যান্সি'র ক্ষেত্রে কি সিজার করতে হয়?

উ: হাই রিস্ক বলে নয় সাধারণ ক্ষেত্রেও বেশি ঝুঁকি আমরা নিই না। যদি বোঝা যায় বাচ্চা কষ্ট পাচ্ছে, কষ্ট না বাড়িয়ে সিজার করাই যুক্তিযুক্ত। তবে সব ঠিকঠাক থাকলে নর্মাল ডেলিভারিই করানো হয়।

মায়ের দুধ খেলে বাচ্চার রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বাড়ে

অধ্যাপক (ডাঃ) নিশীথরঞ্জন পান

দূরভাষ ৩৩৭-৩৩৭১

প্র সিজার করে জন্মানো বাচ্চা বেশি বুদ্ধিমান হয়?

উ বাচ্চা যে যার মতো বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে জন্মাবে। এর সঙ্গে সিজার বা নর্মাল ডেলিভারির কোনও সম্পর্ক নেই। তবে আগে যখন সিজারের অত চল ছিল না বা প্রত্যন্ত গ্রামে যেখানে সিজারের সুবিধে ছিল না, বড় বাচ্চা জোর করে প্রসব করাতে গিয়ে অনেক সময় মাথায় চোট লেগে যেত। কিছু ক্ষেত্রে তার প্রভাব পড়ত বাচ্চার বুদ্ধিবৃত্তির উপরে। তাই হয়তো এরকম একটা ধারণা চালু আছে।

প্র নর্মাল বা ফরসেপ ডেলিভারি করলে কি বাচ্চার মাথার আকার খারাপ হয়ে যায়?

উ শিশুর মাথা নিয়ে মায়েদের মনে নানারকম অশান্তি থাকে। মাথা লম্বা, চ্যাপ্টা, গোল, টোল খাওয়া বা হাড় উঁচু নানা রকম হতে পারে। মাথার মাঝখানটাও তুলতুলে নরম থাকা স্বাভাবিক। এ নিয়ে অত চিন্তা করার কিছু নেই। অস্বাভাবিকতা থাকলে সেটা বাচ্চার ডাক্তার ঠিক বুঝে নেবেন।

প্রঃ অনেক বাচ্চার মাথা দেখা যায় প্রয়োজনের তুলনায় বড় এবং সবসময় ঘামে। এতে ভয়ের কিছু নেই তো?

উ নবজাত শিশুর মাথা একটু বড় থাকে। ফিতে দিয়ে মাপলে বুকের যা বেড় পাবেন তার থেকে প্রায় ৩ সেমি বেশি। এটা স্বাভাবিক। আর জন্মের ১ মাস পর থেকে শিশুর মাথা একটু বেশি ঘামতে থাকে। কারণ শিশুর মাথার পাতলা চামড়ার ভেতর দিয়ে বেশি পরিমাণে রক্ত সঞ্চালিত হয়, বেশি তাপ বিকিরিত হয়, তাই হাত দিলে গরম লাগে। বেশি ঘাম হলে তাপ নিঃসরণে সুবিধে হয়, তাই মাথা ঘামে।

প্রঃ মাথা ঠান্ডা করতে বেশি করে তেল দিলে কোনও ক্ষতি হবে কি? তেল দিলে তো চুলও গজাবে।

উ: তেল দিলে বাতাসের ময়লা সহজেই মাথায় এসে বসবে, মাথায় ময়লা জমবে, সূক্ষ্ম ঘাম নালিগুলির মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। এতে ক্ষতি ছাড়া লাভ কিছু নেই। আর তেল দেওয়ার সঙ্গে চুল ওঠার কোনও সম্পর্ক নেই। বাচ্চা বড় হলে বংশধারা অনুযায়ী তার চুলের বাড়বৃদ্ধি হবে।

প্র: জন্মের পর ১ মাস পর্যন্ত বাচ্চার শরীরে তো অসংখ্য পরিবর্তন নজরে আসে। তার কোনগুলি স্বাভাবিক ?

উ: অনেক শিশুর গায়ে হালকা নীল বড় বড় ছোপ দেখা যায়। বিশেষ করে পিঠের দিকে। বছর খানেকের মধ্যে এগুলি নিজে থেকে মিলিয়ে যায়। অনেকের কপালে হাতে পায়ে ছোট ছোট সূক্ষ্ম লোম, কপালে এবং নাকের উপর ছোট ছোট গুটি থাকে। এক দেড় মাস পর এগুলিও মিলিয়ে যায়। ৭ থেকে ১০ দিনের মাথায় নাভি শুকিয়ে পড়ে যায়। এই সময় বাচ্চার শরীর থেকে পাতলা চামড়া উঠতে শুরু করে। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এও স্বাভাবিক। অনেক সময় ২ থেকে ৮ দিনের ভিতর, বিশেষ করে যারা বাইরের দুধ খায়, তাদের গায়ে এক বকম লাল আমবাতের মতো হয়। এ সময় তেল লাগানো সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হবে। রেখে সাবানেব ফেনা দিয়ে বাচ্চার শরীর পরিষ্কাব করে হালকা করে পাউডাব লাগিয়ে দিতে হবে। ২-৪ দিনেব মধ্যে রাশগুলি মিলিয়ে না গেলে ডাক্তাবকে জানাবেন।

প্র: নবজাত বাচ্চার কানে প্রচুর ময়লা থাকে। পরিষ্কার করা যেতে পারে?

উ: ময়লা সেরকম থাকে না। কানের ফুটোব মধ্যে অনেক সময় সাদা সাদা গুঁড়ো জমে থাকে। তুলো ভিজিযে বাইরে থেকে কিছুটা পবিষ্কার কবে দিতে পারেন। কিন্তু খোচাখুচি করবেন না বা কানে তেল ঢেলে দেবেন না।

প্র: সদ্যোজাত বাচ্চার গা মাঝে মধ্যেই গরম লাগে। এটা কি জ্বর?

উ: বাচ্চার শরীরের তাপমাত্রা ৯৭ থেকে ৯৮.৪ ডিগ্রি ফারেনহাইটের মধ্যে ওঠানামা কবে। কাজেই কখনও কখনও মনে হতে পারে বাচ্চার বুঝি জ্বর এল। খুব গরম পড়লে বা বাচ্চাকে বেশি ঢাকা দিয়ে রাখলে গা গরম মনে হতে পারে। এ নিয়ে ভয় পাবেন না।

প্র: বাচ্চা জন্মানোর পর থেকে তাকে মায়ের দুধ খাওয়াতে হবে। কিন্তু সিজার করে বাচ্চা হলে সেটা কি সম্ভব?

উ: সিজার করে বাচ্চা হলে এবং মায়ের অবস্থা যদি খাবাপ হয় প্রথম এক দু দিন একটু অসুবিধে হতে পারে। এসময় সামান্য গ্লুকোজের জল বা ফোটানো জল ঠাণ্ডা কবে অল্প অল্প কবে বাচ্চাকে খাওয়ানো যায়। কিন্তু মায়ের জ্ঞান আসা মাত্র বুকে দুধ থাক বা না থাক, মার যতই অনিচ্ছা থাকুক, টানাতে শুরু করতে হবে । বাচ্চা যত টানবে তত মায়ের বুকে দুধ আসবে। হাসপাতাল বা নার্সিংহোমেই যদি বোতলের দুধ খাওয়ানোর অভ্যেস কবে ফেলেন, বাচ্চা আর মায়ের দুধ টানবে না। দুধও শুকিযে যাবে।

প্র: যে মায়ের দুধ হবে না?

উ: দুধ না হওয়া মায়ের সংখ্যা শতকবা হিসেবেই আসে না। আসলে বাচ্চাকে দুধ

খাওয়াতে গেলে ধৈর্যের দরকার, কিছু নিয়ম কানুন জানা দরকার। না হলে মায়ের ভুল ধারণার জন্য বাচ্চার ক্ষতি হবে।

প্র: কী নিয়ম কানুন জানতে হবে?

উ: (১) বাচ্চা পেটে আসা মাত্র ঠিক করে নিন বাচ্চাকে বুকের দুধই খাওয়াবেন। সেই মতো নিপ্‌লের পরিচর্যা করুন। পরিচর্যা আর কিছুই না নিপ্‌ল মাঝে মধ্যে গরম জল তুলোর সাহায্যে পরিষ্কার করে তেল দিয়ে সামনের দিকে টেনে টেনে মালিশ করা।

(২) নিজের যত কষ্টই হোক বাচ্চা কাঁদতে শুরু করা মাত্র তাকে বুকের দুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করুন।

(৩) বাচ্চা জন্মের পর প্রথম দু'তিন দিন হলদে ঘন এক ধরনের তরল পদার্থ মায়ের বুকে জন্মায়। এর নাম কলোস্ট্রাম। এর পুষ্টিগুণ এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা খুব বেশি। কিন্তু মায়েরা ভাবতে শুরু করেন যে তাঁর বুকে বুঝি দুধ হল না। এই ভুল ধারণা দূর করা দরকার।

(৪) ঘড়ি ধরে নয়, প্রথম দিকে বাচ্চা কাঁদতে শুরু করা মাত্র পর্যায়ক্রমে দুটো বুকের দুধ খাওয়াবেন। বাচ্চা যত কাঁদবে এবং টানবে তত মায়ের বুকে দুধ আসবে।

প্র: বুকের দুধে পালিত বাচ্চা কম অসুস্থ হয়?

উ: হ্যাঁ, তার তিন চারটে কারণ আছে।

(১) মার বুকের দুধ বাচ্চার প্রয়োজন অনুযায়ী তৈরি।

(২) জীবাণুমুক্ত।

(৩) শিশুর দৈনন্দিন প্রয়োজন অনুসারে এর গুণগত পরিবর্তন হয়।

(৪) এর রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা আছে। অর্থাৎ মায়ের দুধ বাচ্চাকে কেবল পুষ্টিই জোগায় না, বিভিন্ন রোগের হাত থেকেও তাকে বাঁচায়।

প্র: অনেক মাই একটি বিশেষ অসুবিধে ভোগ করেন। বাচ্চা একটু খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে। অথচ শুইয়ে দেওয়ামাত্র আবার কাঁদতে শুরু করে। তবে আবার খাওয়ানো শুরু করলে। এর সমাধান কী?

উ: বাচ্চাকে খাওয়ানোর একটা নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। সেটা মেনে চললে সমস্যা কম হবে। বুকের দুধ খাওয়ানোর সময় বাচ্চাকে কোলে আধ বসা অবস্থায় নিয়ে মা ভাল করে আরাম করে বসবেন। বাচ্চার মাথা মায়ের কনুইয়ের ভাঁজে থাকবে। হাত দিয়ে বাচ্চাকে বুকের কাছে টেনে এনে যে কোনও একদিক থেকে খাওয়াতে শুরু করতে হবে। শিশু প্রথমে বেশ কিছুক্ষণ জোরে একটানা খেয়ে থেমে যাবে। এই সময় তাকে উল্টোদিকের দুধ খাওয়াতে শুরু করুন এবং চিবুকের নিচটা বুড়ো আঙুল দিয়ে চেপে রাখলে বাচ্চা ঘুমিয়ে পড়লেও কিন্তু দুধ খেতে থাকবে। খাওয়ানোর এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে তিনটি বিশেষ সুবিধে পাবেন।

(১) জোরে টানলে দুধ বেশি তৈরি হবে।

(২) বাচ্চা কম সময় ধরে খাবে এবং বেশিক্ষণ চুপ করে থাকবে।

(৩) বাচ্চার পেটে গ্যাস কম হবে।

প্রঃ বাচ্চার পেট ফাঁপা বা ব্যথা কীভাবে দূর করা যাবে? অনেকে বলেন মায়ের অম্বল বা পেটের অসুখ থাকলে নাকি এরকম হয়?

উঃ বাচ্চা যখন জন্মায় তার পেটে একফোটাও হাওয়া থাকে না। কিন্তু জন্মানোর ঘণ্টা ছয়েকের মধ্যে পেট ভর্তি হয়ে যায় বাতাসে। এর পর প্রতিমুহূর্তে বাচ্চা বাতাস গিলতে থাকে। দুধ খাওয়ার সময়, আঙুল চোষার সময় বা এমনিও অনেক সময়। এ সবই পেট ফাঁপা বা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এটা পুরো এড়াতে পারবেন না। তবে কম সময় ধরে খাওয়ালে এবং খাওয়ানোর পর ঢেকুর তোলালে সমস্যা কম থাকবে। মায়ের অম্বল, পেটের অসুখ বা সাধারণ অসুখ বিসুখের প্রভাব দুধের ওপর পড়ে না। তবুও কোনও ওষুধ খাওয়ার আগে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে নেবেন।

প্রঃ বাচ্চার পেট খারাপ হলে কী করব?

উঃ প্রথমে বুঝতে হবে বাচ্চার পেট খারাপ কাকে বলে। মায়ের দুধ খায় যে বাচ্চা তার দিনের মধ্যে ৭-৮ বার পর্যন্ত নরম পায়খানা করতে পারে। বাচ্চা যদি ঠিকঠাক খায় এবং কান্নাকাটি না করে তাহলে এ নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। অন্যথায় ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। কিন্তু বুকের দুধ খাওয়ানো বন্ধ করবেন না।

প্রঃ সদ্যোজাত বাচ্চার পরিচর্যা কীভাবে করতে হবে? স্নান করানো, তেল মাখানো ইত্যাদি।

উঃ বাচ্চার শরীরে সহ্য হলে তেল মাখানো যেতে পারে। তবে অল্প পরিমাণে। কোনও রকম অ্যালার্জি দেখা দিলে সাময়িক ভাবে তেল লাগানো বন্ধ করতে হতে পারে। রোজ স্নানের সময় সাবানের ফেনা দিয়ে শরীর এবং মাথা বিশেষ করে গলা বগল, কুঁচকি, পাশাপাশি করে নরম ন্যাকড়া দিয়ে মুছিয়ে দিতে হবে। পরিষ্কার থাকলে মাথায় চুমটি পড়ার সমস্যা কম থাকবে। চুমটি পড়ে গেলে রোজ বেবি শ্যাম্পু দিয়ে মাথা ধুইয়ে দিতে হবে। স্নানের পর বাচ্চার শরীরে হালকা করে পাউডারের প্রলেপ দিতে হবে।

প্রঃ বাচ্চাকে বাইরের দুধ খাওয়াতে হলে, কোন দুধ খাওয়ানো উচিত?

উঃ কৌটোর দুধ খাওয়ানোই শ্রেয়। কারণ গরুর দুধ বাচ্চার উপযোগী করে তুলতে গেলে বেশ কিছু ঝামেলা পোয়াতে হয়। যেমন প্রথমে দুধ ৭ থেকে ১০ মিনিট ভাল করে ফুটিয়ে নিতে হবে। তারপর তাতে মেশাতে সমপরিমাণে ফোটানো ঠান্ডা করা জল এবং এক চামচ চিনি।

প্রতিবার খাওয়ানোর সময় ফোটালে, দুধের পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়ে যাবে। আবার একবার ফুটিয়ে রেখে দিলে ৪/৫ ঘণ্টা পরে তাতে জীবাণু সৃষ্টি হবে। অতএব মায়ের দুধ খাওয়ানো একেবারেই সম্ভব না হলে বরং কৌটোর দুধ খাওয়ানো ভাল।

প্রঃ কৌটোর দুধ খেলে বাচ্চার জিভে যে অনেক সময় ঘন দইয়ের মতো আস্তরণ পড়ে?

উঃ জিভে পুরু আস্তরণ পড়ে গেলে অনেক সময় মায়েরা পরিষ্কার কাপড়ে মধু দিয়ে ঘসে জিভ পরিষ্কার করে নেন। তাতে যদি না হয় মাউথ পেন্ট ব্যবহার করা যেতে পারে।

কথায় কথায় কাফ সিরাপ খাওয়াবেন না বাচ্চাকে

ডাঃ ত্রিদীব বন্দ্যোপাধ্যায়

দূরভাষ : ৪৬৪-৪৮৬০

প্র: বাচ্চার জ্বর হলে কী করব?

উ: জ্বর ১০১ ডিগ্রির বেশি হলে প্রথমে প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ খাইয়ে জ্বর খানিকটা কমিয়ে নিতে হবে। তারপর ডাক্তারের পরামর্শমতো চিকিৎসা চালু করবেন।

প্র: প্যারাসিটামলের শুনেছি নানা রকম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে?

উ: তেমন কিছু নেই। তাছাড়া বাচ্চার জ্বর বেড়ে গেলে সবথেকে জরুরি কাজ জ্বর কমানো। ঠাণ্ডা জলে স্নান করানো, মাথা ধুইয়ে দেওয়া বা গা স্পঞ্জ করানোর সঙ্গে সঙ্গে প্যারাসিটামল খাওয়ানোরও দরকার পড়তে পারে।

প্র: জ্বরের মধ্যে স্নান করালে বাচ্চার ঠাণ্ডা লেগে যাবে না?

উ: সচরাচর লাগে না। আর লাগলেও বেশি জ্বরে যে ক্ষতি হবে তার তুলনায় সর্দিকাশি সামলানো অনেক সহজ কাজ।

প্র: জ্বর হলেই তো অনেক বাচ্চার তরকা হয়। কী করা উচিত তখন?

উ: তরকা শুরু হওয়ামাত্র বাচ্চার মাথা একদিকে ফিরিয়ে শুইয়ে দিতে হবে, যাতে গ্যাঁজলা বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে। চামচ বা ওই জাতীয় কিছু মুখে ঢোকানো উচিত নয়। অবস্থা বুঝে শিরার মাধ্যমে বা রেকটালি ডায়াজিপাম দিতে হতে পারে। এসব সত্ত্বেও ১০ মিনিটের বেশি সময় ধরে তরকা চললে দ্রুত হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া দরকার।

এর সঙ্গে কয়েকটি সাবধানতা মেনে চলতে হবে। প্রথম, জ্বর বাড়তে না দেওয়া। প্যারাসিটামল বা প্যারাসিটামল আইবুপ্রফেন কম্বিনেশন হাতের কাছে রাখুন। বাচ্চাকে ঠাণ্ডা জলে মাথা ধুইয়ে, গা মুছিয়ে. দরকার হলে ফ্যানের নিচে শুইয়ে দিতে হবে। বাচ্চা যাতে ঘন ঘন জ্বরজারিতে আক্রান্ত না হয় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

প্র: জ্বরের ঘোরে হাত পা খিঁচতে থাকাই কি তরকা?

উ: তরকা হলে খিঁচুনি থাকবে। চোখ স্থির হয়ে হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে যাবে বাচ্চা। দাঁতে দাঁত লেগে জিভও কেটে যেতে পারে।

প্রঃ বাচ্চা মাঝে মধ্যেই পেটের অসুখে ভোগে, দুর্বল, খেতে চায় না। এসব কি জিয়ার্ডিয়ার উপসর্গ?

উঃ জিয়ার্ডিয়া হলে পেট ব্যথা, বারবার পায়খানার বেগ এবং দুর্গন্ধযুক্ত পায়খানা হবে। বেশিদিন ধরে চলতে থাকলে ম্যালঅ্যাবসরব্‌শন সিনড্রোম অর্থাৎ অপুষ্টিজনিত দুর্বলতা, খেতে ইচ্ছে না করা, রোগা হয়ে যাওয়া ইত্যাদি নানান উপসর্গ দেখা দিতে পারে। তবে প্রথম অবস্থাতেই পায়খানা পরীক্ষা করে চিকিৎসা চালু করে দিলে বাচ্চা সম্পূর্ণ ভাল হয়ে যায়।

প্রঃ আমাশাতেও তো একই ব্যাপার?

উঃ আমাশা হলে অবস্থা আরেকটু জটিল হয়। পায়খানার সঙ্গে আম এবং রক্ত থাকতে পারে। দু'ক্ষেত্রেই সাধারণ মল পরীক্ষাতে রোগ ধরা পড়ে। এবং চিকিৎসা চলে মেট্রোনিডাজোল, টিনিডাজোল ইত্যাদির সাহায্যে। তবে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া এসমস্ত ওষুধ বাচ্চাকে, খাওয়ানো উচিত নয়। অনেকে আছেন ঠিকঠাক স্বাস্থ্য-বিধি মেনে চলেন না। ফলে বাচ্চা বারবার জিয়ার্ডিয়াসিস বা অ্যামিবিয়াসিসে আক্রান্ত হয়। এবং মা বাবা মুড়ি মুড়কির মতো এ সমস্ত ওষুধ খাওয়াতে থাকেন। ফলে বাচ্চার বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, পড়াশোনা সবই বিঘ্নিত হয়।

প্রঃ কী সাবধানতা মেনে চললে বাচ্চাকে আমাশা বা জিয়ার্ডিয়ার হাত থেকে রক্ষা করা যাবে?

উঃ এ সমস্ত অসুখের ক্ষেত্রে সবসময়ই অসুবিধে বাধে জল থেকে। খেয়াল রাখতে হবে বাচ্চা যাতে ফোটানো জল ছাড়া অন্য কোনও জল না খায়। শাকসবজি ভাল করে ধুয়ে তবে রান্নার কাজে ব্যবহার করতে হবে। ফল এবং স্যালাডের ব্যাপারে আরও বেশি সতর্কতা দরকার। খাওয়ার আগে বাচ্চার হাত ভাল করে সাবান দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে।

প্রঃ বমি, পায়খানা, জ্বর ইত্যাদি সব যদি একসঙ্গে হয়?

উঃ ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের জন্য এরকম হতে পারে। জ্বর, বমি, পায়খানা শুরু হওয়া মাত্র তিনটি জিনিস চালু করতে হবে। বমি বন্ধ করার জন্য ডমপেরিডন ট্যাবলেট, জ্বর, গা হাত পা ব্যথা সামলাতে প্যারাসিটামল বা প্যারাসিটামল আইবুপ্রফেন কম্‌বিনেশন, এবং পেট খারাপের দরুণ শরীরের জলশূন্যতা রুখতে ওরাল রি-হাইড্রেশন থেরাপি। অনেক সময় খুব মারাত্মক পেট ব্যথা থাকে এর সঙ্গে। ব্যথা কমার ওষুধও তখন দেওয়া যেতে পারে। অবস্থা অনেকসময় এতেই সামাল দেওয়া যায়। দরকার হলে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে। তা সত্ত্বেও বাড়াবাড়ি হলে অর্থাৎ উপসর্গ কমছে না এবং সঙ্গে জলশূন্যতা বাড়ছে ধীরে ধীরে, হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়াই ভাল।

প্রঃ জলশূন্যতা শুরু হচ্ছে কী করে বুঝব?

উঃ বমি পায়খানা বন্ধ হচ্ছে না এবং ৪-৬ ঘণ্টা বাচ্চা প্রস্রাব না করলে বুঝতে হবে জলশূন্যতা শুরু হতে চলেছে। এর সঙ্গে আরও কয়েকটি উপসর্গ দেখা দেবে।

(১) ক্লান্তি, বাচ্চা চোখ মেলে চাইতে পারছে না।

(২) চামড়ায় সামান্য কোচকানো ভাব। চামড়া আঙুলে টেনে ছেড়ে দিলে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে একটু বেশি সময় লাগবে।

নাড়ির গতি, এবং রক্তচাপ কমে যাবে, বাচ্চার বয়স ১ বছরের নীচে হলে মাথার তালু সামান্য বসে যেতে পারে।

প্রঃ পেটের অসুখ চললে বাচ্চাকে দুধ দেওয়া বারণ?

উঃ হ্যাঁ, এসময় বাচ্চার দুধ হজম করার ক্ষমতা কমে যায়। অসুখ ঠিক হয়ে যাওয়ার পরও কিছুদিন দুধ বন্ধ রাখা দরকার। ফলের রস কিছুদিন দেবেন না। মুড়ি, চিড়ে সেদ্ধ, গলা ভাত, আলু সেদ্ধ, কাঁচকলা সেদ্ধ, খিচুড়ি বা ছোট মাছের হালকা ঝোল ভাত দেওয়া যেতে পারে। নুন চিনির সরবৎ, ঘোল ইত্যাদি সহ্য হলে খাবে। আর খাবে বেশি করে জল।

প্রঃ সর্দি কাশি হলে বাচ্চাকে কাফ সিরাপ খাওয়ানো যেতে পারে?

উঃ খাওয়াতে হতে পারে। তবে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে নেবেন। কারণ কাফ সিরাপ দু'ধরনের। কাফ সিডেটিভ এবং এক্সপেকটোরাণ্ট। শুকনো খুসখুসে কাশি কমাতে কাফ সিডেটিভ দেওয়া হয়। আর জমা সর্দি বার করতে এক্সপেকটোরাণ্ট। বিচারে ভুল হয়ে গেলে বিপত্তি বাধতে পারে।

প্রঃ সব বাচ্চারই তো একবার করে মাম্পস, হাম বা জলবসন্ত হয়। এ সময় কী করা উচিত?

উঃ সব বাচ্চারই একবার করে হবে এমন কোনও কথা নেই। যাই হোক, হাম, মাম্পস বা জলবসন্ত সবের ক্ষেত্রেই শরীরে র‍্যাশ, জ্বর, মাথাব্যথা, সর্দি কাশি ইত্যাদি নানান উপসর্গ থাকে। জ্বর মাথাব্যথা কমাতে প্যারাসিটামল এবং সর্দি কাশির জন্য অ্যাণ্টিহিস্টামিনিক কিছু খাওয়ানো যেতে পারে। ২-৩ সপ্তাহ আলাদা করে রাখা দরকার। স্নান বেশি না করাই ভাল। ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। খাবার হওয়া উচিত হাল্‌কা সহজ পাচ্য। কিছু ক্ষেত্রে অন্যান্য সংক্রমণ এড়াতে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হয়।

তালু অপারেশনের পর স্পিচ থেরাপি করাতে হবে

অধ্যাপক (ডাঃ) অমিত গঙ্গোপাধ্যায়

দূরভাষ : ২৮২-৯৭১৬

প্র: ঠোঁট, মাড়ি বা তালু কাটা বাচ্চা জন্মালে মা বাবাকে কী করতে হবে?

উ: বাচ্চার স্বাস্থ্য ভাল রাখার চেষ্টা করতে হবে। এবং দু' এক মাসের মধ্যে প্লাস্টিক সার্জেনের সঙ্গে যোগাযোগ করে অপারেশনের দিন এবং জায়গা ঠিক করে রাখতে হবে। দুশ্চিন্তা করার দরকার নেই। ঠিকঠাক অপারেশন হলে বাচ্চা পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যাবে।

প্র: এই ধরনের বাচ্চারা তো জন্ম থেকেই নাক কান গলার সংক্রমণে ভুগতে থাকে। স্বাস্থ্য ঠিক রাখাও এক সমস্যা।

উ: ঠোঁট, মাড়ি কাটা থাকলে এ সমস্যা তেমন হয় না। বিপদ হয় তালু কাটা হলে। তালু কাটা মানে নাকের পেছন দিক আর মুখের মাঝে কোনও আড়াল নেই। ফলে অনবরত নাকের শ্লেষ্মা গলায় চলে আসে। খাবার চলে যায় নাকে কানে। এক জায়গার সামান্য সংক্রমণ ছড়ায় চতুর্দিকে। এই সমস্ত বাচ্চার পরিচর্যা খুব সাবধানে করা দরকার। কারণ অপারেশনের ধকল সামলানোর জন্য স্বাস্থ্য ভাল থাকা জরুরি।

প্র: অপারেশন কি দু'এক মাসের মধ্যেই করতে হবে, একটু বড় হলে করালে চলবেনা?

উ: ঠোঁট এবং মাড়ি কাটা থাকলে অপারেশন করা উচিত ৩-৪ মাস বয়সের মধ্যে। তালুর বেলায় ৯-১০ মাস নাগাদ।

প্র: অনেক সময় যে বাচ্চা জন্মানোর পরই অপারেশন করা হয়?

উ: ঠোঁট এবং মাড়ি কাটা থাকলে অনেকে জন্মের ঠিক পরপরই ঠোঁট জুড়ে দেন। এর মূল কারণ মাড়ির উপর ঠোঁটের চাপ বজায় রাখা যাতে মাড়ি উঁচু হয়ে না যায়। সেক্ষেত্রে ৩-৪ মাস পরে আবার অপারেশন করে মাড়ি জুড়তে হয় এবং ঠোঁটের গঠন ঠিক করার জন্য ঠোঁটের উপরও কিছু কারিগরী করবার দরকার পড়ে।

প্র: জন্মের ঠিক পরে মাড়ি অপারেশন করা যায় না?

উ: না, মাড়ি অপারেশনের জন্য ৩-৪ মাস বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। তাই অধিকাংশ

সময় ঠোঁট এবং মাড়ি দুইই একেবারে ৩-৪ মাস বয়স নাগাদ অপারেশন করা হয়।

প্র: সে ক্ষেত্রে তো মাড়ি উঁচু হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে?

উ: তা থাকে। তবে বিশেষজ্ঞ দাঁতের ডাক্তার দিয়ে ৭-৮ বছর বয়স থেকে অর্থোডিনটিক চিকিৎসা চালু করে দিলে সে অসুবিধে দূর করা যায়।

প্র: কিন্তু সব কিছু সত্ত্বেও স্বাভাবিক সুন্দর চেহারা ফিরে আসেনা কেন?

উ: কিছুটা ঘাটতি থেকেই যায়। একে বলে 'ক্লেফ্ট লিপ ফেস ডিফরমিটি'। ব্যাপারটা কিন্তু অপারেশনের কোনও ত্রুটির জন্য হয় না। অপারেশন করে ঠোঁট একদম ঠিক করা যায়। অর্থোডিনটিক ট্রিটমেণ্ট করে দাঁত, মাড়ির সমস্যা দূর হয়। কিন্তু জন্মগত ভাবেই এদের যে দিকের ঠোঁট এবং মাড়ি কাটা সে দিকের গালের হাড়ে কিছু ত্রুটি থাকে। যা ঠিক করা সচরাচর আমাদের ক্ষমতার বাইরে।

প্র: তালু অপারেশনের পর বাচ্চার কথা বলতে অসুবিধে হয়?

উ: কথা সৃষ্টিতে তালুর ভূমিকা বিরাট। ঠিকভাবে অপারেশন হলে কথা বলতে পারার কথা। অসুবিধে হলে বুঝতে হবে কোথাও কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে। তবে সাধারণভাবে তালু অপারেশনের পর ১ বছর বয়স থেকে নিয়মিত স্পিচ থেরাপি করানো দরকার। তাহলে স্পষ্টভাবে কথা বলতে কোনওরকম অসুবিধে আর থাকবে না।

প্র: মানসিক প্রতিবন্ধী বাচ্চাদের অনেকসময় কান থাকে না। এদের কান তৈরি করে দেওয়া যায়?

উ: বানিয়ে দেওয়া যায়। তবে এর ফলাফল কিন্তু তেমন ভাল কিছু নয়। কান দু'ভাবে বানানো যেতে পারে। সিলিকনের তৈরি নকল কান বসিয়ে বা বুক থেকে কার্টিলেজ তুলে কান বানিয়ে। সিলিকনের কানে প্রচুর ঝামেলা কাজেই কার্টিলেজ দিয়ে কান বানানোর পদ্ধতিই অধিকাংশক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়। মোটামুটি ৩-৪ টে সিটিং লাগে, ১ বছরে, ৭-৮ বছর নাগাদ এবং বছর দশেকের মাথায়।

প্র: বানানো কান দিয়ে শুনতে পাওয়া যায়?

উ: অধিকাংশ সময় এদের মাঝের কান বা মধ্য কর্ণে বড় ধরনের ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে। ফলে কান বানানোর সময় নাক কান গলা বিশেষজ্ঞেরও সাহায্য নিতে হয়। কিন্তু মাইক্রোসার্জারি করেও সবসময় ভাল ফল হয় না।

প্র: হাতের পায়ের আঙ্গুলও তো অনেক সময় জোড়া থাকে?

উ: হ্যাঁ নানারকমভাবে এটা হতে পারে। দু'একটা আঙ্গুল জোড়া থাকতে পারে। আবার সব কটা আঙ্গুলই থাবার মতো পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে থাকতে পারে। এসব ক্ষেত্রে জোড়া মাঝ বরাবর কেটে দিয়ে স্কিন গ্রাফটিং করা হয়।

প্র: কত বছর বয়সে এই অপারেশন করা যায়?

উ: সাধারণত ৫-৬ বছর বয়স নাগাদ, তবে আঙ্গুল বেকে থাকলে আগেও করতে হতে পারে।

বাচ্চার সমস্যা দূর করতে মা-বাবারও সাইকোথেরাপি জরুরি

ডাঃ দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়

দূরভাষ : ৯৮৩০০-৬০৭০২

প্র: বাচ্চা মিথ্যে কথা বলছে, পড়াশোনায় মন নেই। কী করব?

উ: বাচ্চার আচরণগত ত্রুটি ওষুধপত্রের সাহায্যে ঠিক করা যায় না যদি না এর পেছনে দুশ্চিন্তা বা অবসাদ জাতীয় কোনও সমস্যা লুকোনো থাকে। এসব ক্ষেত্রে দরকার হয় সাইকোথেরাপি এবং কাউন্সেলিংয়ের। বাচ্চা, বাবা, মা প্রত্যেকের। কিছুক্ষেত্রে পরিবেশ পরিস্থিতিরও পরিবর্তন করতে হয়।

প্র: বাচ্চার সমস্যা দূর করতে মা বাবার সাইকোথেরাপি?

উ: হ্যাঁ। তার কারণ অধিকাংশ সময় বাচ্চার মধ্যে সমস্যার সৃষ্টি হয় মা বাবা এবং পারিপার্শ্বিকের জন্য। আচরণগত সমস্যা নিয়ে যে সমস্ত বাচ্চা আমাদের কাছে আসে তাদের অনেকের পরিবারেই কিছু না কিছু ঝঞ্ঝাট থাকে। যেমন—

(১) বাবা মার মধ্যে বনিবনার অভাব

(২) তাঁদের কারও কোনও মানসিক সমস্যা

(৩) বাবা বা মার মধ্যে কেউ ড্রাগ অ্যাডিক্ট অথবা অ্যালকোহলিক

(৪) বাড়িতে ডিসিপ্লিনের অভাব, দিনরাত ঝগড়া অশান্তি

(৫) বাচ্চার ওপর জোর জবরদস্তি করা, বেশি চাহিদা থাকা

(৬) মা বাবার এক সঙ্গে না থাকা

ইত্যাদি অজস্র বিষয়ের প্রভাব পড়ে বাচ্চার উপর। তার প্রকাশ একেক বাচ্চার ক্ষেত্রে একেকভাবে হয়। কেউ অবসাদগ্রস্থ হয়ে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। অবসাদের কারণেই কেউ আবার খিটখিটে হয়ে যায়। বাবা মার মাত্রাতিরিক্ত চাহিদা মেটাতে কারোর মধ্যে দুশ্চিন্তার জন্ম হয়। কারোর মধ্যে নানারকম আচরণগত সমস্যা দেখা দেয়।

প্র: কী রকম?

উ: আচরণগত সমস্যা হাজার একটা হতে পারে। যেমন

(১) অবাধ্যতা

(২) কারণে অকারণে মিথ্যে বলা

(৩) পড়াশোনায় অমনোযোগ

(৪) স্কুল পালানো

(৫) সবাইকে বিরক্ত করা

(৬) ছোটদের, বয়স্কদের মারধর করা

(৭) অতিরিক্ত চাহিদা এবং না পেলে চেঁচামেচি, অশান্তি করা

(৮) টাকা পয়সা চুরি করা ইত্যাদি।

এই সব আচরণগুলির মধ্যে এক বা একাধিক বাচ্চার মধ্যে থাকলে বুঝে নিতে হবে তার চরিত্রে আচরণ গত সমস্যা আছে।

প্র: কিন্তু এর এক বা একাধিক তো সব বাচ্চার মধ্যেই থাকে। বিশেষ করে অবাধ্যতা পড়াশোনায় অমনোযোগ বা চাহিদা?

উ: সেতো সব কটাই অল্প বিস্তর সবার মধ্যে থাকবে। মাত্রা ছাড়ালে তবেই তা আচরণগত সমস্যা। উদাহরণ দিই। বাচ্চাকে স্নানে যেতে বললেন। প্রথম দু'বার সে গেল না। কিন্তু তৃতীয়বার একটু বকাঝকা করতে চলে গেল। অর্থাৎ জোর দিয়ে বললে তার সাহস হচ্ছে না সেটা অমান্য করতে। পড়তে বসার জন্য রোজই মনে করিয়ে দিতে হয়। বসার পরও একশ বার 'জল খাব', 'বাথরুম যাব' ইত্যাদি নানান বাহানা। কিন্তু কোনও দিন আপনার মন মেজাজ যদি খারাপ থাকে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও মোটামুটি চুপচাপ পড়ে নেয় বাচ্চা। বা নানা জিনিসের জন্য বায়না করে, কিন্তু বুঝিয়ে বা বকে প্রায় সময়ই থামিয়ে দিতে পারা যায়। এগুলি সবই স্বাভাবিকের পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু স্নানের জন্য যদি বারবার বলতে হয় বা রোজই স্নানে পাঠাতে চেঁচামেচি, মারধর করার দরকার পড়ে বুঝতে হবে বাচ্চার মধ্যে আচরণ গত সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে বা হয়ে গেছে। চাহিদা যদি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে যা চাইবে তৎক্ষণাৎ তা দিতে হবে নাহলে বাচ্চা ভাঙচুর করবে, কি তুমুল কান্নাকাটি করবে, কি খাওয়া বন্ধ করে দেবে, অবশ্যই তার মধ্যে সমস্যা দেখা দিয়েছে। পড়াশোনার ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। বলে বলেও পড়তে বসানো যাচ্ছে না, রেজাল্ট খারাপ হচ্ছে কিন্তু তা নিয়ে ভ্রূক্ষেপ নেই বাচ্চার। পরবর্তী ধাপে সে মিথ্যে কথা বলবে, স্কুল পালাতে শুরু করবে। অর্থাৎ একটি সমস্যা দেখা দিলে তার সঙ্গে লাইন বেঁধে হাজারটা সমস্যা এসে হাজির হবে।

প্র: এসব ক্ষেত্রে কী করব?

উ: বাচ্চার আচার আচরণ বিচ্যুতি দেখা দিলে সচেতন হয়ে যান। বকাঝকা বা মারধর না করে সমস্যার গভীরে ঢোকবার চেষ্টা করুন। প্রথমে খেয়াল করে দেখুন বাচ্চার মধ্যে কবে থেকে এই জাতীয় সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। ঠিক সেই সময় বা আগে বাড়িতে বা স্কুলে কোনও সমস্যা হয়েছিল কিনা। বাচ্চা যাঁদের সঙ্গে ওঠবোস করে যেমন মা, বাবা, ভাই, বোন, পিসি, দাদু, ঠাকুমা এদের মধ্যে কোনও সমস্যা দেখা দিয়েছে

কিনা। বাড়িতে বাবা মার মধ্যে ঝগড়া অশান্তি বেড়ে গেলে বাচ্চার মধ্যে নিরাপত্তার অভাব দেখা দিতে পারে। অন্যদের জ্বালাতন করা, অবাধ্যতা, পড়াশোনা না করা, মিথ্যে কথা বলা সব কিছু সম্ভব এই অবস্থায়। ডিসিপ্লিনের অভাব থেকে যেমন সমস্যা দেখা দেয়, অতিরিক্ত চাপ এবং চাহিদার ফলেও বাচ্চার মধ্যে অশান্তি, উদ্বেগের জন্ম হতে পারে। বেশি শাসন যেমন বাচ্চাকে বিদ্রোহী করে তুলতে পারে, সবসময় আগলে আগলে রাখলেও সমস্যা দেখা দেওয়া সম্ভব। এর আবার তৃতীয় আরেকটি দিক আছে। বাবা হয়তো খুব শাসন করেন, মা আগলে রাখেন। বা মা শাস্তি দিতে গেলে ঠাকুমা, দিদিমা বাধা দেন। শুধুমাত্র শাসন বা আগলানোর চেয়ে এ কিন্তু আরও খারাপ। খারাপ ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে সবসময় বাচ্চার পেছনে লেগে থাকাও। বাচ্চাকে সুস্থ রাখতে চাইলে বাবা মা এবং বাড়ির অন্যদের এ সমস্ত অভ্যেস পরিবর্তন করতে হবে।

আর একটি ব্যাপার বিশেষ করে খেয়াল রাখা দরকার। স্বামী স্ত্রী হয়তো ঝগড়াঝাটির জন্য নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বন্ধ করে আছেন, দরকারি কথা চলছে বাচ্চার মাধ্যমে। অথবা বাচ্চার সামনেই দু'জন দু'জনকে যাচ্ছেতাই ভাবে গালমন্দ করে যাচ্ছেন। খুব অল্পদিনের মধ্যেই এইসব অশান্তির প্রভাব কিন্তু বাচ্চার উপর পড়বে। বাচ্চার খাতিরে বাচ্চার সামনে ঝগড়াঝাটি বন্ধ করুন। তা সম্ভব না হলে বরং আলাদা হয়ে যান। দিনরাত অশান্তির চেয়ে এই ব্যবস্থা বোধহয় তুলনামূলকভাবে ভাল। অন্তত বাচ্চার জন্য।

প্রঃ কিন্তু মা বাবা একসঙ্গে না থাকলেও তো বাচ্চার মধ্যে আচরণগত সমস্যা দেখা দিতে পারে?

উঃ পরিসংখ্যান তাই বলে বটে। তবে এক্ষেত্রে কারণ বোধহয় বাবা বা মার একা থাকা নয়। তাঁদের ব্যক্তিত্বের সমস্যা। একা থাকা মহিলা বা পুরুষের মধ্যে অধিকাংশ সময় উদ্বেগ, অশান্তি, অস্থিরতা, হতাশা, অনিশ্চয়তা ইত্যাদি মিলেমিশে এক জটিল মানসিক অবস্থার জন্ম হয়। যার ফলে তাঁদের আচার আচরণে অনেক সময়ই পারম্পর্য রক্ষা হয় না। ফলে বাচ্চা মানসিকভাবে সুস্থির হতে পারেনা। কিন্তু একা মহিলা বা পুরুষ নিজে যদি সমস্যামুক্ত থাকেন, বাচ্চাকে ঠিকভাবে দেখভাল করেন, বাচ্চার সমস্যা তেমন হওয়ার কথা নয়।

প্রঃ মিথ্যে কথা বলা, অন্যকে মারধোর করা বা স্কুল পালানো সাইকোথেরাপি করে ঠিক হয়ে যাবে?

উঃ সাইকোথেরাপি ওষুধ নয়। দিলাম আর পরদিন বাচ্চা ভাল হয়ে গেল তেমন হবে না। সাইকোথেরাপিস্ট বাবা মায়ের সঙ্গে বসে বাচ্চার ক'টা আচরণে অসঙ্গতি আছে তার একটা তালিকা তৈরি করবেন। এবার তাকে সাজানো হবে গুরুত্ব অনুযায়ী। একে বলে বিহেভিয়ার চেকলিস্ট। এবার সেই সব সমস্যা একে একে দূর করার জন্য বাবা মা বা বাড়ির অন্য লোকজনেরা কীভাবে বাচ্চার সঙ্গে ব্যবহার করবেন সেটা শেখাবেন থেরাপিস্ট। একটা পদ্ধতির কথা বলি। একে বলে টাইম আউট-টেকনিক। এতে বাচ্চাকে খানিকটা আলাদা করে দেওয়া হয়। তার চেঁচামেচি, কান্না, অন্যকে বিরক্ত

করা বা আবদার কোনওটাকেই আর তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। প্রথম দিকে গুরুত্ব আদায় করার জন্য বাচ্চা নানারকম বাড়াবাড়ি করতে থাকে। বেশি অশান্তি করা, ভাঙচুর করা, অবাধ্যতা, খাওয়া বন্ধ করে দেওয়া ইত্যাদি নানান কিছু করেও যখন সে দেখে যে কিছু করেই আর কারও মনোযোগ আকর্ষণ করা যাচ্ছে না তখন তার মধ্যে একটা পরিবর্তন আসে। এই পরিস্থিতিতে সাইকোথেরাপি খুব ভাল কাজে আসে। বাচ্চা চাইছে সবার কাছে আগের মতো গুরুত্ব পেতে। থেরাপিস্ট তাকে বলছেন কী কী অভ্যেস পরিবর্তন করলে আবার সব আগের মতো হবে। মা বাবা থেরাপিস্টের কাছে শিখছেন এই পরিস্থিতিতে কীভাবে বাচ্চার সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে।

পুরো ব্যাপাবটা যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ। এবং প্রচুর ধৈর্য ধরতে হয় বাবা মাকে। কিছুটা ত্যাগ স্বীকারও করতে হয়।

প্র: কতদিন মোট সময় লাগবে?

উ: সেটা অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে। বাচ্চার মধ্যে কতটা সমস্যা দেখা দিয়েছে, কী ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছে, বাড়ির লোকজন কতটা সাহায্য করছেন ইত্যাদি। তাও মোটামুটি ৩-৬ মাস সময় লাগতে পারে।

প্র: যদি সমস্যা স্কুলে হয়?

উ: যদি স্কুলের পরিবেশ বাচ্চা মানিয়ে নিতে না পারে, অনেক সময় সাধারণ মানের ছাত্র খুব ভাল স্কুলে পড়লে তার মধ্যে হীনম্মন্যতা দেখা দিতে পারে, সেখান থেকে আরও অন্যান্য সমস্যা, স্কুল পাল্টে দিলে সমস্যা মিটে যায়। প্রথমেই অবশ্য স্কুল পাল্টানোর কথা ভাবা হয় না। বাচ্চাকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কীভাবে মানিয়ে চলতে হবে তা শেখানো হয়। যদি দেখা যায় অন্যত্র বাচ্চা ভালভাবেই মানিয়ে নিতে পারছে কিন্তু অসুবিধে হচ্ছে স্কুলে তখন স্কুল বদলানোর কথা ভাবা হয়।

প্র: অনেকে বলেন বাচ্চা চাওয়া মাত্র সব জিনিস দিয়ে দিলে বাচ্চা বিগড়ে যায়।

উ: বাচ্চাকে যিনি বড় করে তুলবেন তাঁর মধ্যে কিছুটা দৃঢ়তা ও কর্তৃত্ববোধ থাকা দরকার। চাওয়ামাত্র সব জিনিস দেওয়া যেমন ঠিক নয়, ঘ্যান ঘ্যান করার পর দেওয়া আরও খারাপ। প্রথমে দেখে নিন কোন জিনিস দেওয়া আপনার আয়ত্তের মধ্যে। সেটা চাইলে একবার চাওয়ার পরই দিয়ে দিন। আর দেবেন না মনস্থ করলে বাচ্চাকে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিন কেন আপনি সেটা তাকে দিতে চাইছেন না। বোঝানোর পর বাচ্চা কান্নাকাটি, লাফালাফি যতই করুক সেদিকে আর নজর দেবেন না।

দেওয়া দেওয়ির ব্যাপারে পুরস্কার-শাস্তি প্রথা চালু করতে পারেন। হয়ত বাচ্চা সাইকেল চাইল, বলুন পরীক্ষায় আগের চেয়ে ভাল ফল করলে কিনে দেবেন। অনেক সময় এতে বাচ্চারা ভাল কাজ করতে উৎসাহ পায়। তবে ব্যাপারটা যেন বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখবেন।

প্র: কিছু বাচ্চা আছে ৩-৪ বছর বয়স থেকেই উৎপাত করে সবাইকে পাগল করে দেয়। এত ছোট বাচ্চার সাইকোথেরাপি করা যায়?

উ: এদের হাইপার অ্যাকটিভ বা হাইপার কাইনেটিক বলে। রোগটার নাম অ্যাটেনশন ডেফিসিট হাইপার অ্যাকটিভিটি ডিসঅর্ডার। এদের মূল সমস্যা মনঃসংযোগের

মারাত্মক অভাব। যার ফলে ২-৪ মিনিটের বেশি কোনও জায়গায় বা কোনও খেলাধুলাতেও এরা আটকে থাকতে পারে না। এদের তাৎক্ষণিক আবেগও মারাত্মক। হঠাৎ মনে হল তো রাস্তায় চলে গেল বা ছাদে উঠে পড়ল কি আগুনে হাত দিয়ে দিল। অ্যাক্সিডেন্টের সম্ভাবনা এদের ক্ষেত্রে খুব বেশি। তবে এসময় কিন্তু মা বাবা এদের নিয়ে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে সচরাচর আসেন না। আসেন আরেকটু পরে, ৮-৯ বছর বয়সে। তখন সমস্যা পড়াশোনায় মন নেই। হাইপার কাইনেটিক বাচ্চাদের ওষুধপত্র এবং বিহেভিয়ার থেরাপির সাহায্যে ভাল করে তোলা যায়।

প্রঃ কিছু বাচ্চা দুষ্টুমি হয়তো করে না কিন্তু ঘ্যান ঘ্যান করে বা দিনরাত পায়ে পায়ে ঘুরে বিরক্ত করে । এদের জন্য কোনও থেবাপি নেই?

উঃ কোনও কারণে বাচ্চার মধ্যে অবসাদ দেখা দিলে এরকম হতে পারে। কারণ খুঁজে বাব করে তার সমাধান করে এবং ওষুধপত্রের সাহায্যে অবস্থা সামলে ফেলা যায়।

প্রঃ বাচ্চার সব দুষ্টুমির পিছনেই কি কারণ থাকে?

উঃ কারণ হয়তো থাকে। তবে তা মারাত্মক নাও হতে পারে। নজর কাড়বার জন্য বাচ্চা কাঁদবে, দুষ্টুমি করবে এ তো স্বাভাবিক। তবে এটা যেন অভ্যেসে পরিণত না হয়।

সেলিব্রিটিদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি

অধ্যাপক (ডাঃ) ধীরেন নন্দী

দূরভাষ : ৪৬৬-৪৮৫৮

প্রঃ মোটা মানুষেরা নাকি বেশি ডিপ্রেশনে ভোগেন?

উঃ না, ডিপ্রেশন ঠিক নয়, মোটা, ঘাড়ে গর্দানে, কথা বলতে বা খেতে ভালবাসে, আমুদে মানুষদের বাইপোলার মুড ডিসঅর্ডারে ভোগার সম্ভাবনা বেশি।

প্রঃ বাইপোলার মুড ডিসঅর্ডার মানে কী?

উঃ মানুষের বিভিন্ন সময় মনের ভাবের পরিবর্তন হয়। কোনও ভাল ঘটনা ঘটলে ভাল লাগে, খারাপ কিছু ঘটলে মন খারাপ হয়ে যায়। অনেক সময় খারাপ লাগা ভাল লাগার তেমন কোনও কারণও থাকে না। কিন্তু খুব বেশি খারাপ লাগা যদি কয়েক সপ্তাহ ধরে থেকে যায় — তাকে বলে ডিপ্রেশন বা অবসাদ। এবং মারাত্মক আনন্দ যদি ওরকম কয়েক সপ্তাহ থাকে — তাকে বলে ম্যানিয়া। কারও কারও মধ্যে অবসাদ এবং ম্যানিয়া পর্যায় ক্রমে আসে। এবং এর সঙ্গে কিছু শারীরিক এবং মানসিক উপসর্গ যোগ হয়। একে বলে বাইপোলার মুড ডিসঅর্ডার।

প্রঃ কিন্তু আপনজন কেউ মারা গেলে বা খুব দামি জিনিস হারিয়ে গেলে তো খারাপ লাগা সপ্তাহ ছেড়ে মাসে গড়িয়ে যায়। এঠাও কি অবসাদ?

উঃ বড় ধরনের দুর্ঘটনা হলে দুঃখের রেশ ৩ মাস পর্যন্ত থাকতে পারে। ৩ মাস পেরিয়ে গেলে তবে ভাবতে হবে অবসাদে আক্রান্ত হয়েছে কিনা।

প্রঃ কঠিন অসুখে ভুগলে যে মানসিক কষ্ট হয় সেটা কি অবসাদ?

উঃ হতে পারে। দু'রকম ভাবে এই অবসাদ আসতে পারে। প্রথম, কোনও মানুষ যখন জানতে পারেন দুরারোগ্য কোনও অসখে তিনি ভুগছেন, ভয়ানক মানসিক ধাক্কা পান। প্রথমেই মনে হয়, রোগটি তাঁর হতে পারে না। এটা ডিনায়েল ফেজ। কিন্তু একসময় যখন মানতে বাধ্য হন যে রোগটি হয়েছে, অধিকাংশ মানুষের মধ্যে হতাশা দেখা দেয়। এ এমন একটা অবস্থা যার থেকে পরিত্রাণের পথ নেই, লার্নড হেল্পলেসনেস, সেখান থেকে অবসাদ দেখা দেয়।

দ্বিতীয়, বেশ কিছু অসুখ আছে যাদের সঙ্গে কখনও কখনও অবসাদ উপসর্গ হিসেবে থাকে, যেমন মৃগী, ব্রেন টিউমার, এনকেফেলাইটিস, এস এল ই, হেপাটাইটিস, কিছু মানসিক রোগ যেমন স্কিজোফ্রেনিয়া, স্মৃতিভ্রংশতা ইত্যাদি। হাইপোথাইরয়েডিজ্‌ম, অ্যানিমিয়া ইত্যাদির সঙ্গেও অবসাদ জড়ানো থাকতে পারে।

প্র: রক্তচাপ কমানোর ওষুধ খেলে অবসাদ দেখা দিতে পারে?

উ: সব ওষুধে নয়। এখন যে সমস্ত ওষুধ ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে মিথাইল ডোপা, প্রপ্রানোলল ইত্যাদি গোত্রের ওষুধে কারোর কারোর মধ্যে অবসাদ দেখা দেয়। ওষুধ বদলে দিলে সমস্যা দূর হয়ে যায়।

প্র: ম্যালেরিয়ার পর অনেকে খুব উদ্‌ভ্রান্ত আচরণ করেন। এটা কি ম্যানিয়া?

উ: হ্যাঁ, ম্যালেরিয়ার কিছু ওষুধেব ফলে কারোর কারোর মধ্যে সাময়িকভাবে এই সমস্যা দেখা দিতে পারে। অ্যাজমা, টিউবারকুলোসিস ইত্যাদির জন্য যাঁদের নিয়মিত কর্টিকোস্টেরয়েড খেতে হয় তাঁদের কারোর মধ্যেও ম্যানিয়া দেখা দেয়।

প্র: গর্ভনিরোধক বড়ি অবসাদের জন্ম দেয়?

উ: কিছু ক্ষেত্রে।

প্র: অবসাদ হলে খিধে, ঘুম সব কমে যায়?

উ: অবসাদের মাত্রার উপর নির্ভর করে খিধে, ঘুম কমে যাওয়া থেকে শুরু করে একদম চলে যেতে পাবে। এবং শুধু খিধে ঘুম নয়, কমে যেতে পারে কাজ করার তাগিদ এবং শারীবিক ইচ্ছেও। বেশ কিছু শারীবিক এবং মানসিক অসুবিধে এই সময় দেখা দিতে পারে। মাথা ব্যথা, কোমর গা হাত পা ব্যথা, পেটের গণ্ডগোল, কিছু ভাল না লাগা, নিজেকে অসহায়, অকর্মণ্য লাগা। দুশ্চিন্তা, আতঙ্ক বা মায়া মমতা বোধ করতে না পারার উপসর্গ নিয়েও আসেন অনেকে।

মাথা ব্যথা বা পেট ব্যথা কারোর ক্ষেত্রে এত তীব্র হয় যে অনেকে কেবল এইসব উপসর্গ নিয়েই এসে হাজির হন। পরিসংখ্যান থেকে দেখা গেছে শতকরা ৬০ ভাগ মাথা ব্যথার কারণ অবসাদ।

প্র: সেক্ষেত্রে সঠিক রোগ ধরা তো বেশ মুশকিল?

উ: রোগী যদি বলেন তাঁর মন মেজাজ ঠিক থাকে না তাহলে কিছু সুবিধে হয়। কিন্তু অনেক সময়ই সেটা হয় না। কেউ হয়ত এসে বললেন পেট ব্যথা, কি মাথা ব্যথা বা শারীরিক ইচ্ছে কমে যাচ্ছে। পরীক্ষা করে কিছুই পাওয়া গেল না। অথচ রোগী তাঁর মানসিক কষ্টের কথা নিজে থেকে বলছে না। তখন ডাক্তারের উচিত বোগীর মানসিক অবস্থার খবর নেওয়া। অনেক সময় আবার রোগী এসে কেবল অবসাদের কথা বলেন কিন্তু তার পেছনে লুকনো থাকে শারীরিক সমস্যা। প্যানক্রিয়াটিক ক্যান্সার, থাইরয়েডের অসুখ বা অ্যানিমিয়ায় এরকম হতে পারে। তাই অবসাদ নিয়ে এলেও রোগীকে ভাল কবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয়।

প্র: সে জন্যই কি অনেক সময় পেটের অসুখের চিকিৎসা করাতে গিয়ে অশান্তি কমানোর ওষুধ বা ঘুমের ওষুধ নিয়ে বাড়ি আসতে হয়?

উ: অশান্তি, উদ্বেগ, অবসাদের ফলে পেটের অসুখ হয় অনেক সময়। আবার ইরিটেবল

বাওয়েল সিনড্রোমে অশান্তি বাড়লে কষ্ট বাড়ে। সে সময় উপসর্গের চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে উদ্বেগ অথবা অবসাদের চিকিৎসাও করতে হয়।

প্র: ম্যানিক ফেজে কী ধরনের সমস্যা হয়?

উ: ম্যানিক ফেজে খিধে, কাজের উৎসাহ এবং শরীরের চাহিদা সবই খুব বেশি মাত্রায় বেড়ে যায়। সব সময় উত্তেজিত ভাব। ঘুম প্রায় নেই, বড় বড় কথা, তাঁর মতে সায় না দিলে রাগারাগি ইত্যাদি তবে ব্যাপাবটা যদি দু' চার দিন থাকে বা স্বল্প মাত্রায় থাকে চিন্তার কিছু নেই। চিন্তা করতে হবে তখনই যখন উপসর্গগুলি খুব বাড়াবাড়ি রকমের হবে এবং কয়েক সপ্তাহ একটানা থাকবে। এর ফলে স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে অবসাদ আসে।

প্র: ম্যানিক ফেজে কি অঘটন ঘটতে পারে?

উ: অতি উৎসাহের ফলে ভুল পদক্ষেপ নিযে ফেলতে পারে। আমরা সাধারণত এই ধরনের রোগীর একার নামে ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট করতে বারণ করি। এবং ওষুধ পত্রের সাহায্যে বাড়াবাড়ি বন্ধ রাখাব চেষ্টা করি।

প্র ম্যানিক ফেজে বোগী আত্মহত্যা কবতে পারে?

উ: না আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে অবসন্ন অবস্থায়।

প্র: আত্মহত্যাব প্রবণতা দেখা দিলে কী সাবধানতা নিতে হবে?

উ: অবসাদেব সময় একাকিত্ব বা সম্পর্কেব টানাপোড়েন মানুষকে অস্থির কবে তোলে। তাব ফল আত্মহত্যার চেষ্টা। প্রথম পর্যায়ে আসে কেবল ভাবনা। এই ধরনের মনোভাব আঁচ করতে পারলে ইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। নাহলে অঘটন ঘটে যেতে পারে। দ্বিতীয় ধাপে, মনস্থির করে নিয়ে রোগী মরবার উপায় খুঁজতে শুরু করে। তৃতীয় ধাপে সত্যি সত্যি আত্মহত্যা করে বসে। অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট থেরাপি চলাকালীনও সপ্তাহ দুয়েকের মাথায় আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দিতে পারে। সে সময় আত্মীয়স্বজনের সতর্ক থাকা দরকার।

প্র: অবসাদ কি মেয়েদের বেশি হয়?

উ: হ্যাঁ।

প্র: কেন?

উ: অবসাদ দু'ধরনের। প্রাইমারি এবং সেকেণ্ডাবি। প্রাইমারি অবসাদের কাবণ খুঁজে পাওয়া যায় না। সেকেণ্ডারি অবসাদের পেছনে কারণ থাকে। অসুস্থতা, উদ্বেগ, অশান্তি, নানা কারণে এই ধরনের অবসাদ আসতে পারে। একাকিত্ব, একঘেয়েমিও অবসাদের জন্ম দিতে পারে। আত্মমর্যাদা ধাক্কা খাওয়া আরেকটি বড় কারণ। আমাদের সমাজে এই সমস্যাগুলি মেয়েদের ক্ষেত্রে কিছুটা বেশি দেখা দেয়। ফলে তাঁরা অবসাদেও আক্রান্ত হন বেশি। গর্ভাবস্থা এবং ঋতুবন্ধের সময় মেয়েদের অবসাদে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

প্র: অবসাদ কি বংশগত ভাবে হতে পারে?

উ: হতে পারে?

প্র: অবসাদ কি শিক্ষিত মানুষের সমস্যা?

উ: শিক্ষিত অশিক্ষিতের মধ্যে তেমন কিছু ফারাক নেই। তবে যাঁরা গায়ে গতরে খেটে রোজগার করেন তাঁদের মধ্যে অবসাদের শারীরিক উপসর্গ বেশি দেখা যায়। আর অভিজাতদের মধ্যে মানসিক উপসর্গ।

প্র: যাঁদের মন একটু চড়া সুরে বাঁধা তাঁদের মধ্যে কি অবসাদের বা বাইপোলার মুড ডিস- অর্ডারের প্রবণতা বেশি?

উ: আগে তাই ধারণা ছিল বটে, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ব্যাপারটা সেরকম নয়।

প্র: ঝুট ঝামেলার মধ্যে যাঁদের কাজ করতে হয় তাঁদের কি অবসাদে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি?

উ: হ্যাঁ।

প্র: অবসাদ কি আবহাওয়ার ওপর নির্ভর করে? অনেকে বর্ষাকালে বেশি অবসন্ন হয়ে পড়েন।

উ: একে বলে সিজনাল ডিপ্রেশন। বারবার এরকম হতে থাকলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া দরকার। একই দিনে সকালে বিকেলে অবসাদের তারতম্য হতে পারে। সকালবেলা মাত্রা বেশি। যত বেলা হচ্ছে ধীরে ধীরে ঠিক হচ্ছে। ফলে নিয়মিত অফিস যাওয়া হচ্ছে না। অবসাদের দরুণ এভাবে কাজের ব্যাঘাত হতে শুরু করলে অবসাদের পরিমাণ আরও বাড়ে। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ না নিলে বিপদ আসতে পারে।

প্র: বিপদ বলতে? আত্মহত্যা?

উ: পরিসংখ্যান বলছে যাঁরা আত্মহত্যা করেন তাঁদের মধ্যে ৭০ থেকে ৯০ শতাংশই অবসাদে আক্রান্ত। উল্টে ৷ চিত্রটা আবার এরকম নয়। অবসাদে আক্রান্তদের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ হয়তো আত্মহত্যার কথা ভাবেন। কিন্তু তা কাজে পরিণত করতে পারেন ১০ থেকে ১৫ শতাংশ মানুষ। অতএব বিপদ বলতে সবসময় আত্মহত্যা করে ফেলা নয়।

প্র: সেলিব্রিটিদের মধ্যে কি আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি দেখা যায়?

উ: সেলিব্রিটি অর্থাৎ নিজের কাজের ক্ষেত্রে যিনি অত্যন্ত সফল মানুষ। অত্যন্ত সফল মানুষের মধ্যে থাকে প্রতিভার আগুন। সেই আগুন যেমন তাঁকে সাফল্যের চূড়ায় নিয়ে যায়, বিপরীত ভাবে আবার তলিয়ে দিতেও পারে। নানা কারণে এদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দিতে পারে। প্রথমত, সাফল্য তাঁদের একা করে দেয়। সুখ দুঃখ ভাগাভাগির সাথী এদের কম। সাফল্যের যে শিখরে তাঁরা পৌঁছেছেন সেখান থেকে পতনের ভয়, পাবলিক ফিগার হওয়ার দরুণ মনের বিরুদ্ধে অনেক কাজ করতে বাধ্য হওয়া ইত্যাদি দারুণ চাপ ফেলে তাঁদের মনের উপর। এদের অনেকেই এসব কাটাতে ক্রনিক অ্যালকোহলিক হয়ে যান। বা ঘুমের ওষুধে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। ক্রনিক অ্যালকোহলিজমকে ক্রনিক্ আত্মহত্যার প্রবণতা হিসেবে ধরা যেতে পারে। এর উপর সাধারণভাবে এরা হন অতিরিক্ত আবেগ প্রবণ। আত্মহত্যা সাধারণ মানুষও করতে পারেন। অনেকে করেন দারিদ্র্যের জ্বালায়। কেউ বা কঠিন বিপদ থেকে রেহাই পেতে বা কখনও প্রেমে ব্যর্থ হয়ে। সেলিব্রিটিদের আত্মহত্যার পিছনে অনেক সময়ই এরকম সুনির্দিষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্র: বাড়িতে অশান্তি থাকলে বাচ্চার মধ্যে অবসাদ প্রবণতা বাড়ে?

উ: মা বাবার মধ্যে ঝগড়া হলে বাচ্চার মধ্যে নিরাপত্তার অভাব এবং অপরাধবোধ জাগে। অপরাধবোধ এবং নিরাপত্তার অভাব নিয়ে বড় হওয়া বাচ্চার মানসিক গঠনে কিছু ত্রুটি থেকে যেতে পারে। বাচ্চা যদি খুব অল্প বয়সে মাকে হাবায় তাহলেও তার মধ্যে নিরাপত্তাহীনতাব জন্ম হওয়া সম্ভব। এই বাচ্চার পরবর্তী কালে অবসাদ বা অন্য কোন মানসিক অসুখে আক্রান্ত হতে পারে।

প্র: এর সমাধান কী?

উ: বাচ্চা বা বাড়ির কাবোর মধ্যে যাতে অবসাদের সূত্রপাত না হয় সেটা খেয়াল রাখুন। এজন্য কয়েকটি জিনিস মেনে চলতে হবে। যেমন,

(১) বাচ্চাকে বেশি চাপের মধ্যে রাখবেন না।

(২) বাড়িতে অশান্তি, ঝগড়া যথাসম্ভব এড়িয়ে চলুন।

(৩) কাছের মানুষটি যদি কিছুদিন ধরে চুপচাপ থাকতে শুরু করেন, বেশি জিজ্ঞাসাবাদ না করে তাঁব দিকে লক্ষ রাখুন। অবসাদের আর কোনও উপসর্গ যেমন, মাথাব্যথা, পিঠ কোমর ব্যথা, খিধে, ঘুম কমে যাওয়া বা শারীরিক মিলনে অনিচ্ছা ইত্যাদি দেখা দিলে — কাবণ খুঁজে বাব কবার চেষ্টা করুন। কারণ অনেকসময় বোঝা নাও যেতে পাবে। সেক্ষেত্রে মনোচিকিৎসকেব সাহায্য নিন।

(৪) ডাক্তারেব পবামর্শ ছাড়া অবসাদ কমানোর ওষুধ খাবেন না।

(৫) অবসাদ এলে তাব হাত ধবে আসে নির্ঘুম বাত, অম্বল, বদহজম, কোষ্ঠবদ্ধতা ইত্যাদি। শারীরিক অসুবিধে জোরদাব হয়ে উঠলে অবসাদ আরও বাড়ে। কাজেই নিজেব বা বাড়িব কারোর মধ্যে অবসাদের লক্ষণ দেখা দিলে হালকা খাবার দাবার খাওয়া শুরু করুন।

(৬) দবকার মনে করলে সাইকোথেরাপিস্টেব সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

প্র: সাইকোথেরাপির সাহায্যে সব ধরনেব অবসাদ দূর করা যায়?

উ: মাঝাবি মাপেব দীর্ঘমেযাদি অবসাদে সাইকোথেরাপি খুব কাজে আসে। সমস্যাকে মোকাবিলা কবতে নতুন পথ দেখানো বা ক্ষেত্রবিশেষে সমস্যা সঙ্গে নিয়ে কীভাবে চলতে হয় সেটা শেখায় সাইকোথেবাপি। অনেক সময় এর সঙ্গে প্রয়োজন হয় ওষুধের।

প্র: এই সমস্ত ওষুধেব তো অনেক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থাকে?

উ: তেমন কিছু নয়। কিছু ক্ষেত্রে বাববার গলা, জিভ শুকিয়ে যেতে পারে। কোষ্ঠবদ্ধতা, হাত পা কাঁপা, বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে ইউরিনের সামান্য সমস্যা বা পসচুরাল হাইপোটেনশন অর্থাৎ বসা থেকে দাঁড়ালে হঠাৎ করে মাথা ঘুরে যেতে পারে। কেউ কেউ বলেন ওষুধ শুরু করার পর প্রথম দিকে দিনভর ঘুমঘুম বা ঝিমঝিম ভাব দেখা দেয়। মনে রাখারও অসুবিধে দেখা দিতে পারে। সতর্কতার অভাব বা একটু ঢিলেঢালা ভাব দেখা দেয়। তবে ৩-৪ দিনের মধ্যেই সব উপসর্গ কমে যায়। দিন সাতেকের মধ্যে অবস্থার উন্নতি হতে শুরু কবে। এবং দু' তিন সপ্তাহ পর সব ঠিক হয়ে যায়।

প্র: সিনেমায় দেখা যায় মানসিক রোগীকে স্বাভাবিক করতে ইলেকট্রিক শক দেওয়া হয়

মাথায়। অবসন্নতার ক্ষেত্রেও ওই পদ্ধতি কাজে লাগানো হয়?

উ: অনেক সময় অবস্থা এত খারাপ হয়ে যায় যে ওষুধ পত্রে কাজ হতে চায় না। সে সময় প্রাণ বাঁচাতে ইলেকট্রিক শক বা ইলেকট্রো কনভালসিভ থেরাপি (ই সি টি) দেওয়া হয়।

প্র: ই সি টি ক্ষতিকর নয়?

উ: অভিজ্ঞ হাতে দেওয়া হলে তেমন ক্ষতি কিছু হয় না।

প্র: ই সি টি দিলেই রোগী সুস্থ হয়ে যায়?

উ: এর সঙ্গে ওষুধ পত্র এবং সাইকোথেরাপিও চলে। মেনে চলতে হয় কিছু বিধি নিষেধ।

প্র: কী কী বিধি নিষেধ?

উ: সব ধরনের অবসাদের চিকিৎসাতেই নিচের বিষয়গুলি খেয়াল রাখা দরকার।

(১) চিকিৎসা চলাকালীন মদ্যপান না করা,

(২) পেট খারাপ যাতে না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা, কারণ পেটখারাপ হলে ওষুধ হজম কম হবে। এই রোগে ওষুধের মাত্রা ঠিক রাখা খুবই দরকার।

(৩) ওষুধ মাঝপথে বন্ধ করে দিলে অবস্থা আবার আগের জায়গায় ফিরে যেতে পারে।

(৪) ওষুধ চলাকালীন গর্ভসঞ্চার হওয়া চলবে না।

মানসিক চাপ কমাতে সময় পেলেই আড্ডা দিন

ডাঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

দূরভাষ : ৯৮৩০০-৪৯৮৪০

প্র : আজকাল চতুর্দিকে স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট ক্লিনিকের কথা খুব শোনা যাচ্ছে। এসব করে সত্যিই কি মানসিক চাপ কমে?

উ: মানসিক চাপ দুটো জিনিসের ওপর নির্ভর করে — (১) পারিপার্শ্বিক চাপ (২) আপনার সহ্য ক্ষমতা। এ দুটোব কোনও একটা বাড়লে কমলে মানসিক চাপ বাড়ে কমে। প্রতিকূল পারিপার্শ্বিককে অনেক সময় চেষ্টা করেও ঠিক করতে পারা যায় না। সেক্ষেত্রে জোর দিতে হয় ব্যক্তিবিশেষের সহ্য ক্ষমতার ওপর। গাড়িতে দেখবেন 'শক অ্যাবসরভার' লাগানো থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত 'শক অ্যাবসরভার' ঠিক আছে চোট কিন্তু গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছয় না। আমাদের সহ্য ক্ষমতা সেরকম শক অ্যাবসরভার। যত তাকে জোরদার করে তুলতে পারবেন, তত ভালভাবে সে পারিপার্শ্বিক চাপ সামলাবে। এই 'শক অ্যাবসরভার' একেক জন মানুষের ক্ষেত্রে একেকরকম। তাই দেখবেন একই পরিস্থিতিতে দু'জন মানুষ দু'ভাবে আক্রান্ত হচ্ছেন। স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট ক্লিনিকে শেখানো হয় কীভাবে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চললে মনের উপর সব থেকে কম চাপ আসবে। যিনি যত খোলা মনে এই জায়গায় যাবেন, তত ভাল ফল পাবেন।

প্র: এ জায়গায় গিয়েও অনেকে চাপমুক্ত হতে পারেন না। সেটা কি তাঁরা খোলা মনে যান না বলে হয়না?

উ: তা নয়, মানসিক চাপ খুব বাড়াবাড়ি পর্যায়ে গেলে টানাপোড়েন বাড়ে। অবসাদও দেখা দেয় অনেক সময়। অবসাদ যদি রোগ হিসেবে এসে উপস্থিত হয় এবং মানুষটির প্রাত্যহিক কাজকর্মও এর জন্য ব্যাহত হতে থাকে, কিছু ক্ষেত্রে ওষুধ পত্রের চিকিৎসা প্রয়োজন হয়। অবস্থা কিছুটা আয়ত্তে এলে তারপর স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টের অন্যান্য পদ্ধতিগুলির মধ্যে যাওয়া হয়।

প্র: স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টের অন্যান্য পদ্ধতি বলতে?

উ: খুব বেশি মানসিক চাপ এবং তার ফলে কিছু শারীরিক, মানসিক সমস্যা যেমন ঘুম না হওয়া বা বেশি ঘুম হওয়া, খিদে না হওয়া বা বেশি খেতে থাকা, মনঃসংযোগের অভাব, কাজে অনীহা, ক্লান্তি, হতাশা ইত্যাদি নিয়ে যাঁরা আসেন তাঁদের চিকিৎসা শুরু হয় অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট ড্রাগ , মুড এলিভেটর, অ্যান্টি অ্যাংজাইটি ড্রাগ বা ঘুমের ওষুধের সাহায্যে। এরপর পনেরো দিন কি একমাসের মাথায় বায়ো-ফিডব্যাক মেশিনের সাহায্যে তাঁর মানসিক চাপের পরিমাণ বুঝে নেওয়া হয়। অনেক সময় অবশ্য ওষুধ শুরু করার আগেও এটা করা হয়। এবার দরকার মতো সাইকোথেরাপি বা কাউন্সেলিং সঙ্গে রিলাক্সেশন এক্সারসাইজ, খাওয়া দাওয়ার নিয়ম কানুন, ম্যাসাজ, যোগাসন, ধ্যান, কিছু সুগন্ধীর ব্যবহার মানুষটিকে সুস্থ করে তোলে।

প্র: মানসিক চাপ কমাতে খাবারেরও ভূমিকা আছে?

উ: সবুজ শাক সব্জি, টাটকা ফলে প্রচুর ভিটামিন এবং অ্যান্টি অক্সিডেন্ট থাকে। এরা মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে। অশান্তি, টানাপোড়েন বেশি চললে প্রচুর জল খাওয়া উচিত। আর খাবাব হওয়া উচিত হাল্‌কা, সহজ পাচ্য এবং ফাইবার যুক্ত। কারণ এ সময় হজমের গণ্ডগোল, অম্বল, কোষ্ঠবদ্ধতা, বমি বমি ভাব ইত্যাদি থাকতে পারে। চা, কফি, অ্যালকোহল জাতীয় উত্তেজক পানীয় না খাওয়াই ভাল। অনেকে অশান্তি উদ্বেগ ভুলে থাকতে সিগারেট, অ্যালকোহলকে সাথী করেন। এর থেকে জন্মায় নির্ভরতা। যার ফল খুবই খারাপ।

প্র: মানসিক চাপ কমাতে কী ধরনের ব্যায়াম করতে হবে?

উ: সবথেকে ভাল ভোরবেলা খোলা হাওয়ায় হাঁটা বা জগিং করা। একটানা হাঁটতে হবে। ৪৫ মিনিটে অন্তত ২-২.৫ কিলোমিটার। অনেকে একা হাঁটা পছন্দ করেন না। সঙ্গী জোগাড় না হলে হেলথ ক্লাবে ভর্তি হতে পারেন। ৩০-৪৫ মিনিট নানারকম মেশিন এবং কিছু ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করলে সুফল পাবেন।

এক্সারসাইজ মাত্রা বজায় রাখা খুব জরুরি। পরিমিত এক্সারসাইজ করলে শরীর থেকে এন্ডোরফিন বার হয়। স্ট্রেস কমাতে যার ভূমিকা অপরিসীম। এক্সারসাইজ বেশি হয়ে গেলে বেরোয় ল্যাকটিক অ্যাসিড। এর প্রভাবে স্ট্রেসের মাত্রা বেড়ে যায়।

প্র: ধ্যান করলেও তো মানসিক চাপ কমে। কিন্তু খুব অশান্তির মধ্যে যিনি আছেন তাঁর পক্ষে অতখানি মনঃসংযোগ করা সম্ভব?

উ: ধ্যানের অত কঠিন পর্যায়ের মধ্যে যাবেন না। সারাদিনে যখনই সময় পাবেন, ঘুম আসার আগে বিছানায় শুয়ে, গাড়িতে বসে এমনকি অন্য কোনও কাজ করতে করতেও আপনার কোনও পছন্দের জিনিস নিয়ে একাগ্র মনে ভাবার চেষ্টা করুন। আসল কথা হল খানিকক্ষণের জন্যে হলেও মনকে অশান্তির বিষয় থেকে সরিয়ে অন্য বিষয়ে ফেলা । এতে শরীরে ক্ষতিকর রাসায়নিক ক্ষরণের পরিমাণ কমে এবং অশান্তি উদ্বেগের ফলে যে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা তার পরিমাণ কম হয়।

প্র: দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি বলতে?

উ: পেটের গন্ডগোল থেকে আলসার, ঘুম না হওয়া, উচ্চরক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ

এমন কি ক্যান্সারও। আসলে দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। ফলে ছোট থেকে বড়সর অজস্র রোগ থাবা বসায় শরীরে। সেখান থেকে বদমেজাজ, কাজে ক্ষতি, সম্পর্ক নষ্ট। তার ফলে আরও মানসিক চাপ। অর্থাৎ কেটে বেরিয়ে না এলে এই আবর্ত থেকে আর মুক্তি নেই।

প্রঃ কীভাবে কেটে বেরব?

উঃ অনেক রাস্তা আছে। প্রথমে কয়েকটা জিনিস বোঝবার চেষ্টা করুন—

(১) মানসিক চাপের ভাল মন্দ দু'দিকই আছে। চাপের মুখে কাজ করা, পরীক্ষার পড়া তৈরি করা — এগুলো ভাল দিক। আবার এই চাপই যখন গ্রাস করে তখন সে ক্ষতিকর। মাত্রা ঠিক রাখতে পারবেন কিনা তার ওপর সব নির্ভর করছে।

(২) দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ কিন্তু শরীর এবং মনের জন্য ক্ষতিকর। অর্থাৎ মানসিক চাপ কে নিজেব ওপর চেপে বসতে দেবেন না।

(৩) কী পরিস্থিতিতে আপনার ওপর চাপ সৃষ্টি হয় তা নিজে নিজে বোঝার চেষ্টা করুন।

(৪) বিশ্বাস রাখুন, আপনি নিজেই আপনার ভার লাঘব করতে পারবেন।

এবার আসুন, চাপকে কিছুটা এড়িয়ে কিছুটা সঙ্গে নিয়ে কীভাবে বাঁচা যায় সেই পথ খুঁজি।

(১) কোনও একটা নির্দিষ্ট মুহূর্তে যেমন স্বামী বা স্ত্রীব সঙ্গে বা অফিসে বসের সঙ্গে কথা বলছেন, খেয়াল রাখুন কথাবার্তা কোন্ রাস্তায় গেলে অশান্তির সূত্রপাত হতে পারে।

(২) রাস্তাটা যদি চিনে থাকেন, ভুলেও সে পথে হাঁটবেন না। হয়ত এর জন্য আপনাকে নত হতে হতে পারে।

(৩) অশান্তির রাস্তাটা হয়তো এড়ালেন কিন্তু নত হতে হয়েছে বলে খারাপ লাগতে লাগল। বা হয়তো চেষ্টা করেও অশান্তি এড়াতে পারেননি, সুইচ অফ — সুইচ অন পদ্ধতি শিখে নিন। যে ব্যাপারটা কষ্ট দিচ্ছে, খানিকক্ষণের জন্য সেই ব্যাপারটা মন থেকে বার করে দিন। সম্পূর্ণ উল্টো কোনও বিষয় নিয়ে ভাবতে থাকুন। অর্থাৎ মনের সুইচ অফ হয়ে গেছে। যে কোনও পরিস্থিতিরই খারাপ প্রভাব সময়ের সঙ্গে কেটে যায়। কেটে যাওয়ার পর আবার সুইচ অন করুন। জীবনের সব ক্ষেত্রেই কিন্তু এই পদ্ধতি কাজে লাগাতে হবে।

(৪) মনে মনে গজরানোর স্বভাব বদলে ফেলুন। যদি কিছু করার থাকে করুন। না হলে অযথা বিষয়টাকে মনের মধ্যে তোলপাড় করে অশান্তি বাড়াবেন না।

(৫) কাজ-অবসর এবং হবি - তিনটেই যেন থাকে আপনার জীবনে। কাজের জায়গা যেমন তেমন হোক, অবসর কিন্তু সুন্দর করে তুলতে হবে। অবসর সময় ক্রিয়েটিভ কিছু করা যেমন গান গাওয়া, ছবি আঁকা, লেখা আপনার মনকে বাস্তব থেকে অন্যজগতে নিয়ে যাবে। গান-বাজনা বা লেখালেখির অভ্যেস না থাকলে বই পড়ুন, সিনেমা, থিয়েটার দেখুন। নয়তো নিছক আড্ডা মারুন।

মানসিক চাপ কমাতে আড্ডা খুব কার্যকর।

(৬) দিনের মধ্যে অন্তত একটা সময় শব্দ এবং আলোর জগৎ থেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে নিন নিজেকে। ঘরে ধূপ জ্বেলে দিন বা পছন্দের সুগন্ধী স্প্রে করুন। সুগন্ধ অন্ধকার এবং নৈশব্দ্যের মধ্যে আপনার প্রিয় জিনিস নিয়ে ভাবুন। একে যদি ধ্যান বলতে চান বলতে পারেন।

(৭) অশান্তির সময় চিৎকার চেঁচামেচির মধ্যে থাকলে আরও অশান্তি লাগে। নিজে আস্তে কথা বলুন। চেষ্টা করুন যাঁরা আপনার আশে পাশে রয়েছেন তাঁরাও যেন আস্তে কথা বলেন।

(৮) এ সময় হাসি আসতে চায় না। কিন্তু হাসতে হবে। সবার সঙ্গে হাসি মুখে কথা বলুন। এর ভাল প্রভাব পড়বে আপনার ওপর।

(৯) নিজের শক্তি, দুর্বলতা এবং সীমাবদ্ধতা ভালভাবে বুঝে সেই ভাবে কাজ করুন।

(১০) ১০ দিন বাদে কী হবে সেটা না ভেবে শুধু আজকের দিনটা সব থেকে ভাল ভাবে কীভাবে কাটাতে পারেন তার ছক করুন। সারা দিনটা এমন ভাবে কাটাতে চেষ্টা করুন যাতে রাত্রে ঘুমোবার সময় কোনও গ্লানিকর অনুভূতি আপনাকে দুঃখ না দেয়।

(১১) সময়ের সঠিক ব্যবহার শিখুন। কোন সময় কী করবেন সেটা ঠিক করে রাখুন।

(১২) যদি মনে করেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাপ এসে পড়েছে ভদ্রভাবে 'না' বলা অভ্যেস করুন। 'না' করতে পারাটা কিন্তু একটা আর্ট। এটা জানা না থাকায় অনেকেরই জীবন দুর্বিষহ হয়ে যায়।

(১৩) পৃথিবীর সব কিছু আপনার আয়ত্তে নেই, সবকিছু আপনার দ্বারা হবে না — এটা মেনে নিন, নচেৎ দুঃখ বাড়বে।

(১৪) পরিবর্তন দেখলেই ভয় পাবেন না। আপনি চান বা না চান পরিবর্তন আপনার জীবনে আসবে। তাকে যদি হাসিমুখে অভ্যর্থনা করতে পারেন আপনারই লাভ।

(১৫) গোঁয়ার্তুমি করবেন না। প্রতিটি বিষয়ের এপাশ ওপাশ ভাবুন। যে দিকে গেলে মানসিক চাপ কম হবে খোলা মনে সেদিকে যান। জীবনটা এত বড় এবং প্রতিটি ঘটনাই এত ক্ষণস্থায়ী যে হার জিতের সত্যিকার কোনও অর্থ নেই।

প্রঃ হার জিতকে গুরুত্ব না দিলে মানসিক চাপ কমে যাবে?

উঃ হ্যাঁ, এই জন্যই তো বারবার মন খোলা রাখার কথা বলছি। খোলা মনে বিচার করতে পারলে দেখবেন আজ যেটা জিত মনে হচ্ছে হয়তো তার পেছনে কোনও হার লুকিয়ে আছে। অর্থাৎ হারজিত সব কিছুরই বাস আমাদের ভাবনার মধ্যে। তেমনভাবে ভাবতে পারলে হারটাও জিতের চেহারা নিতে পারে। অথবা সবকিছুকে ছেড়ে দিয়ে যদি শান্তি-অশান্তিকে গুরুত্ব দিই। যে কোনও পরিস্থিতিতেই শান্তি পাওয়া মানে যদি হয় জেতা আর অশান্তি পাওয়া মানে হেরে যাওয়া —অর্থাৎ প্রায়োরিটি বদলে দেওয়া, মানসিক চাপ কমবে।

প্রঃ সব মেনে চলার পরও যদি আচমকা অস্থিরতা দেখা দেয় কী করব?

উঃ সব যদি মেনে চলেন অস্থিরতা সহজেই কেটে যাবে। যাইহোক, আচমকা অস্থিরতা

দেখা দিলে কয়েকটি জিনিস পরপর করে যান—

(১) আরাম করে বসুন বা শুয়ে পড়ুন। যদি সেই পরিস্থিতি না থাকে, একটু একা হয়ে চোখ বন্ধ করে ১-২ করে ৩০০ পর্যন্ত গুনুন।

(২) বাথরুমে গিয়ে ঘাড়ে, চোখে, মুখে এবং পায়ের পাতা ভাল করে জল দিয়ে ভিজিয়ে নিন। জল না মুছে ফ্যানের নীচে দাঁড়ান। ঠাণ্ডার ধাত থাকলে ব্যাপারটা একটু বুঝেশুনে করবেন।

(৩) এক গ্লাস ঠাণ্ডা সরবত বা কোল্ডড্রিঙ্কস, না পেলে অন্তত এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খান।

(৪) কাজ থেকে তাড়াতাড়ি ছুটি নিয়ে পায়ে হেঁটে অথবা গাড়িতে খানিকটা বেড়িয়ে আসুন। মনের সুইচ যেন এ সময় অফ করা থাকে।

(৫) গান শোনা, সিনেমা দেখা বা পছন্দের মানুষের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া যেতে পারে।

(৬) অন্যদিন যা খান তার থেকে কম পরিমাণ হাল্‌কা খাবার খান।

(৭) অ্যালপ্রাজোলাম, বুসপিরন বা হাইড্রক্সিজিন জাতীয় ওষুধ রাত্রের খাবার খাওয়ার ১৫ মিনিট আগে খেয়ে নিন। অশান্তি দূর হবে। ঘুম আসবে।

(৮) সকালে উঠেও যদি পুরনো স্মৃতি ঝঞ্ঝাট বাধাতে থাকে সুইচটা আবার অফ করে দিন এবং অন্যদিনের থেকে একটু বেশি সময় ধরে যোগাসন এবং ধ্যান করুন।

অসুখ অসুখ বাতিকও কিন্তু অসুখ

ডাঃ উদয় চৌধুরী

দূরভাষ : ৫৫৫-৯৭৭৪

প্র: ঝগড়া, অশান্তি হলে অনেকে বুক ব্যথা, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি উপসর্গে কষ্ট পান। এর কি কোনও কারণ আছে না সবটাই ভান?

উ: না ভান নয়। উদ্বেগ, অশান্তি, মানসিক চাপ যখন এমন জায়গায় এসে পৌঁছয় যে মানুষ তার ভার আর বইতে পারে না, কাউকে বলতে পারে না অথবা বলেও সুরাহা হয় না— মনের কষ্টের প্রভাব শরীরে এসে পড়তে শুরু করে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট, বুক ব্যথা, কখনও মাথা ব্যথা, পেট ব্যথা ইত্যাদি নানান উপসর্গ দেখা দেয়। এইরকম অবস্থায় নতুন করে আর ঝগড়া, অশান্তির চাপ নেওয়ার ক্ষমতা থাকে না। তবু হয়তো ঝগড়া হয়। মনের আর ক্ষমতা নেই। পুরোটাই তাই এসে পড়ে শরীরের ওপর। শুনলে অবাক হবেন ইনটেনসিভ কার্ডিয়াক কেয়ার ইউনিটে বুক ব্যথা, শ্বাস কষ্ট নিয়ে যত রোগী ভর্তি হন তার শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ সোমাটোফর্ম অটোনোমিক ডিসফাংশনে ভুগছেন।

প্র: সোমাটোফর্ম অটোনোমিক ডিসফাংশন মানে?

উ: সোমা মানে শরীর। অটোনোমিক ডিসফাংশন অর্থাৎ স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের স্বাভাবিক কাজকর্মের বিচ্যুতি। এই রোগে মনের চাপ স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রে ধাক্কা দেয়। তার প্রভাব এসে পড়ে শরীরে। হৃৎস্পন্দন বাড়ে, ঘাম হয়, রক্তচাপ এবং শরীরের তাপমাত্রাও বাড়তে পারে। শ্বাসকষ্ট কখনও মারাত্মক রূপ নেয়।

প্র: একেই কি কার্ডিয়াক নিউরোসিস বলে?

উ: হ্যাঁ। উপসর্গগুলি দেখতে সবই হার্টের রোগের মতো। অথচ কার্ডিয়াক মনিটর লাগিয়ে এবং অন্যান্য যাবতীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করে শারীরিক রোগের কোনও হদিশ পাওয়া যায়না। তাই একে নিউবোসিস অর্থাৎ মনের রোগ বলেই ছাপ দেওয়া হয়।

প্র: কাদের এই সমস্যা বেশি হয়?

উ: আবেগ প্রবণ, সংবেদনশীল অথচ অন্তর্মুখী মানুষ যে কোনও সোমাটোফর্ম ডিসঅর্ডারে

আক্রান্ত হন বেশি। কারণ এরা দুঃখ, কষ্ট, আনন্দ আর পাঁচ জনের থেকে বেশি মাত্রায় অনুভব করেন। কিন্তু অন্তর্মুখী হওয়ায় তার ভাগ দিতে পারেন না তেমন কাউকে। এদের মনে আবেগের ওঠাপড়া বেশি। ফলে দুঃখ বা আনন্দে মনে ঝড় ওঠে বেশি। কাছের মানুষ সহানুভূতিশীল না হলে এই ঝড়ের পুরোটা তাঁদের সামলাতে হয় একা। মন বেশি স্পর্শকাতর হওয়ায় চাপের অনেকটাই শরীরে এসে পড়ে।

প্র: কিন্তু ঝগড়া, অশান্তিতো সবার জীবনেই থাকবে। বারবার এরকম হলে তো বিপদ।

উ: সে তো বটেই। সে জন্যই চিকিৎসা খুব জরুরি। আর সত্যি কথা বলতে কি এদের চিকিৎসা তেমন কঠিন কিছু নয়। খুব সামান্য ওষুধপত্র এবং কাউন্সেলিংয়ের সাহায্যে এদের সুস্থ করে তোলা যায়। তবে কাউন্সেলিং কিন্তু বাড়ির লোকেরও করতে হবে।

প্র: কী রকম?

উ: ধরুন, শ্বাসকষ্ট, বুকব্যথা নিয়ে কোনও রোগী আই সি সি ইউতে ভর্তি হলেন। পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা গেল তার শারীরিক কোনও অসুখ নেই। তখন একটু বেশি মাত্রায় অ্যালপ্রাজোলাম বা লোরাজিপাম জাতীয় দুশ্চিন্তা কমানোর ওষুধ ইঞ্জেকশন দিয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয়। এবার বাড়ির লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পালা। যদি দেখা যায় দীর্ঘদিন ধরে কোনও ঝগড়া, অশান্তি চলছে বা কোনও কারণে মানসিক চাপের মধ্যে আছেন রোগী, দুটি ধাপে চিকিৎসা শুরু করি আমরা। প্রথম ওষুধপত্র। স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রকে সামাল দিতে ব্যবহার করা হয় বিটা ব্লকার যেমন প্রপ্রানোলল জাতীয় ওষুধ। বুক ধরফর, ঘাম হওয়া, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি কমতে থাকে। এর সঙ্গে অ্যালপ্রাজোলাম বা লোরাজিপাম জাতীয় দুশ্চিন্তা কমানোর ওষুধ খেতে হয় কিছুদিন এবং অল্পমাত্রায় অবসাদ কমানোর ওষুধ যেমন টি সি এ, এস এস আর আই বা এস এন আর আই। ওষুধ চলাকালীন বাড়ির লোককে কতগুলি নিয়ম মেনে চলতে বলা হয়। যেমন রোগীর সঙ্গে তর্ক বিতর্কে না যাওয়া, তাকে সঙ্গ দেওয়া, সমালোচনা বন্ধ করে তার গুণ নিয়ে আলোচনা করা এবং উৎসাহ দেওয়া। ওষুধ এবং বাড়ির লোকের সাহায্য দুইই পেলে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতে পারে রোগী। তখন শুরু হয় কাউন্সেলিং। তাঁকে বাস্তব পরিস্থিতি মানতে শেখানো, নিজের দুর্বলতা চেনা এবং তাকে মেনে নেওয়া বা দূর করার পদ্ধতিও শেখানো হয় কাউন্সেলিংয়ের সময়। মোটামুটি ২-৩ মাসের মধ্যে রোগী ভাল হয়ে যান।

প্র: মনের অসুখের ক্ষেত্রে 'ভাল হয়ে যাওয়া' কথাটার অস্তিত্ব আছে কি?

উ: আগেই বলেছি সোমাটোফর্ম ডিসঅর্ডার সংবেদনশীল মানুষের মধ্যে বেশি দেখা দেয়। নরম স্বভাবের জন্য এরা বেশি কষ্ট পান এবং সারাজীবন ধরে পেতে থাকেন। তবে ওষুধপত্র এবং কাউন্সেলিংয়ের চিকিৎসা সম্পূর্ণ হলে এঁরা নিজেদের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে এতটাই সচেতন হয়ে যান যে পরবর্তী কালে কষ্টে পড়লে নিজে নিজেই অনেকটা সামাল দিতে পারেন বা সাহায্যের জন্য ডাক্তারের কাছে যেতে পারেন। ভয়ানক শারীরিক কষ্টের মুখোমুখি আর হতে হয় না। এই অবস্থায় পৌঁছনোকেই আমরা 'ভাল হয়ে যাওয়া' বলি।

প্র: মাথা ব্যথাও নাকি অনেক সময় মানসিক কারণে হয়?

উ: মানসিক কারণ বললেই লোকে ব্যাপারটাকে বাতিক চলে ধরে নেয়। অর্থাৎ ব্যথা নেই। রোগী ভান করছে। আসলে কিন্তু তা নয়। শুধু মাথা ব্যথা নয়, ঘাড়, কোমর, হাত, পা, পিঠ পেট যে কোনও জায়গার ব্যথা অনেক সময় মানসিক কষ্টের প্রতিফলন হতে পারে, এর ডাক্তারি নাম সোমাটোফর্ম পেন ডিসঅর্ডার। মনের ব্যথার কথা অকপটে বলতে না পারার দরুণ তা শরীরের বিভিন্ন ব্যথা বেদনার মাধ্যমে বাইরে বেড়িয়ে আসে।

প্র: চিকিৎসা কী? ব্যথা কমার ওষুধ?

উ: না, ব্যথা কমার ওষুধ এক্ষেত্রে তেমন কাজ করে না। সেণ্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম বা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ওপর কাজ করে এমন ওষুধপত্র দিতে হয়। দীর্ঘস্থায়ী চিকিৎসার জন্য ট্রাইসাইক্লিক বা এস এস আর আই গোত্রের অবসাদ কমানোর ওষুধ এবং তাৎক্ষণিক ব্যথা কমানোব জন্য অ্যালপ্রাজোলাম বা লোরাজিপাম জাতীয় ওষুধ। রোগীর অবস্থার ওপর নির্ভর করে অ্যালপ্রাজোলাম সপ্তাহ তিনেকের জন্যও দেওয়া যেতে পারে। অবসাদ কমানোর ওষুধের মাত্রাও বাড়াতে হয় কখনও।

প্র: সব সময় অবসাদ কমানোর ওষুধ দেওয়ার দরকার পড়ছে কেন? এ সমস্ত শারীরিক কষ্টের সূত্রপাত কি অবসাদের জন্য?

উ: সব সময় তা নয়। তবে অশান্তি, হতাশা, অবসাদ অনেক সময় এমন মেশানো থাকে যে তাকে পুরোপুরি আলাদা করা যায় না। আবার অনেক সময় অশান্তি, দ্বন্দ থেকেই সোমাটোফর্ম ডিসঅর্ডারের সৃষ্টি। তাই এই সমস্ত রোগে ব্যবহৃত ওষুধই এক্ষেত্রেও কাজে লাগে। তবে কম মাত্রায়।

প্র: অশান্তির জন্য ঘাড়ে মাথায় ব্যথা হলে বুঝতে পারা যায়, হাতে, পায়ে, কোমরে, পিঠে, পেটে ব্যথা হলে কী করে বুঝব?

উ: বোঝা একটু শক্ত। বিশেষ করে রোগী যদি সব কিছু খুলে বলতে না চান। সাইকিয়াট্রিস্ট সহজে বুঝতে পারবেন। তবে ব্যথা বেদনা নিয়ে তো কেউ আর সরাসরি সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে আসেন না। নিজে নিজে ব্যথা কমার ওষুধ খেয়ে বেশ কিছুদিন কাটান। ফলে মাথা, গা, হাত, পা ব্যথার সঙ্গে অনেক সময় যুক্ত হয় গ্যাসট্রাইটিসের সমস্যা। পেট ব্যথা, বুক ব্যথা, খেতে ইচ্ছে না করা, ঘুম না হওয়া ইত্যাদি নানান উপসর্গ নিয়ে এবার রোগী ডাক্তারের কাছে যান। ব্যথার উৎস খুঁজতে যাবতীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়। তারপর ব্যাখ্যা করার মতো তেমন কিছু পাওয়া না গেলে সাইকিয়াট্রিস্টের ডাক পড়ে। ব্যথার উৎস শারীরিক নয় এ ব্যাপারে নিশ্চিত হলে তবেই আমরা চিকিৎসা শুরু করি।

প্র: এরকম ব্যথা বেদনা হলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে?

উ: না, হলেই সঙ্গে সঙ্গে যেতে হবে না। ২-৪ দিন অপেক্ষা করে ব্যথার ধরণ বোঝবার চেষ্টা করতে হবে। অনেক সময় দুশ্চিন্তা, অশান্তি থেকে ঘাড়ে মাথায় ব্যথা হয়। অশান্তি কমার সঙ্গে সঙ্গে ব্যথা কমে যায়। শোওয়া, বসার দোষের জন্য কোমরে, হাতে, পায়ে, পিঠে ব্যথা হতে পারে। মাথা বা শরীরে ব্যথা ঠাণ্ডা লেগেও হওয়া

সম্ভব। তবে এই সমস্ত ক্ষেত্রে ২-৪ দিনে ব্যথা কমে যায়। না কমলে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।

প্র: এই ২-৪ দিন ব্যথা কমার ওষুধ খাওয়া খেতে পারে?

উ: প্যারাসিটামল ট্যাবলেট খেয়ে দেখতে পারেন।

প্র: অ্যালপ্রাজোলাম বা লোরাজিপাম খাওয়া যাবে না?

উ: অশান্তি থেকে হচ্ছে কিনা না জেনে এই সমস্ত ওষুধ খাওয়া ঠিক নয়। দীর্ঘদিন খেতে খেতে অভ্যেস হয়ে যেতে পারে।

প্র: সোমাটোফর্ম পেন ডিসঅর্ডারে কাউন্সেলিংয়ের ভূমিকা নেই?

উ: মনের অশান্তি, উদ্বেগ থেকে যে সমস্ত অসুস্থতার সৃষ্টি সবের ক্ষেত্রেই কাউন্সেলিংয়ের ভূমিকা আছে।

প্র: আর হিস্টিরিয়ায়?

উ: হিস্টিরিয়া কথাটাই উঠে গেছে। মানসিক কারণে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, মুখে গ্যাঁজলা বেরনো, হাত পায়ে খিঁচুনি, দাঁতে দাঁত লেগে যাওয়া ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিলে তাকে বলে সোমাটোফর্ম কনভারশন ডিসঅর্ডার। এক্ষেত্রেও কাউন্সেলিং কাজে আসে।

প্র: মৃগীর উপসর্গও তো এই একই। তাহলে কীভাবে বোঝা যাবে রোগটা মৃগী না কনভারশন ডিসঅর্ডার?

উ: মৃগী হলে ব্রেনের ই ই জি-তে প্রায় সময়ই ত্রুটি ধরা পড়ে। কিন্তু এক্ষেত্রে পড়ে না। উপসর্গ দেখেও রোগ দুটিকে আলাদা করা যায়।

প্র: কী রকম?

উ: মৃগীতে রোগী অজ্ঞান হয়ে যেখানে সেখানে ছিটকে পড়ে যেতে পারে। মারাত্মক আঘাত লাগাও বিচিত্র নয়। দাঁতে দাঁত লেগে জিভ কেটে যেতে পারে। অসারে প্রস্রাব হয়ে যেতে পারে। এমন কি ঘুমের মধ্যেও অনেক সময় উপসর্গ দেখা দেয়। কনভারশন ডিসঅর্ডারে মানুষটি কিন্তু যেখানে সেখানে অজ্ঞান হয়ে পড়বেন না। কাছের মানুষ ধারে কাছে থাকলে তবেই অজ্ঞান হওয়ার ঘটনা ঘটবে। পড়ে যাওয়ার দরুণ মারাত্মক কোনও আঘাত লাগবে না। জিভ কেটে যাবে না। প্রস্রাব হবে না বা ঘুমের মধ্যে উপসর্গ দেখা দেবে না।

প্র: কাছের মানুষ আশে পাশে না থাকলে সোমাটোফর্ম কনভারশন ডিসঅর্ডারের রোগী অজ্ঞান হয় না— এ ভান ছাড়া আর কী?

উ: না ভান নয়। মনের কষ্ট প্রকাশ করার একটা ধরণ। কনভারশন ডিসঅর্ডার নানা রকমের হয়। অনেক সময় দেখা যায় পরীক্ষার আগে কথা বন্ধ হয়ে গেছে, বা চোখে দেখতে পাচ্ছে না। অনেক সময় প্যারালিসিসের উপসর্গ নিয়েও আসেন রোগী। এক ভদ্রমহিলার কথা জানি, বাড়িতে অশান্তির দরুণ মানসিক কষ্ট ভোগ করতেন। তাঁর প্রথম শারীরিক কষ্টের সূত্রপাত হয় কোমর ব্যথা দিয়ে। পরীক্ষা নিরীক্ষা করে রোগের শারীরিক কোনও কারণ ধরা পড়ে নি। এর কিছুদিন পর শরীরের বা দিক অসার হতে শুরু করে। নিউরোলজিস্ট দেখানো হয়। রোগের কারণ ধরা পড়ে না অথচ

উপসর্গ বাড়তে থাকে। কোনও কিছু না পেয়ে এরপর সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে আসা হয়। দেখা যায় আসলে সে ভুগছিল সোমাটোফর্ম কনভারশন ডিসঅর্ডারে।

প্র: একই মানুষের মধ্যে এই জাতীয় একাধিক সমস্যা থাকতে পারে?

উ: হ্যাঁ। একসঙ্গে থাকতে পারে, বা জীবনের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

প্র: সবক্ষেত্রেই চিকিৎসার ধারাটা মোটামুটি এক?

উ: হ্যাঁ, মোটামুটি একই ধরণের ওষুধপত্র এবং কাউন্সেলিং। তবে তেমন মারাত্মক অবস্থা হলে উপসর্গ ভিত্তিক চিকিৎসাও কিছু করতে হয়।

প্র: পরীক্ষার আগে মাথা ব্যথা, বুক ধরফর, শ্বাসকষ্ট, ঘুমোতে না পারা ইত্যাদি উপসর্গের হাত থেকেও রেহাই পাওয়া সম্ভব?

উ: সম্ভব। ক্ষেত্র বিশেষে খুব কম মাত্রায় টি সি এ, এস এস আর আই বা এস এন আর আই গোত্রের ওষুধ অথবা রাতে শোওয়ার আগে ৫-১০ মিগ্রা জোলপিডেম। অ্যালপ্রাজোলাম বা লোরাজিপাম জাতীয় ওষুধও ব্যবহার করা হয় কখনও। দীর্ঘস্থায়ী ফল পেতে পরীক্ষার ২-৩ মাস আগে থেকে বিটা ব্লকার জাতীয় ওষুধ ১০ মিগ্রা করে দিনে ২ বার দেওয়া যেতে পারে।

প্র: পরীক্ষা বা ইন্টারভিউ দিতে যাওয়াব আগে বারবাব টয়লেটে যাওয়া?

উ: মানসিক টানাপোড়েনে যাঁরা বেশি ভোগেন তাঁদের এই সমস্যা বেশি হয়। কিছু বাচ্চা স্কুল যাওয়াব আগে বমি করতে শুরু করে। এদেব ক্ষেত্রেও কিন্তু উপসর্গ কমানোর ওষুধ দিয়ে স্থায়ী কাজ হবে না। অশান্তি কমানোর ওষুধ এবং কাউন্সেলিং কাজে আসবে। তবে অল্প স্বল্প সমস্যা থাকলে মাথা ঘামানোব দবকার নেই। উদ্বেগপ্রবণ মানুষদেব এবকম থাকে একটু আধটু।

প্র: উদ্বেগ থেকে তো আরও নানা রকম উপসর্গ হয়। হাত পায়ের তলা ঠান্ডা হযে যাওযা, কান, মাথা, গবম হযে যাওয়া ইত্যাদি। এ সবেরও চিকিৎসা আছে?

উ: আবারও একই কথা। উদ্বেগপ্রবণ মানুষদের এই সমস্ত সমস্যা অল্প বিস্তর থাকে। মাত্রা না ছাড়ালে তা নিয়ে চিন্তাভাবনা না করাই ভাল।

প্র: সারাক্ষণ অসুখ অসুখ বাতিক যাঁদের, তাঁদের সুস্থ করে তোলা যায়?

উ: হ্যাঁ। চিকিৎসা বলতে কম মাত্রায় বিটা ব্লকার এবং অবসাদ কমানোর ওষুধ। এদের অনেকের মধ্যে আবার অবসাদও থাকে। সে ক্ষেত্রে অবসাদ কমানোর ওষুধের মাত্রা বাড়াতে হয়। সঙ্গে কাউন্সেলিং। মনকে শরীরের ওপর থেকে খানিকটা উঠিয়ে দিতে পারলে রোগ সেরে যায়। বাড়ির লোকের সাহায্য খুব জরুরি। দিনরাত অসুখ অসুখ শুনতে শুনতে তাঁরা যেন বিরক্ত হয়ে রোগীকে অবহেলা না করেন। তাহলে রোগের প্রকোপ বাড়বে। তাঁদের বুঝতে হবে অসুখ অসুখ বাতিকও আসলে এক ধরনের অসুখই।

বারবার হাত ধোয়া রোগের পর্যায়ে চলে যেতে পারে

ডাঃ গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

দূরভাষ : ৪৮১-১৪৬২

প্র: প্রেমিকার জন্য প্রেমিক পাগল। তাঁকে পাওয়ার জন্য খুনজখম পর্যন্ত করে ফেলছে। বা সন্দেহের বশে খুন করছে তাঁকেই। এ সবই কি অবসেশন?

উ: না, এসব অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে ঝোঁকের মাথায় করা কাজ। আমরা বলি 'ইমপালসিভনেস'। কোনও একটা কিছু পাওয়ার জন্য কেউ যদি খুনজখমও করে— সেটা কিন্তু লক্ষ্যকেন্দ্রিক। জিনিসটা বা মানুষটাকে পাওয়া হয়ে গেলে ঝোঁকটা কেটে যায়। আবার হারানোর ভয়ে খুন খারাপি—অনেক মানসিক সমস্যার জন্য হতে পারে। কিন্তু অবসেশন বা বাতিক নয়।

প্র: অবসেশন তার মানে বাতিক। অর্থাৎ বার বার হাত পা ধোয়া, একশোবার ঘর গুছনো এসব?

উ: হ্যাঁ, এগুলো অবসেশন। আসলে এক কথায় অবসেশন হল 'হিক্কাপ অফ মাইন্ড'। হেঁচকি তো কেউ ইচ্ছে করে তোলে না, আপনা থেকে উঠতে থাকে। কষ্ট হয়, বিরক্তি লাগে কিন্তু হেঁচকি যতক্ষণ ওঠার উঠতেই থাকে। জল খেয়ে বন্ধ করার চেষ্টা করা হয়। বা মন অন্য দিকে নিয়ে। অবসেশনের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। কোনও বিশেষ ভাবনা, ঝোঁক, দ্বিধা বা বিশেষ কোনও ছবি মনের মধ্যে হঠাৎ করে আসতে শুরু করে। ওই হেঁচকির মতো। বারবার। মানুষ চাইছে না ভাবতে। কিন্তু না ভেবে উপায় নেই। খুব কষ্টকর এই অবস্থা। যেমন ধরুন, বারবার যাঁরা হাত ধোন। একবার মনে হল হাতে ময়লা লেগে গেছে। হাত ধুয়ে এলেন। আবার মনে হচ্ছে ময়লাটা গেল না। আবার হাত ধোয়া। এভাবে চলতেই থাকল। ঘর গোছানোর ক্ষেত্রেও তাই। কিছুতেই মনোমতো হচ্ছে না। সব কাজ বরবাদ। সারা দিনরাত কেবল ঘর গোছানো হচ্ছে। মনের মধ্যে কোনও একটা ভাবনা আসার পর মানুষটি যদি সেই অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য হন তখন সেটা রোগ। অবসেসিভ কমপালসিভ ডিস অর্ডার। বা ও সি ডি।

প্রঃ অনেকে যে গুনে গুনে বারবার ঠাকুর নমস্কার করতে থাকেন— সেটাও কি রোগ?

উঃ হতে পারে। যদি এমন হয় যে, কেউ একটি নির্দিষ্ট বার নমস্কার করে শান্তি পাচ্ছেন না, মনে হচ্ছে কাজটা যেন সম্পূর্ণ হল না, তিনি কিছুটা বাতিক গ্রস্ত তো বটেই। কিন্তু এমন যদি হয় নমস্কার করে করেও অশান্তি যাচ্ছে না, পরের কাজ ভুলে গিয়ে দাঁড়িয়ে. নমস্কার করেই যাচ্ছেন—সেটা রোগের বেশ এগিয়ে যাওয়া রূপ।

প্রঃ খুঁতখুঁতেদের বাতিকগ্রস্ত বলা যায়? অনেকে আছেন কিছুতেই কোনও কাজ পছন্দ হয় না। বারবার করতে থাকেন।

উঃ অল্পস্বল্প খুঁতখুতুনি না থাকলে কোনও কাজই সুষ্ঠুভাবে করতে পারা যায় না। সেটা বাড়লে সামান্য বাতিক আছে বলা যায়। কিন্তু পুরোপুরি রোগ বলার আগে অনেকগুলি জিনিস মনে রাখতে হবে। যেমন,

(১) আসল কাজ তাড়াতাড়ি করার চেয়ে কাজের প্রতিটি ধাপ নিখুঁত থেকে নিখুঁততম করাই যদি এদের উদ্দেশ্য হয়, তার ফলে হয়তো আসল কাজটাই করা হয়ে উঠবে না। যেমন ধরুন, কেউ হয়তো হাসপাতাল বা নার্সিংহোমের রিসেপশনে কাজ করেন। মরণাপন্ন রোগী এল ভর্তি হওয়ার জন্য। সে জানে রোগী এলে আগে ফর্ম ফিলআপ করে টাকা পয়সা অ্যাডভান্স নিয়ে তবে তাঁকে ডাক্তারের কাছে পাঠাতে হবে। সে নিখুঁতভাবে আগে সেই কাজ করবে, রোগীর বাড়ির লোক যত চেঁচামেচিই করুক বা রোগীর অবস্থা খারাপ হয়ে যাক। আবার এই লোকটিকেই যদি এমারজেন্সি অ্যাডমিশন কাউন্টারে বসিয়ে দিতেন, বলে দিতেন আগে ডাক্তার ডাকবে তারপর ফর্ম ফিলাপ। সে তাই করত। অর্থাৎ এরা নিজের কাজের প্রতিটি ধাপের ব্যাপারে এত বেশি খুঁতহীন যে বিপদ ঘটতে পারে। যে পর্যায়ক্রমে তাঁর কাজ করার কথা ঠিক সেই পর্যায়ক্রমেই সে কাজ করে যাবে তাতে আসল লক্ষ্যে পৌঁছনো থাক বা না থাক।

(২) সাধারণত এরা কাজ থেকে কোনও আনন্দ পায় না। নিখুঁতভাবে কাজ করা নিয়ে কথা। কাজের আর কোনও উদ্দেশ্য নেই।

(৩) এরা সাধারণত খুব সৎ, বিবেকবান হয়। সবসময় মনে চিন্তা তাঁর জন্য যেন অন্যের কোনও ক্ষতি না হয়, নিজের ক্ষতি হয়তো হোক।

খুঁতখুতুনি এই পর্যায়ে পৌঁছলে মানুষটি যন্ত্রের মতো সব কাজ করে যায়। কিন্তু নিখুঁতভাবে করার তাগিদে কাজ আর শেষ হতে চায় না। একটা সময় আসে কাজ আর বিশেষ হয়ই না। অবসেশনাল স্লোনেস থেকে অবসেসিভ কমপালসিভ ডিসঅর্ডার। অর্থাৎ রোগ।

প্রঃ আরও তো অনেক রকম সমস্যা হয়। রাস্তায় বেরিয়ে মনে হয় হয়তো গ্যাস বন্ধ করে আসিনি বা ঘরে তালা দিতে ভুলে গেছি।

উঃ এক আধবার আমাদের সবারই মনে হতে পারে। কিন্তু যদি নিয়মিত মনে হয় এবং তার জন্য অর্ধেক রাস্তা থেকে বাড়ি ফিরে আসতে হয় তবে সেটা নিশ্চয়ই রোগ। নিয়মিত মনে হওয়া অবসেশন। এবং তার জন্য বাড়ি ফিরে আসতে বাধ্য হওয়া কমপালসিভ ডিসঅর্ডার। এমন অনেকে আছেন বারবার দরজা বন্ধ হয়েছে কি না

দেখতে দেখতে সারা রাত ঘুমোতেই পারেন না।

প্র: কেন এমন হয়?

উ: যে কোনও অবসেশনের জন্ম উদ্বেগ থেকে। হাতের ময়লা কিছুতেই পরিষ্কার হচ্ছে না বলে বারবার হাত ধুতে হচ্ছে, যদিও কাল্পনিক ভীতি। দরজা খোলা পেয়ে যথাসর্বস্ব চুরি হতে পারে এই ভয় থেকে বারবার দেখা দরজা বন্ধ হয়েছে কি না। এছাড়াও খুব অশান্তির ভাবনা থেকে মন সরানোর জন্য বাধ্য হয়ে উল্টো কিছু কাজ করেন কেউ। যেমন, যখনই তরকারি কাটেন মনে হয় কেউ যদি বাচ্চাটাকে এভাবে কেটে ফেলে। ফলে ভাবনাটা আসামাত্র ১-১০০ পর্যন্ত গুনতে শুরু করেন। বা হঠাৎ মনে হল বাবা অনেকদিন ধরে অসুস্থ, রাস্তায় বাঁদিক দিয়ে হাঁটার বদলে ডান দিক দিয়ে হাঁটলে বাবা সুস্থ হয়ে যাবেন। এইসব অকারণ উদ্বেগ বারবার ঘটতে থাকলে মানুষটি ওসিডির রোগী হযে যান।

প্র: কাদের এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি ?

উ: মা বাবা ভাইবোনের কারোর এই রোগ থাকলে শতকরা ৩৫ ভাগ সম্ভাবনা হওয়ার। এর কিছুটা বংশগত কারণে, কিছুটা চোখের সামনে শুচিবায়ুগ্রস্থ কাণ্ডকারখানা দেখার ফলে। ব্রেনের মধ্যে কিছু বাসায়নিকের গোলমালে বা কখনও মনেরই গভীর কোনও উদ্বেগেব ফলে এর সৃষ্টি। দেখা গেছে শতকরা ২-৩ জন মানুষ জীবনের কোনও না কোনও সময়ে অবসেশনে আক্রান্ত হন, বিশেষ করে যখন খুবই অশান্তি উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটে।

প্র: পরীক্ষার রেজাল্ট বেরনোব আগেও তো অশান্তি থেকে বারবার একই চিন্তা মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকে। বোধহয় পাশ করতে পারব না বা রেজাল্ট ভাল হবে না। এটাও অবসেশন?

উ: না, অবসেশনে যে চিন্তার জন্ম এবং ঘুরে ফিরে আসা তা কিন্তু কাল্পনিক। যেমন, কারোর হয়তো মনে হচ্ছে আকাশটা নীল কেন? সবুজ নয় কেন? ভেবে অস্থির লাগছে, মনে হচ্ছে পাগল হয়ে যাব। তবু ভাবনা বন্ধ হচ্ছেনা। এটা অবসেশন। ছোটবেলায় শুনেছে দু'শালিক দেখলে দিন ভাল যায়। সকালে এক শালিক দেখেছে ফলে সারাদিন ধরে দু'শালিক খুঁজে বেড়াচ্ছে। দেখতে পেলে দিন ভাল যাবে। তবে কাজকর্ম শুরু হবে।

পরীক্ষার চিন্তা, আত্মীয় পরিজন অসুস্থ হলে তার সুস্থতার চিন্তা বা অবসাদের সময় আমার দ্বারা আর কিছু হবেনা এই ভাবনা বারবার এলেও যেহেতু তার বাস্তবের সঙ্গে যোগ আছে তা অবসেশন নয়।

প্র: যে কোনও বয়সেই কি অবসেশন দেখা দিতে পারে?

উ: হতে পারে। তবে বেশি হয় ২০ বছরের আশপাশ সময় থেকে।

প্র: মেয়েদের বেশি হয়?

উ: কম বয়সে ছেলেদের বেশি হয়। তাছাড়া ছেলে এবং মেয়ের প্রায় সমান সমান।

প্র: অবসেশন সারে না?

উ: সারে। জটিল অবস্থায় ধরা পড়লেও প্রায়শই সারিয়ে তোলা যায়। তবে মারাত্মক

অবস্থায় পৌঁছে না গেলে লোকে একে রোগ বলেই মানতে চায় না। ফলে ডাক্তারের কাছে যায় না।

প্র: চিকিৎসা কি ওষুধ দিয়ে?

উ: জটিল অবস্থায় এলে প্রথমে ওষুধ দিয়ে কিছুটা স্বাভাবিক করা হয়। তারপর শুরু হয় বিহেভিয়ার থেরাপি। বিহেভিয়ার থেরাপি নানা রকম হয়।

(১) ই আর পি অর্থাৎ এক্সপোজার অ্যান্ড রেসপন্স প্রিভেনশন। যেমন , যাঁর নোংরা ভীতি আছে, তাঁর গায়ে একটা ময়লা কাপড় দিয়ে রাখা হল। ওই অবস্থায় তাঁকে রিল্যাক্স করতে হবে। প্রথম দিকে অনেকে ঘেন্নায় ফেলে দিতে চান। কিন্তু ধীরে ধীরে সয়ে যায় ব্যাপারটা।

(২) ফ্লাডিং— অর্থাৎ যে জিনিস থেকে দূরে থাকতে চাইছে তার মধ্যেই ডুবিয়ে দেওয়া। ধরুন অন্যের বাথরুমের ব্যাপারে ঘেন্না আছে, একটা বাথরুমেই খানিকক্ষণ ঢুকিয়ে রাখা হল।

(৩) সিস্টেমেটিক ডিসেন্সিটাইজেশন— অর্থাৎ ভয় ভীতির ব্যাপার ধাপে ধাপে কমানো। অবসেশনাল ফোবিয়া বলে অমূলক ভয়ের কবলে যাঁরা বারে বারে পড়েন তাঁদের জন্য এই পদ্ধতি। কারোর রোগ, জীবাণু, নোংরা ইত্যাদিতে খুব ভয়। রান্নাঘরের কোনও জিনিস হয়তো কাজের লোক ছুঁয়ে দিয়েছে — সব আবার ধোয়া শুরু করেন। কেউ হয়তো ভাবছেন ভাইকে গুলি করে মেরে ফেলেছে। ভাই এর নামের আদ্যক্ষর 'স'। 'স' অক্ষর কোথাও দেখলেই অশান্তি। ফলে 'স' বর্জন করতে চেষ্টা করছেন। কারোর আবাব সাপে এত ভয় যে 'সাপ' শব্দ কোথাও লেখা আছে দেখলেও গা কাঁপতে শুরু করে। ইত্যাদি। এদের এই ভয়ের মধ্যে থেকে বার করে আনার জন্য অল্প অল্প করে সইয়ে সইয়ে ভয়ের মুখোমুখি করা হয়। একসময় ব্যাপারটা সহ্য হয়ে যায়।

(৪) থট স্টপিং—অর্থাৎ চিন্তা বন্ধ করার চেষ্টা। হাতে একটা রাবার ব্যান্ড বেঁধে দেওয়া হয়। বলা হয় চিন্তা মাথায় এলেই জোরে রাবার ব্যান্ড টেনে ছেড়ে দিতে হবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাবনা বন্ধ করার চেষ্টা করতে হবে। অথবা ভাবনা এলেই জোরে বলতে হবে 'না'। এবং আবার ভাবনা বন্ধ করার চেষ্টা করতে হবে। ইত্যাদি।

প্র: পেটের রোগে যাঁরা বেশি ভোগেন তাঁদের অনেকেরও তো হাত ধোয়ার বাতিক থাকে?

উ: পেটের রোগ থাকলে হাত ধুয়ে খাওয়াই ভাল। তবে দরকারের চেয়ে বেশি বার যদি কেউ ধুতে থাকেন এবং এতবার ধুতে হচ্ছে বলে যদি নিজের মনে অশান্তি হতে থাকে এবং অন্যেরা বিরক্ত হয়—অবসেশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে অনেক সময় কঠিন অসুখে ভুগে ওঠার পর সাময়িকভাবে কিছু অবসেশন দেখা দেয়। অসুখ ঠিক হয়ে যাওয়ার কিছুদিনের মধ্যে অবসেশনও ঠিক হয়ে যায়।

প্র: গর্ভাবস্থাতেও নাকি অবসেশন হয়?

উ: হতে পারে। তবে তা সাময়িক।

প্র: অবসেশন এড়ানোর কোনও পথ আছে কি?

উ: যদি নিজের মধ্যে অবসেশনের লক্ষণ টের পান সচেতন হয়ে যান। বিহেভিয়ার থেরাপির যে পদ্ধতিগুলির কথা বলেছি তার মধ্যে 'থট স্টপিং' পদ্ধতি বিশেষ করে অভ্যেস করতে থাকুন। এই পদ্ধতি কাজে না এলে কী কারণে এরকম হচ্ছে সেটা খুঁজে দেখতে হবে। ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

চেষ্টা করুন ভাববার মতো ফাঁকা সময় যেন হাতে না থাকে। একা থাকলে ভাবনা বেশি মাথায় আসে। তাই অনেকের সঙ্গে থাকতে চেষ্টা করুন। মনে জোর আনুন এই ভেবে যে এটা যদি রোগের পর্যায়েও চলে যায়, চিকিৎসায় কিন্তু সম্পূর্ণ সারবে।

প্র: আপনি বলেছেন পরিবেশগত কারণে বাচ্চার মধ্যে অবসেশন দেখা দিতে পারে। সেটা এড়ানোর কোনও পথ আছে?

উ: আছে। তার প্রথম ধাপ হল নিজের বা বাড়ির অন্য কারোর অবসেশন থাকলে দ্রুত চিকিৎসা করিয়ে তাঁকে সুস্থ করে তোলা। বাচ্চা যেন সুচিবায়ুগ্রস্ত কাউকে চোখের সামনে না দেখে। ভুল জিনিস শেখাবেন না বাচ্চাকে। যেমন, এক কাধে হাত দিলে মা মরে যায়, এক শালিক দেখলে দিন খারাপ যায় বা বেড়াল রাস্তা পার হলে অ্যাক্সিডেন্ট হবে ইত্যাদি। আজগুবি ধারণা মাথায় ঢুকে যাওয়া ঠিক নয়। বাচ্চাকে মানুষ করার ব্যাপারে খুব বেশি কড়াকড়ি করবেন না। দেখা গেছে ছোটবেলায় খুব কড়া 'টয়লেট ট্রেনিং' করালে বাচ্চার মধ্যে সমস্যা দেখা দিতে পারে।

সানস্ট্রোক হলে রোগী মারাও যেতে পারে

ডাঃ সুব্রত মৈত্র

দূরভাষ : ৪৫৬-৭০৭৫

প্র: দুর্দান্ত গরমে অনেক সময় জ্বর এসে যায়, এসময়ে কী করব?

উ: একে বলে হিট হাইপারপাইরেক্সিয়া। প্রথম দিকে ঝিমুনি বা ক্লান্তি থেকে হঠাৎ করে জ্বর আসে। ১০৪ ডিগ্রি থেকে ১০৫ ডিগ্রি ফারেনহাইটের মতো। এক্ষেত্রে রোগীকে গরম থেকে সরিয়ে ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়ে বাতাস করলে উপকার পাওয়া যায়। জ্বর যতক্ষণ না কমে বারে বারে ঠাণ্ডা জলে মাথা ধুইয়ে দেওয়া অথবা জলপটি দেওয়া যেতে পারে। সঙ্গে জ্বর কমাবার ট্যাবলেট, প্যারাসিটামল ৬ ঘণ্টা বাদে বাদে খাওয়ানো যেতে পারে।

প্র: একেই কি সানস্ট্রোক বলে?

উ: না, একে সানস্ট্রোক বলে না। সানস্ট্রোকে হঠাৎ করে প্রচুর জ্বর (১০৫-১০৬ ডিগ্রি) এসে যায়। রোগী অজ্ঞান হয়ে যান। নাড়ির গতি, শ্বাসপ্রশ্বাসের হার বাড়ে। হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা শুরু না করলে রোগী কোমা স্টেজে চলে যেতে পারেন। মৃত্যুও হওয়া সম্ভব।

প্র: মৃত্যু! অর্থাৎ এরকম উপসর্গ দেখা দিলে কিছু না করে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে?

উ: হাসপাতালে তো নিয়ে যেতেই হবে, তবে তার আগে কিছু প্রাথমিক চিকিৎসাও চালু করে দেওয়া দরকার। যেমন ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়ে দেওয়া, বরফ জলে ভেজা কাপড় দিয়ে শরীর জড়িয়ে রেখে জোরে ফ্যান চালিয়ে দেওয়া বা বাতাস করা এবং জ্বর কমাবার ওষুধ খাওয়ানো।

প্র: সানস্ট্রোক এড়িয়ে যাওয়ার কোনও পথ নেই?

উ: চড়া রোদের নিচে দাঁড়িয়ে যাঁদের কাজ করতে হয়, তাঁদের সানস্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। চেষ্টা করতে হবে একটানা বেশিক্ষণ চড়া রোদের নীচে না থাকার। খোলামেলা সুতির পোশাক পরতে হবে। ছাতা, সানগ্লাস ব্যাবহার করা খুব জরুরি। সঙ্গে নুন

চিনির সরবত রাখা ভাল। মাঝে মধ্যেই সরবত নাহলে জল নয়তো কোল্ডড্রিঙ্কস খেয়ে তবে আবার রোদে গেলে বিপদের সম্ভাবনা কম।

প্র: কিন্তু ক্লান্তি তো আসবে? দারুন গরমে ঘেমে নেয়ে অবসন্ন বোধ করলে তার হাত থেকে কীভাবে মুক্তি পাওয়া যাবে?

উ: বেশি ঘেমে গেলে ক্লান্তি আসার কারণ ঘামের সঙ্গে শরীবের প্রয়োজনীয় লবণ বেরিয়ে যাওয়া। যার ফলে অবসাদ ছাড়াও মাথা ঘোরা, বমি বমি ভাব, পেট ও হাতে পায়ে খিঁচুনি, ঘুম না হওয়া ইত্যাদি নানারকম উপসর্গ দেখা দিতে পারে। এ সময় ও আর এস, নুন চিনির সরবত, ডাব, গ্লুকোজ ইত্যাদি খুব উপকারে আসে। তার সঙ্গে ঠাণ্ডা জলে ভাল করে স্নান করে নিলে আরও তাড়াতাড়ি আরাম পাওয়া যায়।

প্র: ঘামাচি দূরে রাখতেও তো দিনে দু'তিনবার স্নান করতে বলেন আপনারা?

উ: হ্যাঁ, ভ্যাপসা গরমে দিনে দু'তিন বার ঠাণ্ডা জলে স্নান করলে ঘামাচির প্রকোপ কিছুটা এড়ানো যায়। খোলামেলা সুতির পো শাক পরা দরকার। চেষ্টা করা দরকার দিন রাতের বেশির ভাগ সময় ঠাণ্ডা অথবা হাওয়া বাতাসযুক্ত জায়গায় থাকার। এবং এক নাগাড়ে কয়েক ঘন্টা গায়ে জামা, পায়ে মোজা বা বন্ধ জুতো রাখা উচিত নয়।

প্র: আর ঘামাচি নিবোধক পাউডার?

উ: মাইকোনাজোল পাউডার কিছুটা কাজে আসে। তবে অনেকখানি লাগালে ঘামের সঙ্গে মিশে ঘাম বেবোনোব পথ বন্ধ কবে দেয়। ফলে ঘামাচি আরও বেশি হয। স্নানের পর ভাল করে গা শুকিযে নিয়ে হাল্‌কা করে পাউডারেব প্রলেপ দিলে উপকার পাওয়া যায়

প্র: ঘামাচি দূর কববার জন্য বারবার ঠাণ্ডা জলে স্নান করলে যদি ঠাণ্ডা লেগে যায়?

উ: গরম থেকে এসে সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা জল খেলে বা স্নান কবলে অথবা ঠাণ্ডা ঘরে এসে বসলে ঠাণ্ডা লেগে যেতে পাবে। আচমকা শবীবের তাপমাত্রাব তারতম্য ঘটার জন্য এরকম হয। গরম থেকে এসে একটু বিশ্রাম নিয়ে তবে জল খাওয়া, স্নান করা বা এয়ার কুলার চালানো উচিত। ফ্যান অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে চালানো যায। হাঁপানি বা অন্যান্য ধরনের শ্বাসকষ্ট যাঁদের আছে, আচমকা তাপমাত্রাব তারতম্যে তাঁদের কষ্ট বেড়ে যেতে পাবে।

প্র: গরমে তো পেটেব অসুখেব প্রকোপ বাড়ে। একে ঠেকাব কী করে?

উ: যে কোনও ঋতুতেই পেট গবম বা ডায়েরিয়া হতে পারে। গবমে জলের চাহিদা বাড়ে শরীরের। ফলে সাধারণ ভাবে যাঁরা বাইরের জল এড়িয়ে চলেন তাঁদেরও বাধ্য হয়ে রাস্তাঘাটের অপবিশোধিত জল, ফলের রস, ঠাণ্ডা পানীয় ইত্যাদি খেতে হয়। ফলে পেটের অসুখ বাড়ে। একে এড়াতে গেলে কয়েকটি বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে।

(১) জল ফুটিয়ে অথবা জিওলিন বা হ্যালোজন ট্যাবলেট মিশিয়ে খেতে হবে। যাঁরা বাড়িতে ফিল্টার ব্যবহার কবেন তাঁদের উচিত জল ফুটিয়ে তারপর ফিল্টার করা। অথবা ফিল্টার করার পর হ্যালোজেন মেশানো। এবং নিয়মিত ফিল্টার ক্যান্ডেল পরিস্কার করা।

(২) খাবারে যাতে মাছি না বসে সেদিকে খেয়াল রাখা দরকার। ফ্রিজের খাবার

ভালভাবে ফুটিয়ে তবে খেতে হবে।

(৩) রাস্তাঘাটে জল, সরবত, ফলের রস, কাটা ফল, আঢাকা খাবার খাবেন না। সম্ভব হলে জল সঙ্গে নিয়ে বেরোবেন। অথবা একটি জিওলিনের শিশি। খাওয়ার মিনিট পাঁচেক আগে একগ্লাস জলে ১-২ ফোঁটা মিশিয়ে নিলে জল জীবাণুমুক্ত হয়ে যায়। রাস্তার খাবার খেতে হলে গরম খাবার অথবা বিস্কুট, মুড়ি জাতীয় শুকনো খাবার খাওয়া উচিত। বাসনও গরম জলে ধুয়ে নেওয়া দরকার।

(৪) কাঁচা শাকসবজি বা খোসাশুদ্ধ ফল খানিকক্ষণ হালকা পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট মেশানো জলে ভিজিয়ে রেখে, ভাল করে ধুয়ে তারপর ব্যাবহার করতে হবে।

(৫) খাওয়ার আগে হাত এবং বাসনপত্র পরিষ্কার জলে ধুয়ে নেওয়া উচিত।

মোটামুটি এই সমস্ত নিয়ম কানুন মেনে চললে গরমে জীবাণু সংক্রমণের দরুণ ডায়েরিয়া কম হবে।

প্র: গরমে বদ হজম বেশি হয়?

উ: বদহজম সব সময়ই হতে পারে। অতিরিক্ত গরম পড়লে অনেক সময় ঘুম না হওয়ার জন্য হজমের অসুবিধে হয়। একে এড়াতে একটু হাল্‌কা খাবার দাবার খান। বিশেষ করে রাত্রের দিকে। সমস্যা কম থাকবে।

প্র: গরম পড়ার ঠিক মুখে অনেক সময় ঘরে ঘরে জলবসন্ত দেখা দেয়। নিমপাতা খেলে বা নিম হলুদ মেখে স্নান করলে কি একে প্রতিরোধ করা যায়?

উ: জলবসন্ত ভাইরাস ঘটিত রোগ। এভাবে তাকে প্রতিরোধ করা যায় না। যেহেতু রোগটা ছোঁয়াচে, দ্রুত রোগ নির্ণয় করে রোগীকে আলাদা করে ফেললে রোগ ছড়িয়ে পড়ার হাত থেকে বাঁচা যায়। বিশেষ করে বাড়িতে বাচ্চা, বয়স্ক মানুষ বা গর্ভবতী মহিলা যদি থাকেন। অতএব গরমের শুরুতে গায়ে গোটা গোটা র‍্যাশ দেখা দিলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। হালকা পথ্য দিতে হবে রোগীকে। এবং ৭ থেকে ১০ দিন সবার থেকে আলাদা রাখতে হবে।

প্র: গরম এবং বৃষ্টি পর্যায়ক্রমে চলতে থাকলে জ্বর হতে থাকে। একেও কি সেভাবে প্রতিরোধ করার পথ নেই।

উ: এই সময় ভাইরাল ফিভার হতে পারে। ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড হওয়াও বিচিত্র নয়। কাজেই দু'এক দিনের বেশি জ্বর থাকলে অবশ্যই ডাক্তার দেখাবেন। এবং তাঁর পরামর্শমতো রক্ত পরীক্ষা করিয়ে জ্বরটা কী থেকে হয়েছে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নেবেন। না হলে সামান্য জ্বর থেকে বিপদ সৃষ্টি হতে পারে।

প্র: আন্ত্রিক, জন্ডিস, টাইফয়েড, কলেরা ইত্যাদি রোগের প্রকোপও গরমে বাড়ে?

উ: গরমের শুরু থেকে এদের উৎপাত শুরু হয়। চলে শীতের মাঝামাঝি পর্যন্ত। দূষিত জল এবং খাবার এদের উৎস। জল এবং খাবার ভাল করে ফুটিয়ে খেলে এবং খাওয়ার আগে হাত এবং বাসনপত্র ভাল করে ধুয়ে নিলে এ রোগ ঠেকানো যাবে। গ্রামেগঞ্জে যেখানে একই পুকুরের জল স্নান, খাওয়া, রান্না এবং বাসনপত্র ধোয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়—সেখানে সমস্যা খুব বেশি দেখা দেয়।

প্র: আন্ত্রিক, কলেরা থেকে তো মৃত্যুর খবরও শোনা যায়।

উ: আন্ত্রিক এবং কলেরাতে ঘন ঘন পাতলা পায়খানা এবং বমির জন্য শরীর থেকে প্রয়োজনীয় জল এবং লবণ বেরিয়ে যেতে থাকে। শরীরের কোষগুলি জলশূন্য হতে শুরু করে। জিভ শুকিয়ে আসা, চোখ বসে যাওয়া, হাত পায়ে খিঁচুনি ইত্যাদি দেখা দেয়। এ অবস্থায় সঠিক ব্যবস্থা না নিলে জলশূন্যতা থেকে শরীরের অভ্যন্তরীণ প্রত্যঙ্গ , বিশেষ করে কিডনির কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে মৃত্যুও হতে পারে।

প্র: কলেরা, আন্ত্রিক থেকে কিডনি খারাপ হয়ে যায়?

উ: আন্ত্রিক, কলেরা ইত্যাদি অসুখে জলশূন্যতার মোকাবিলা করা সব থেকে জরুরি। না হলে কিডনি সাময়িক ভাবে খারাপ হয়ে যেতে পারে।

প্র: জলশূন্যতার মোকাবিলা করার ঘরোয়া পদ্ধতিও তো আছে।

উ: সে তো আছেই। বমি পায়খানা শুরু হওয়ামাত্র ও আর এস পাউডার জলে গুলে অল্প অল্প করে খাওয়ানো শুরু করা দরকার। ও আর এস না থাকলে এক গ্লাস ফোটানো ঠাণ্ডা জলে ৬ চা-চামচ চিনি বা ৩ চা-চামচ গ্লুকোজ, আধ চা-চামচ লবণ মিশিয়ে ঘরোয়া ও আর এস তৈরি করা যায়। বমি বেশি হতে থাকলে অবশ্য এতে কাজ হয় না। হাসপাতাল বা নার্সিং হোমে নিয়ে গিয়ে স্যালাইন দিতে হয়।

আলতা লাগালে হাজা সারে না

ডাঃ রাজীব শীল

দূরভাষ : ৯৮৩১০-৮১০৮৮

প্রঃ বর্ষাকালে দাদ, হাজার বাড়বাড়ন্ত?

উঃ স্যাতসেঁতে আবহাওয়ায় ছত্রাক সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। ফলে বাড়ে দাদ হাজার প্রকোপ। আমাদের দেশে সাধারণত ট্রাইকোফাইটন জাতীয় ছত্রাকের প্রকোপ বেশি। শরীরের যে সমস্ত জায়গায় ঘাম ও ময়লা জমে থাকার সম্ভাবনা বেশি যেমন, বাহুমূলে, কুচকিতে, অন্তর্বাসের নীচে, এই ধরনের ছত্রাকের আক্রমণে সেখানে দাদ হতে পারে। যাঁরা বেশি জল ঘাঁটাঘাঁটি করেন তাঁদের হাত ও পায়ের আঙুলের ফাঁকে হাজা হয়, ভিন্ন ধরনের ছত্রাকের আক্রমণে। কানের ভিতরেও ছত্রাক সংক্রমণ হতে পারে।

প্রঃ বর্ষাকালে যে অনেক সময় কানে ব্যথা হয় তা কি ছত্রাক সংক্রমণের দরুন?

উঃ সব সময় নয়। তবে ছত্রাক সংক্রমণ হলেও কানে হঠাৎ করে খুব ব্যথা হয়। কান দপদপ করে। চুলকোয়। কান পরিষ্কার করলে ভেজা ব্লটিং পেপার বা কয়লার গুড়োর মতো ময়লা বের হয়।

প্রঃ এদের এড়াতে কী করব?

উঃ (১) শুকনো ঢিলে সুতির পোশাক পরবেন। পোশাক যেন পরিষ্কার থাকে।

(২) শরীর সব সময় পরিষ্কার রাখতে হবে। স্নানের পর বা বাইরে থেকে ঘুরে আসার পর শরীরের জল বা ঘাম ভাল করে মুছে অথবা মেডিকেটেড সাবান দিয়ে ধুয়ে হালকা করে পাউডার লাগাতে হবে। স্নানের সময় কানে যাতে জল না ঢোকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

(৩) ঘামে ভেজা শরীরে ছত্রাক বাসা বাঁধে বেশি। যে সমস্ত জায়গায় বেশি ঘাম জমে সেখানে প্রচুর পাউডার ঢেলে রাখার বদলে ঘাম মুছে শুকনো রাখার চেষ্টা করা দরকার।

(৪) হাত ও পায়ের আঙুলের ফাঁকে যেন ময়লা না জমে।

(৫) জল কাদা এড়াতে গামবুট বা প্লাস্টিকের জুতো পরতে হবে। যাঁদের প্লাস্টিকে এলার্জি আছে তাঁরা বাড়ি ফিরেই পা শুকনো করে ধুয়ে মুছে নেবেন।

(৬) বেশি জল ঘাঁটতে হলে রবারের গ্লাভস ব্যবহার করা যায়। তবে দীর্ঘক্ষণ ব্যবহারে এর থেকে কিছু চর্মরোগ হতে পারে।

(৭) সমস্যা হলে চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

প্র: আলতা পরলে হাজা কমে যায়?

উ: একদম নয়।

প্র: তাহলে দাদ, হাজা হলে কী করতে হবে?

উ: রাস্তাঘাটে যে দাদ হাজার মলম কিনতে পাওয়া যায় তা কখনওই ব্যবহার করবেন না। প্রায় ক্ষেত্রেই এগুলোতে বিশেষ কিছু থাকে না। কিছু ক্ষেত্রে উল্টোপাল্টা জিনিস থাকার দরুনরোগের হয়তো সাময়িক আরাম হয়। কিন্তু চামড়ার ক্ষতি হয়। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত ব্যবহার করা উচিত মাইকোনাজল, কোট্রাইমাজল, ইকোনাজল জাতীয় লাগানোর ওষুধ। কানেও এই জাতীয় ড্রপ ব্যবহার করা যায়। কখনও মুখে খাওয়ার ওষুধও দরকার হতে পারে। কিন্তু রোগ ওই পর্যায়ে পৌঁছলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ছাড়া কিছু করা উচিত নয়।

প্র: বর্ষাকালে আমাশা বেশি হয়?

উ: বর্ষাকালে ব্যাপক জলদূষণের ফলে আমাশা, জিয়ার্ডিয়া, কৃমি সব কিছুরই সম্ভাবনা বাড়ে।

প্র: কীভাবে এড়ানো যাবে ?

উ: খাবার এবং জলের ব্যাপারে সতর্ক হয়ে। বাড়িতে কারও এ রোগ হয়ে থাকলে আরও সাবধানতা দরকার।

প্র: জল এবং খাবারের ব্যাপারে সতর্ক হলে জন্ডিসও এড়ানো যাবে?

উ: জন্ডিস নানা কারণে হতে পারে। এর মধ্যে ইনফেকটিভ হেপাটাইটিস অর্থাৎ ভাইরাস এ এবং ই-র দ্বারা যে জন্ডিস হয় তার প্রকোপ বাড়ে। ভাইরাস ই জন্ডিস কখনও কখনও। মারাত্মক রূপ নিতে পারে। এমন কি ঠিকঠাক সাবধানতা না নিলে মহামারী হওয়াও অসম্ভব নয়।

এই জীবাণু শরীরে ঢোকে ফিকাল ওরাল রুট ধরে। অর্থাৎ সংক্রামক মলমূত্রের মাধ্যমে দূষিত জল খাওয়া, রান্না করা অথবা বাসন ধোয়ার কাজে ব্যবহার করলে। গ্রামাঞ্চলে কাছাকাছি কারোর ইনফেকটিভ হেপাটাইটিস হলে সেই পুকুরের জল স্নান, জামাকাপড় ধোয়াব কাজেও ব্যবহার করা ঠিক নয়। অবশ্য এই ভাইরাস দুটি রক্তের মাধ্যমেও শরীরে ঢুকতে পারে।

প্র: ফিকাল ওরাল রুট ধরে আন্ত্রিক, কলেরা, টাইফয়েড ইত্যাদির জীবাণুও তো শরীরে ঢুকতে পারে ?

উ: হ্যাঁ, আসলে বর্ষাকালে ফাংগাস, ব্যাকটিরিয়া, ভাইরাসের প্রকোপ এত বাড়াবাড়ি রকমের হয় যে সাধারণ আমাশা থেকে রক্ত আমাশা, আন্ত্রিক, কলেরা, টাইফয়েড

সব রোগেরই বাড়বাড়ন্ত হতে পারে। তার উপর আমাদের অজ্ঞতার দরুন রোগের প্রকোপ বাড়ে। যেমন, এখনও আমরা টয়লেট পেপার ব্যবহারের কথা ভাবিই না। কিন্তু অনেক ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাসই জল সাবানে পুরোপুরি ধুয়ে যায় না। ফলে মানুষটি খাবার দাবার তৈরি বা পরিবেশনের সঙ্গে যুক্ত থাকলে খাবারের মাধ্যমে অতি সহজেই জীবাণুরা ছড়িয়ে পড়তে পারে। রাস্তার কাটা ফল, অঢাকা খাবার, রঙিন সরবত বা আখের রস এখনও নির্বিকারে খাওয়া চলে। আর চলে যত্র তত্র মল মূত্র ত্যাগ। থুথু ফেলা। এসব ত্যাগ করতে পরালে বর্ষায় বিভিন্ন রোগের প্রকোপ অবশ্যই কমবে।

প্র: চিকিৎসা?

উ: ভাইরাস সংক্রমণে শরীরে জল লবণের ঘাটতি পূরণ করা এবং উপসর্গ অনুযায়ী চিকিৎসা চলে। ব্যাকটেরিযা সংক্রমণ ঠেকাতে দেওয়া হয় অ্যান্টিবায়োটিক। অবশ্য ব্যাকটেরিযা ধবংস করাও আজকাল বেশ শক্ত কাজ। কাবণ অনেকদিন যাবৎ কথায় কথায় অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার বদভ্যাসের ফলে ব্যাকটেরিয়াদের প্রতিরোধ শক্তি অনেকগুণ বেড়ে গেছে। কাজেই চিরাচবিত ওষুধ নয়, চিকিৎসা করতে হয় অত্যাধুনিক ওষুধপত্রেব সাহায্যে । তাব সঙ্গে চলে ওবাল বিহাইড্রেশন থেবাপি। অবস্থা জটিল হলে স্যালাইন।

গর্ভনিরোধক বড়ি খেলে জরায়ু ক্যান্সার হয় না

ডাঃ প্রমথেশ দাশ মহাপাত্র

দূরভাষ : ২৪০-২৯৮৬

প্র: রজঃনিবৃত্তি হতে দেরি হলে অনেকে ভাবেন বুঝি জরায়ুতে ক্যান্সার হল। এই ভয়ের কি কোনও ভিত্তি আছে?

উ: ৫০ বছর বয়স পেরিয়ে গেলেও যদি রজঃনিবৃত্তি না হয়, ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার। অনেক সময় সত্যিই এর পেছনে ক্যান্সারের বীজ লুকিয়ে থাকে।

প্র: পিরিয়ডের সময় যাঁদের অতিরিক্ত রক্তপাত হয়?

উ: অতিরিক্ত রক্তপাত জরায়ু ক্যান্সারের প্রাথমিক উপসর্গ হতে পারে। এরকম হলে ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

প্র: কী ধরনের উপসর্গ দেখা দিলে বুঝব জরায়ু ক্যান্সার হয়েছে বা হতে চলেছে?

উ: জরায়ু ক্যান্সারকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। জরায়ু মুখের ক্যান্সার এবং জরায়ুর উপর অংশের ক্যান্সার। জরায়ু মুখের ক্যান্সারে শুরুতে সাদা স্রাব ছাড়া আর তেমন কোন উপসর্গ থাকে না। রোগ এগোতে থাকলে শুরু হয় রক্তপাত। পিরিয়ডের সময় ছাড়া অন্য সময়ও রক্তপাত হতে থাকে। রজঃনিবৃত্তির পর এমন কি সহবাসের সময়ও রক্তপাত হতে পারে। ধীরে ধীরে তলপেটে ব্যথা শুরু হয়। পায়খানা প্রস্রাব করার সময়ও তলপেটে ব্যথা হয়। জরায়ুর উপর অংশের ক্যান্সারেও রক্তপাত প্রধান উপসর্গ। সঙ্গে সাদা স্রাব, তলপেটে ব্যথা ইত্যাদিও থাকতে পারে।

প্র: একে প্রতিরোধ করা যায় না?

উ: *জরায়ু মুখ ক্যান্সারের প্রতিটি কারণই প্রতিরোধযোগ্য। যেমন ১৮ বছর বয়সের নীচে শারীরিক সম্পর্ক তৈরি না করা, একাধিক পুরুষ সঙ্গী না থাকা, ধূমপান না করা,* জরায়ু মুখে কোনও সংক্রমণ বা যৌন অসুখ দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা করে সুস্থ হয়ে যাওয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা ইত্যাদি। এছাড়া উপসর্গ থাকুক বা না থাকুক ৩৫ এর উপর বয়স হলে নিয়মিত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করা জরুরি। এবং ৭০ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতি ৩ বছর অন্তর সারভাইকাল স্ক্রিনিং বা প্যাপ টেস্ট

করা উচিত। এই টেস্টের উদ্দেশ্য ক্যান্সার হওয়ার আগেই রোগটিকে চিনে ফেলা। জরায়ুর উপর অংশের ক্যান্সার প্রতিরোধ করতে চাইলে কয়েকটি ব্যাপার খেয়াল রাখা দরকার। দেখা গেছে যে সমস্ত মহিলার বাচ্চা হয়নি বা কম বাচ্চা হয়েছে তাঁদের মধ্যে এই ধরনের ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এঁদের ওজন স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি হলে এবং উচ্চ রক্তচাপ, হাইপোথাইরয়েডিজ্‌ম বা ডায়াবেটিসের কোনও একটা থাকলে সে সম্ভাবনা আরও বাড়ে। অতএব এই ধরনের মহিলারা ৩৫ বছর বয়স হলেই নিয়মিত স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলবেন। রক্তপাতের হিসেবে সামান্যতম এদিক ওদিক হলেও তা ডাক্তারকে জানাতে ভুলবেন না।

প্র: বাচ্চা বেশি হলেও তো জরায়ু ক্যান্সার হতে পারে?

উ: হ্যাঁ, জরায়ুমুখের ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

প্র: গর্ভনিরোধক বড়ি খেলে এই জাতীয় রোগ হয়?

উ: না।

প্র: আব হর্মোন বিপ্লেসমেণ্ট থেরাপি করালে?

উ: ডাক্তারের তত্ত্বাবধান ছাড়া হর্মোন রিপ্লেসমেণ্ট থেরাপি করা উচিত নয়।

প্র: ক্যান্সার হলে চিকিৎসা কি জরায়ু কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া?

উ: অপারেশন, রেডিওথেরাপি বা কেমোথেরাপির এক বা একাধিক দরকার হতে পারে। প্রাথমিক অবস্থায় জরায়ু অপারেশনেই কাজ হয়। কিন্তু রোগ ছড়িয়ে পড়লে ওভারি, ফ্যালোপিয়ান টিউব, লিম্‌ফনোড ইত্যাদিও বাদ দিতে হয়। তারপরও রোগের গতি রুখতে কেমোথেরাপি বা বেডিওথেরাপি করার দরকার হতে পারে।

প্র: কিন্তু রোগের প্রথম অবস্থাতেও তো অনেক সময় ওভাবি বাদ দেওয়া হয়?

উ: জরায়ুতে ক্যান্সার হলে পববর্তী কালে ওভারিতেও তা ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। রোগীকে পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা হয়। এবং ৪৫-৫০ এর মধ্যে বয়স হলে অনেকসময় রোগীর যদি আপত্তি থাকে, ওভারি বাদ দেওয়া হয় না। কিন্তু ৫০ এর উপর বয়স হলে আমরা আর ঝুঁকি নিই না।

প্র: ওভারি ক্যান্সার কি বংশগত কারণে হতে পারে?

উ: সম্ভাবনা আছে। মা, বোন, মাসি, পিসি কারোর এই রোগ থাকলে সাবধান হওয়া দরকার।

প্র: কী করে বোঝা যাবে ওভারি আক্রান্ত হয়েছে?

উ: প্রথম দিকে খুব অস্পষ্ট কিছু উপসর্গ যেমন পেট ব্যথা, অল্প স্বল্প হজমের গণ্ডগোল, কোষ্ঠবদ্ধতা, দুর্বলতা ইত্যাদি থাকে। পরের দিকেও তেমন বিশেষ কিছু বোঝা যায় না। তবে বংশে কারোর এ রোগ থাকলে সামান্য উপসর্গ দেখা দিলেও ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার।

প্র: এই সমস্ত ক্যান্সারে সাফল্যের হার কী রকম?

উ: প্রথম অবস্থায় ধরা পড়লে চিকিৎসায় ভাল ফল পাওয়া যায়।

প্র: চিকিৎসা চলাকালীন স্বাভাবিক বিবাহিত জীবনযাপন করা যায়?

উ: অপারেশন এবং কেমোথেরাপিব পর অসুবিধে নেই। কিন্তু রেডিওথেরাপি করার দরকার হলে তা আর সম্ভব হয় না।

ছেলেদেরও ব্রেস্ট ক্যান্সার হয়

ডাঃ জি. এস. ভট্টাচার্য

দূরভাষ : ৯৮৩১০১১৫১৭

প্র: ছেলেদেরও ব্রেস্ট ক্যান্সার হতে পারে?

উ: হতে পারে। তবে সম্ভাবনা খুব কম। ১০০ জন ব্রেস্ট ক্যান্সারে আক্রান্ত মানুষের মধ্যে ১জন পুরুষ।

প্র: ব্রেস্টে মাংসপিণ্ড দেখা দেওয়া মানেই কি ক্যান্সার?

উ: অধিকাংশ ক্ষেত্রে নয়। ব্রেষ্টে কোনও রকম অস্বাভাবিকতা নজরে এলে প্রথমে ম্যামোগ্রাম করা হয়। তারপর দরকার মতো আলট্রাসনোগ্রাফি, বায়োপ্সি ইত্যাদি করে টিউমারের চরিত্র নির্ধারণ করা হয়।

প্র: ম্যামোগ্রাফি করে সবসময় রোগ ধরা পড়ে?

উ: না, ৪৫ এর নীচে বয়স হলে ম্যামোগ্রাফি করে তেমন কিছু বোঝা যায় না। সেক্ষেত্রে বায়োপ্সি এবং অন্যান্য পদ্ধতির সাহায্যে রোগ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে হয়।

প্র: বংশগত কারণে কি ব্রেস্ট ক্যান্সার হতে পারে?

উ: হ্যাঁ, মা বোন, মাসি, পিসির মধ্যে কারোর থাকলে সাবধান হওয়া দরকার। বিশেষ করে যদি কম বয়সে দুটো ব্রেস্টই-আক্রান্ত হয়ে থাকে।

প্র: কি সাবধানতা নিতে হবে?

উ: ১৮-১৯ বছর বয়স থেকে কয়েকটি জিনিস খেয়াল রাখতে হবে।

(১) ব্রেস্টের কোথাও কোনও পরিবর্তন নজরে এলে যেমন কোনও মাংসপিণ্ড দেখা দিলে, স্তন বৃন্ত থেকে জলীয় কিছু বেরোতে থাকলে, বাহুমূল বা কণ্ঠার কাছে কোনও গ্রন্থির স্ফীতি দেখা দিলে অবিলম্বে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে।

(২) ৩৫এর উপর বয়স হলে এসবের সঙ্গে দু'বছর অন্তর অন্তর ম্যামোগ্রাম করতে হবে।

(৪) ব্রেস্ট ক্যান্সারের সম্ভাবনা বেশি মনে হলে অনেকসময় অ্যান্টিইস্ট্রোজিনিক কিছু হরমোন যেমন ট্যামোক্সিফেন জাতীয় ওষুধ বছর পাঁচেকের জন্য খেতে হতে পারে।

প্র: ব্রেস্ট ক্যান্সার কি যে কোন বয়সে হতে পারে?

উ: হ্যাঁ, তবে বেশি সম্ভাবনা রজঃনিবৃত্তির পর। অর্থাৎ ৪৫-৫০ বছর বয়স নাগাদ।

প্র: রজঃনিবৃত্তির পর হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি বা এইচ আর টি করালে ব্রেস্ট ক্যান্সারের সম্ভাবনা আরো বাড়ে?

উ: সব চিকিৎসারই কিছু না কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে। এইচ আর টিতে যেমন জরায়ু এবং ব্রেস্ট ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা। স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মতো চিকিৎসা চালালে অত ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

প্র: গর্ভনিরোধক বড়ি থেকেও ব্রেস্ট ক্যান্সার হয়?

উ: হতে পারে। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া এসমস্ত ওষুধ খাবেন না।

প্র: মোটা মহিলাদের এই রোগ বেশি হয়?

উ: হ্যাঁ।

প্র: চর্বি জাতীয় খাবার বেশি খেলে নাকি ব্রেস্ট ক্যান্সার হতে পারে?

উ: হ্যাঁ।

প্র: কী ধরনের খাবার খেলে ব্রেস্ট ক্যান্সার প্রতিরোধ করা যাবে?

উ: রোজকার খাদ্য তালিকায় চর্বি জাতীয় খাবারের পরিমাণ ৩০ শতাংশের নীচে হওয়ার দরকার। দেখা গেছে যাঁরা সপ্তাহে ৫-৬ বার গরু বা শুয়োরের মাংস খান তাঁদের ক্ষেত্রে ব্রেস্ট ক্যান্সারের সম্ভাবনা ২০০ শতাংশ বেশি। মাঠা না তোলা দুধ, মাখন, ঘি, চিজ, মার্জারিন, তেল এবং তৈলাক্ত খাবার কম খেতে হবে। ফল, শাক সবজি খেতে হবে বেশি করে। গাজর, পাকা পেঁপে, পালংশাক, রাঙা আলু, কুমড়োর বিটা ক্যারোটিন, লেবু, টোম্যাটো কাঁচা আম, আমলকী, কাঁচা পেঁপে, পেয়ারা ইত্যাদির ভিটামিন 'সি', রাঙা আলু, সূর্যমুখী তেলের ভিটামিন 'ই' অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে ক্যান্সার প্রতিরোধে সাহায্য করে। সি ফুড, লিভার, কিডনিতে রয়েছে সেলেনিয়াম। সেলেনিয়াম শরীরের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট তৈরির মাত্রা বাড়ায়। সয়াবীন ও বিভিন্ন ডালের ফাইটোইস্ট্রোজেনও ব্রেস্ট ক্যান্সার প্রতিরোধ কাজ আসে। ভূমিকা আছে ফাইবারেরও।

প্র: বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ালে ব্রেস্ট ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে?

উ: হ্যাঁ, কারণ ব্রেস্ট ক্যান্সারে শতকরা ৯০-৯৫ ভাগ ক্ষেত্রেই আক্রান্ত হয় লোবিউল অর্থাৎ যে সমস্ত গ্রন্থিতে দুধ তৈরি হয়, এবং ডাক্ট অর্থাৎ যে পথ বেয়ে দুধ স্তন-বৃন্তে এসে পৌঁছায়। দেখা গেছে বুকের দুধ খাওয়াতে অভ্যস্ত মহিলাদের ক্ষেত্রে এই সমস্ত জায়গায় অস্বাভাবিক কোষ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা কিছুটা কম।

প্র: ব্রেস্ট ক্যান্সার হওয়া মানে ব্রেস্ট কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া?

উ: না, আজকাল জোর দেওয়া হয় ব্রেস্ট কনসারভিং থেরাপির উপর। দুটো ধাপে এই চিকিৎসা করা হয়।

(১) লামপেকটমি অর্থাৎ মাংসপিণ্ড এবং তার আশপাশের কিছু সুস্থ এলাকা এবং বাহুমূলের কিছু গ্রন্থি কেটে বাদ দেওয়া এবং

(২) ৬-৭ সপ্তাহ রেডিও থেরাপি করা।

প্র: লামপেকটমি করলে রোগ তাড়াতাড়ি ফিরে আসে?

উ: কাটাছেঁড়া হলে ক্যান্সার দ্রুতগতিতে বাড়ে সবসময় এমন নয়। অল্প বয়সে ব্রেস্ট কেটে বাদ দিলে অনেক মহিলা অবসাদে আক্রান্ত হন। ব্রেস্ট রিকন্‌স্ট্রাকটিভ সার্জারি করে অবস্থা সামাল দেওয়া যায়। কিন্তু অনেকেই পর পর দুটো অপারেশনের ধকল নিতে চান না। তাছাড়া লাম্‌পেকটমির সাফল্যের হার পুরো ব্রেস্ট কেটে বাদ দেওয়া বা ম্যাসটেকটমির থেকে কম কিছু নয়।

প্র: ম্যাসটেকটমির পর সে দিকের হাত প্রায় অকেজো হয়ে যায়?

উ: কিছু উপসর্গ দেখা দেয়। বাহুমূল থেকে কনুই পর্যন্ত চামড়া কিছুটা অসাড় হয়ে যেতে পারে। হাত নড়াতে অসুবিধা হতে পারে। ব্যথা ফোলা ইত্যাদিও হয় অনেক সময়। সেজন্য ম্যাসটেকটমির পর কয়েকটি সাবধানতা মেনে চলা দরকার। যেমন-

(১) ওই হাতে রক্তচাপ না মাপা।

(২) প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষার জন্য ওই হাত থেকে রক্ত না দেওয়া।

(৩) হাত ফুলে গেলে বা ভাবী বোধ করলে ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করা।

(৪) অ্যান্টি ইডিমা গারমেন্ট অর্থাৎ চাপা ফুল হাতা জামা পরা।

(৫) কেটে ছড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন কাজ করতে হলে গ্লাভস্ পরে নেওয়া ইত্যাদি।

প্র: ব্রেস্ট ক্যান্সাবে কেমোথেরাপি কবার দরকার হয না।

উ: রোগ ছড়িয়ে পড়লে দরকার হয়।

প্র: কেমোথেরাপির তো অজস্র পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয়?

উ. কী ওষুধ কতদিন ধবে কীভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে তার উপর অনেক প্রতিক্রিয়া নির্ভর করে। সাধারণভাবে প্রথমদিকে খিদে কমে যায়। বমি বমি ভাব থাকে বা বমি হয়। মুখে ঘা, চুল পড়ে যাওয়া, পিরিয়ড আচমকা বন্ধ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি উপসর্গও দেখা দিতে পারে। রক্তে শ্বেতকণিকার পরিমাণ কমে যাওয়ায় রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা বাড়ে। সামান্য কাটাছেঁড়ায় বেশি রক্তপাত, ক্লান্তি, রক্তাল্পতা ইত্যাদি উপসর্গও দেখা দিতে পারে। কিছু ওষুধে হৃৎপিণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

প্র: সমস্যা এড়িয়ে যাওয়ার পথ নেই?

উ: নানারকম ওষুধ দিয়ে কেমোথেরাপি করা হয়। চেষ্টা করা হয় যার যে ওষুধে অসুবিধা হচ্ছে সেটা বদলে অন্য ওষুধ দেওয়ার। কিছু ক্ষেত্রে উপসর্গ ভিত্তিক চিকিৎসাও করা হয়।

প্র: ব্রেস্ট ক্যান্সার সারে?

উ: প্রথম পর্যায়ে ধরা পড়লে ৭০ শতাংশ মহিলা ১০ বছর ভাল থাকেন।

শুধু ধূমপান নয় বর্জন করুন ধূমপায়ীকেও

ডাঃ সরোজ গুপ্ত

দূরভাষ : ৪৪৭-৮০০০

প্র: কোনও উপসর্গ নেই। রুটিন হেল্‌থ চেক আপের সময় বুকের এক্সরে করে ধরা পড়ল ফুসফুসে ক্যান্সার। উপসর্গ ছাড়াও এভাবে তলে তলে রোগ এগোতে পারে?

উ: তা পারে। রোগের শুরুতে অনেক সময়ই উপসর্গ তেমন থাকে না। কখনও আবার থাকে। লোকে গুরুত্ব দেয়না। ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে এটা বেশি দেখা যায়। খুসখুসে কাশি হয়ত চলছে। এরা ধবে নেন ধূমপানের জন্য ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস আছে, কাশি তার জন্য। দু'চারদিন সিগেরেট বন্ধ রেখে, কাফ সিবাপ খেযে, গার্গেল করে অবস্থা একটু সামলে গেলে আবার ধূমপান শুরু হয়। ফলে উপসর্গ কিছুটা চাপা থাকলেও রোগ বাড়তে থাকে।

প্র: ফুসফুস ক্যান্সারে কী কী উপসর্গ থাকে?

উ: প্রথম অবস্থায় সামান্য কাশি। তারপর তা বাড়তে থাকে এবং ওষুধপত্রে সারে না। কাশির সঙ্গে প্রথমে কফ পড়ে। তারপর রক্ত। পরবর্তী ধাপে বুকে ব্যথা এবং অল্প থেকে মারাত্মক শ্বাসকষ্ট।

প্র: কিন্তু ফুসফুস ক্যান্সারে অনেক সময় মাথা ব্যথা, ঘাড় মুখ ফুলে যাওয়া, ওজন কমে যাওয়া ইত্যাদি উপসর্গও তো থাকে?

উ: চিকিৎসা না হলে ক্যান্সার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। একে বলে মেটাস্টেটিস। ক্যান্সার মাথায় পৌঁছলে মাথা ব্যথা, বমি, দৃষ্টিশক্তির ঘাটতি থেকে পক্ষাঘাতও হতে পারে। হাড়ে গেলে ব্যথা, হাড় ভেঙে যাওয়া, ঘাড়ের লিম্ফ নোডে পৌঁছলে ঘাড় মুখ ফুলে যাওয়া, ব্যথা ইত্যাদি নানান কষ্ট শুরু হয়। দ্রুত ওজন কমতে থাকাও অনেক সময় ক্যান্সারের প্রাথমিক উপসর্গ হতে পারে।

প্র: ফুসফুস ক্যান্সার ধরা পড়ার পর রোগী আর বেশি দিন বাঁচেন না?

উ: প্রথম অবস্থায় ধরা পড়লে শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগ ক্ষেত্রে অপারেশন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী রেডিওথেরাপি বা কেমোথেরাপির সাহায্যে রোগীকে সুস্থ করা

তোলা যায়। কিন্তু রোগ অনেকদূর এগিয়ে গেলে বা অনেক জায়গায় ছড়িয়ে পড়লে সব রকম চিকিৎসা করেও বেশি দিন বাঁচিয়ে রাখা যায় না।

প্র: ছড়িয়ে পড়া রোখা যায় না?

উ: এই জন্যই তো চিকিৎসা। অপারেশনে করে আক্রান্ত জায়গা বাদ দেওয়া, রেডিও থেরাপি করে অসুস্থ কোষ মেরে ফেলা এবং কেমোথেরাপির সাহায্যে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছনো ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করা। কিন্তু প্রতিটি পদ্ধতিরই সীমাবদ্ধতা এবং পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে। রোগের গতি ভীষণ বেড়ে গেলে অনেক সময়ই এরা আর তাল সামলাতে পারে না। কাজেই ফুসফুস ক্যান্সারের হাত থেকে মুক্তি পেতে চাইলে সহজতম উপায় একে প্রতিরোধ করা।

প্র: কীভাবে? সিগারেট না খেয়ে?

উ: একদম তাই। যাঁরা সিগারেট খান তাঁদের ১,০০,০০০ জনেব মধ্যে ২০০ জন ফুসফুস ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। আব যাঁরা খাননা তাঁদের ক্ষেত্রে সংখ্যাটা দাঁড়ায় ১,০০,০০০ জনে ৪ জন। আরও হিসেব আছে। আমেরিকাতে প্রতি বছর যত ক্যান্সার রোগীর মৃত্যু হয় তাব এক তৃতীয়াংশই ধূমপানজনিত ফুসফুস ক্যান্সারের দরুণ। আমাদের দেশে এই সংখ্যাটা আরও বেশি।

প্র: যাঁদের বাধ্য হয়ে পবোক্ষ ধূমপান করতে হয়?

উ: যে মহিলাব স্বামী ধূমপান করেন তাঁর ফুসফুসে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা যে মহিলার স্বামী ধূমপান করেন না তাঁর থেকে ৩০ শতাংশ বেশি।

প্র: কত দিন ধরে কী পরিমানে ধূমপান করলে ক্যান্সার হবে?

উ: এভাবে নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে দিনে ১ প্যাকেট সিগারেট বছর ১০/১২ ধরে খেয়ে গেলে ফুসফুস ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি।

প্র: ২-৪ বছর সিগারেট খাওয়ার পর কেউ যদি ছেড়ে দেন, তাঁর ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে?

উ: সম্ভাবনা কমে যায়।

প্র. বংশগত কারণে ফুসফুসে ক্যান্সারে হতে পারে?

উ: সরাসরি কোনও প্রমাণ নেই। তবে অনেক সময় সময় একই পরিবারে দু'চারজনের মধ্যে ফুসফুস ক্যান্সার দেখা যায়। আবার একই রকম জীবন যাপন করেন দু'জন মানুষ, তাঁদের একজনের ক্যান্সার হল একজনের হল না। এ সমস্ত থেকে মনে হয় হয়ত জিন গত কোনও কারণ থাকতে পারে এর পেছনে। এবং ধূমপান, পরিবেশ দূষণ বা বিশেষ কোনও পেশা রোগটাকে বাইরে বেরিয়ে আসতে সাহায্য কবে বা বাড়িয়ে তোলে।

প্র: বিশেষ পেশা বলতে?

উ: অ্যাসবেসটস খনিতে যাঁরা কাজ করেন, পাট কারখানায় বা ক্রোমেট, নিকেল আর্সেনিক উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের ফুসফুস ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ইলেকট্রোপ্লেটিং এবং ধাতু কারখানার শ্রমিকদের মধ্যেও এর সম্ভাবনা আছে।

প্র: ফুসফুস ক্যান্সার প্রতিরোধ বিটা ক্যারোটিনের ভূমিকা আছে?

উ: বিটা ক্যারোটিন আছে যে সমস্ত খাবারে অর্থাৎ গাজর, গাঢ় সবুজরঙের শাক সবজি ইত্যাদি খাওয়া সবসময়ই ভাল। তবে ফুসফুস ক্যান্সার প্রতিরোধে এদের কতটা ভূমিকা আছে তা জানা নেই। ফুসফুস ক্যান্সার হয় মূলত শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে শ্বাসনালি এবং ফুসফুসে ক্ষতিকর পদার্থ ঢুকবার জন্য। প্রতিরোধ করতে চাইলে এই ব্যাপারটাকে প্রতিরোধ করতে হবে। সুষম খাবার দাবার সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল রাখতে সাহায্য করে।

প্র: পরিবেশ দূষণের প্রভাব এড়াতে গেলে তো নাকে রুমাল চাপা দিয়ে ঘুরতে হবে?

উ: অসুবিধে কী? ট্রাফিক-পুলিশ বা মোটর সাইকেল, স্কুটার যাঁরা চালান তাঁদের অনেকেই তো এক ধরনের ক্যাপ ব্যবহার করেন। তবে তার থেকেও বড় দরকার সিগারেট এবং সিগারেট যিনি খান তার সঙ্গ বর্জন করা।

প্র: ছেলেদের বেশি হয় এই রোগ?

উ: মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের ফুসফুস ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ৫ গুণ বেশি।

প্র: কোন বয়সে হয় সাধারণত?

উ: ৩৫ থেকে ৬৫ মধ্যে যে কোনও সময়। সবথেকে বেশি সম্ভাবনা ৫০ বছরের আশে পাশে।

এক্স-রে বারবার না করানোই ভাল

ডাঃ শংকররঞ্জন মণ্ডল

দূরভাষ : ৪৮৩-৬২৪০

প্র: বারবার এক্স-রে করালে ক্যান্সার হতে পারে?

উ: হতে পারে। তবে এমন কোনও সোজাসাপটা হিসেব নেই যা থেকে বলা যাবে কতবার পর্যন্ত এক্স-রে করা নিরাপদ। আজকাল এক্স-রে মেশিন অনেক আধুনিক হয়েছে। আগের তুলনায় অনেক কম রশ্মি দিয়ে ভাল মানের এক্স-রে করা যাচ্ছে। এবং এক্স-রের একটা ক্ষতিকর দিক থাকতে পারে সে ব্যাপারে সবাই ওয়াকিবহাল। ফলে নিতান্ত দরকার না পড়লে এক্স-রে করানো হয় না। বিশেষত পেটের।

প্র: কেন পেটের এক্স-রে তে ক্ষতি বেশি হয়?

উ: ক্ষতি হওয়ার প্রশ্ন এখনও আসছে না। এক আধবার কি দশবার এক্স-রে হলেই ক্ষতি হবে এমন নয়। তবে আমরা অকারণ কোনও ঝুঁকি নিতে চাই না। পেটের এক্স-রে হলে মেয়েদের ওভারি এবং ছেলেদের টেস্টিস দুটিকেই তার সম্মুখীন হতে হয়। যদি কোন কারণে ডিম্বাণু বা শুক্রাণুর মধ্যে কোনও ত্রুটির জন্ম হয়, তা থেকে ত্রুটিপূর্ণ বাচ্চার জন্ম হওয়া সম্ভব। অথবা বারবার ওই জায়গায় এক্স-রে হতে থাকলে বাচ্চার জন্ম দিতে অক্ষম হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে। যদিও এরকম হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম।

প্র: কেন এমন হয়?

উ: এক্স-রে যখন শরীরের মধ্যে দিয়ে যায়, শরীরের কোষের সঙ্গে তার তিন ভাবে সংঘাত হয়। (১) এক্স-রের কিছু অংশ কোষে শোষিত হয়, (২) কিছু অংশ ভেদ করে চলে গিয়ে প্লেটে তার ছবি ফুটিয়ে তোলে, (৩) কিছু অংশ সেখানে থেকে চার ধারে বিক্ষিপ্ত হয়।

এক্স-রের যে অংশ কোষের মধ্যে শোষিত হচ্ছে সে কিন্তু কোষে সামান্য পরিমাণ অস্থিরতার জন্ম দিতে পারে। অন্তত তাত্ত্বিকভাবে তো বটেই দু'চার বার হয়ত কোষ সেই ধাক্কা সহ্য করে নিল, বারবারই পারবে এমন নাও হতে পারে। কোষ ভাঙতে শুরু করতে পারে।

প্র: এই জন্যই গর্ভাবস্থায় পেটের এক্স-রে করানো হয় না?

উ ঠিক তাই। ভ্রূণের মধ্যে কোষ খুব দ্রুতগতিতে বাড়ে। হঠাৎ কোনওটা যদি আক্রান্ত হয়ে পড়ে বুঝতে পারা যাবে না বা তার বৃদ্ধিও বন্ধ করা যাবে না— অসুস্থ বাচ্চার জন্ম হতে পারে।

প্র: বুকের এক্স-রে করালেও তো তার আঁচ খানিকটা পেটে এসে লাগবে?

উ: গর্ভাবস্থায় বুকের এক্স-রে করতে হতে পারে। তখন পেটে এক্স-রে প্রতিরোধী লেড জ্যাকেট জড়িয়ে দেওয়া হয়।

প্র: বেরিয়াম মিল এক্স-রে এবং ওরাল কলিসিস্টোগ্রাফি এই দুটি বিশেষ ধরনের এক্স-রে নাকি আজকাল মেয়েদের ক্ষেত্রে করা হয় না?

উ: আপার ও লোয়ার জি আই এন্ডোস্কোপি এবং আলট্রাসনোগ্রাফির দৌলতে এই দুটি টেস্টের গুরুত্ব ছেলে বা মেয়ে দুইয়ের ক্ষেত্রেই আগের থেকে কম।

প্র: সিটি স্ক্যানেও তো এক্স-রে ব্যবহার করা হয়। এতে কোনও ক্ষতি হয় না?

উ: এক্স-রের জন্য যতটুকু হওয়ার হবে। তবে সিটি স্ক্যানের একটা সুবিধে আছে, বেশি রশ্মি দেওয়ার প্রয়োজন হলেও, রশ্মি প্রায় একই জায়গায় থাকে, চতুর্দিকে তেমন বিক্ষিপ্ত হয় না। অর্থাৎ বুকের সিটি করলে পেটের কোনও প্রত্যঙ্গে রশ্মি এসে লাগার সম্ভাবনা খুব কম।

প্র: সিটিতে রশ্মি বেশি লাগে বলছেন। তাহলে পেটের সিটি স্ক্যান করানোর আগে তো পাঁচবার ভাবা উচিত।

উ: পেটের সিটি স্ক্যান যথেষ্ট ব্যয়বহুল এবং দরকার না পড়লে করনো হয় না। কাজেই এ নিয়ে চিন্তা করবেন না।

প্র: আলট্রাসনোগ্রাফিও তো শোনা যায় ক্ষতিকর। আজকাল বাচ্চা পেটে এলেই এত বার আলট্রাসনোগ্রাফি করাতে হয়!

উ: তাত্ত্বিক ভাবে আলট্রাসনোগ্রাফির ক্ষতিকর দিক আছে। সেটা হওয়া সম্ভব যদি দিনে ৫-৬ ঘণ্টা ধরে আলট্রাসনোগ্রাফি করা হয় ২-১ সপ্তাহ পর্যন্ত। তবে এই সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে গর্ভস্থ ভ্রূণের উপর। পূর্ণ বয়স্ক মানুষের ক্ষতি হতে গেলে অন্তত তার দ্বিগুণ সময় লাগবে।

প্র: কিছু এক্স-রে এবং বিভিন্ন ধরনের সিটি স্ক্যানে যে সমস্ত রাসায়নিক রঞ্জক ব্যবহার করা হয়, তারা কি শরীরের ক্ষতি করতে পারে?

উ: দু ধরনের রঞ্জক ব্যবহার করা হয় সি টি স্ক্যানে। তার মধ্যে পুরনো যেটি, আয়োনিক রঞ্জক, শিরার মাধ্যমে শরীরে ঢোকালে ২০ হাজার জনের মধ্যে ১ জনের ক্ষেত্রে মারাত্মক শ্বাসকষ্ট বা হার্ট অ্যাটার্ক হয়ে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে। অধিকাংশ সময় এই রঞ্জকের ক্ষতিকর দিক বলতে শরীরে সামান্য চুলকানি হওয়া। পরবর্তী কালে যে সমস্ত রঞ্জক বেরিয়েছে, নন আয়োনিক রঞ্জক, তাদের প্রভাবে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আরও অনেক কম।

প্র: এম আর আই স্ক্যানে কোনও ক্ষতি হতে পারে?

উ: এম আর আই স্ক্যানের উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা এখনও শেষ হয়নি। তবে যতটুকু জানা

গেছে ক্ষতিকর প্রভাব তেমন কিছু নেই। এসব ক্ষেত্রে যে সমস্ত রঞ্জক ব্যবহার করা হয়েছে তাদের সম্বন্ধে খারাপ খবর পাওয়া যায়নি। তবে এম আর আই তে রঞ্জকের ব্যবহার একটু কম।

প্র: রেডিও আইসোটোপ স্ক্যানে তেজস্ক্রিয় রশ্মি ব্যবহার করা হয়। তা থেকে কি ক্যান্সার হতে পারে?

উ: আজকালরেডিও আইসোটোপ স্ক্যানে ব্যবহার করা হয় তেজস্ক্রিয় গামা রশ্মি। এর ফলে শরীরে ক্যান্সার হয় না বরং হাড়ের নানা ধরনের ক্যান্সার ধরার কাজে একে ব্যবহার করা হয়।

প্র: এত সব পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যাপার একটু কমানো যায় না? সামান্য হলেও ক্ষতির সম্ভাবনা যখন আছে?

উ: হ্যাঁ কমানো যেতে পারে যদি ধাপে ধাপে সব কিছু করার ফুরসত ডাক্তারদের মেলে। ধরুন কারও অবস্ট্রাকটিভ জণ্ডিস হয়েছে বলে ডাক্তারের সন্দেহ হল। তিনি যদি মনে করেন প্রথমে রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট দেখে সন্দেহ দৃঢ় হলে তবে আলট্রাসনোগ্রাফি করাবেন, এবং তার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ই আর সি পি বা সি টি স্ক্যান, আজকের দিনে হওয়া একটু মুশকিল। কারণ কারও ক্ষেত্রে প্রথম এবং দ্বিতীয় ধাপের মধ্যে দিয়ে গিয়েও রোগ ধরে ফেলা যায়, কারও ক্ষেত্রে একদম শেষ ধাপ পর্যন্ত যেতে হয়। আগে তো বুঝতে পারা যাবে না কার কোন ধাপে রোগ নির্ণয় হবে। সেক্ষেত্রে হয়তো এরকম সমালোচনা আসতে পারে— সেই তো ই আর সি পি করাতে হল, প্রথমেই বলে দিলে রোগ তাড়াতাড়ি ধরা পড়ত। বিশেষ করে যদি রোগটা ক্যান্সার বেরোয়। দু' এক দিনে যে ক্যান্সারের বিশেষ ক্ষতি হবে না, এবং রোগ নির্ণয় ধাপে ধাপেই হওয়া উচিত, সেটা বোঝাতে চাইলেও বোঝানো যাবে না। ভাববে ডাক্তার ভুল করেছে সেজন্য বলছে। আজকাল এত কথায় কথায় ক্রেতা সুরক্ষা আইনের প্রয়োগ হচ্ছে যে কোন ডাক্তার সাহস করে ওই পথে যাবে বলুন । কাজেই বেশ কিছুদিন ধরে মাথা ব্যথা না সারলে সিটি স্ক্যান করানো হবে। টেনশন থেকে মাথা ব্যথা হচ্ছে, নাকি মাইগ্রেন থেকে এই ভেবে যদি কোনও ডাক্তার একটুও সময় নষ্ট করেন এবং পরে সিটি স্ক্যান করে দেখা যায় টিউমার ছিল, যা দিনকাল পড়েছে, খুব সম্ভাবনা আছে ডাক্তারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়ে যাবে। কাজেই মাথা ব্যথা হলে যা যা পরীক্ষা করা দরকার সব প্রেসক্রিপশনে লিখে দিলে যদি বিপদ কম থাকে তো তাই ভাল।

প্র: তার মানে আমাদের উপর বেশি পরীক্ষা নিরীক্ষার বোঝা চাপছে?

উ: আজ না চাপলেও কাল চাপবে। করান না করান প্রেসক্রিপশনে লেখা থাকবে সব পরীক্ষা নিরীক্ষা করানোর কথা। এবং একবার লেখা থাকলেই দেখবেন আপনি আর না করিয়ে পারছেন না। খরচ বাড়বে। বাড়বে বিপদও।

হজমের গণ্ডগোল থেকেও অ্যাপেনডিসাইটিস হতে পারে

ডাঃ অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়

দূরভাষ : ৪৪০-৬৪২৭

প্র: কীভাবে বুঝব অ্যাপেনডিসাইটিস হয়েছে?

উ: অ্যাকিউট অ্যাপেনডিসাইটিসের কয়েকটি লক্ষণ আছে। তীব্র ব্যথা শুরু হয় পেটের মাঝখানে নাভির কাছ থেকে। ছড়িয়ে পড়ে ডানদিকের তলপেট বরাবর। অল্প জ্বর বা বমি ভাব থাকতে পারে। বমিও হয় কখনও। ডানদিকের তলপেটের একটি বিশেষ অংশ (ম্যাগবার্নিস পয়েন্ট) টিপলে রোগী ব্যথায় প্রায় লাফিয়ে ওঠে। এমন কি তলপেটের বাঁদিক টিপলেও সেই ব্যথা এসে ধাক্কা দেয় ডানদিকে। রোগ নির্ণয়ে বিশেষ অসুবিধে হয়না। সমস্যা হয় ক্রনিক বা রেকারেন্ট অ্যাপেনডিসাইটিসের বেলায়। লাফিয়ে ওঠার মত ব্যথা থাকে না এক্ষেত্রে। ঝিমঝিমে একটা ব্যথা বোধ ছড়িয়ে থাকে ডানদিকের তলপেট ও কোমর জুড়ে।

প্র: ক্রনিক অ্যাপেনডিসাইটিসের বেলায় রোগ নির্ণয়ে সমস্যা হয় কেন? তবে কি কেবল লক্ষণ দেখেই এই রোগ নির্ণয় করেন আপনারা?

উ: প্রায় তাই। বিশেষজ্ঞের সিদ্ধান্ত এবং অন্য রোগের অনুপস্থিতি। মোটামুটি এর উপর ভিত্তি করেই রোগ নির্ণয় হয়

প্র: অন্য রোগের অনুপস্থিতি বলতে?

উ: ব্যাপারটা খুলে বলি। অ্যাপেনডিক্স বসে আছে ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদন্ত্রের মাঝখানে। অবস্থানটা তলপেটের ডানদিকের কোনায়। পাশে আছে সিকাম, কোলন, মহিলাদের ওভারি, টিউব। এগুলির যে কোনও একটিতে সামান্য প্রদাহ হলেই পেট ব্যথা হয়। সেক্ষেত্রে কী থেকে ব্যথা করছে তা ধরা কখনও কখনও সত্যিই বেশ অসুবিধেজনক হয়ে পড়ে। তখন কাজে আসে ডাক্তারের অভিজ্ঞতা।

প্র: বেরিয়াম মিল এক্সরে করে অ্যাপেনডিসাইটিস ধরা যায় না?

উ: কিছু সুবিধে হয়। খুব জটিলতা হলে কখনও কখনও করাতেও হয়। তবে সাধারণভাবে

আজকাল আর বেরিয়াম মিল এক্সরে করানো হয় না কিছু অসুবিধের কথা ভেবে। বিশেষত কমবয়সী মহিলাদের ক্ষেত্রে। এই এক্সরেতে অন্তত ৫-৬ টা প্লেট নিতে হয়। ওভারি, টিউবকে অতবার এক্সরের সম্মুখীন করা ঠিক নয়।

প্র: তার মানে মোটামুটি অনুমানের ওপর ভিত্তি করেই অ্যাপেনডিক্স অপারেশন করা হয়। অপারেশনের পর যদি দেখা যায় আদৌ অসুস্থ ছিল না অ্যাপেনডিক্স?

উ: শুধু অ্যাপেনডিসাইটিস কেন অনেক রোগ নির্ণয়ই আমরা অনুমানের ওপর ভিত্তি করে করে থাকি। আর অ্যাপেনডিক্স আদৌ অসুস্থ ছিল কিনা বা অসুস্থতা কী ধরনের ছিল সেটা অপারেশনেব পর বায়োপসি করলেই জানতে পারা যায়।

প্র: অ্যাপেনডিক্স বাদ দিলে শরীরেব কোনও ক্ষতি হয় না?

উ: না।

প্র: অর্থাৎ শরীবে এব কোনও ভূমিকা নেই?

উ: সুস্থ অবস্থায় আছে। সুস্থ অবস্থায় সে টনসিলের মতোই রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুকে নিজেব মধ্যে আটকে নিয়ে মেরে ফেলে। অসুস্থ অ্যাপেনডিক্সের আচরণ ঠিক উল্টো। সংক্রমণ ছড়ানো তাব কাজ। কাজেই অ্যাপেনডিক্স অসুস্থ হলে তাকে বাদ দিয়ে দেওয়াই ভাল।

প্র: হোমিওপ্যাথি করে শুনেছি অ্যাপেনডিসাইটিসের সমস্যা কমে যায়?

উ: তা আমি জানি না।

প্র: আগে শোনা যেত অ্যাপেনডিক্স ফেটে রোগী মারা গেছেন— সেটা কী ব্যাপার?

উ: অনেক সময় মারাত্মক সংক্রমণ হয়ে অ্যাপেনডিক্সে পুঁজ তৈরি হয় এবং তা অ্যাপেনডিক্সের দেওয়াল ভেদ করে পেটেব মধ্যে চলে আসে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা না নিলে এই অবস্থায় রোগী মারাও যেতে পারে। একে বলে অ্যাপেনডিকুলার পারফোরেশন। তবে আজকাল এরকম কমই হয়। রোগী এসে উপস্থিত হলে এমারজেন্সি অপারেশন করেও আমরা তাঁকে সুস্থ করে দিই।

প্র: পেট না কেটে এই অপারেশন সম্ভব?

উ: অ্যাপেনডিকুলার পারফোরেশন হয়ে গেলে কেটে অপারেশন করাই শ্রেয়। অন্যথায় রোগী চাইলে ল্যাপারোস্কোপিক পদ্ধতিতে পেটে তিনটে ফুটো করে অপারেশন করা যায়। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে পেট কেটে অপারেশন করাই পছন্দ করি।

প্র: কেন?

উ: ল্যাপারোস্কোপিক পদ্ধতির অপারেশন জনপ্রিয়তা পেয়েছে মূলত দুটি কারণে।

(১) শরীরের উপরে কাটাছেঁড়া খুব কম হয়

(২) রোগী দ্রুত সুস্থ হয়ে কাজকর্মে যোগ দিতে পারেন।

অ্যাপেনডিক্স অপারেশন পেট কেটে করলেও এত ছোট করে কাটা হয় (মিনি ল্যাপ) যে ল্যাপারোস্কোপিক পদ্ধতিতে যে সুবিধে পাওয়া যায় তার থেকে বিশেষ ফারাক থাকে না। এছাড়া পেট কেটে অপারেশন করলে যে কোনও জটিলতা সহজে সামলানো যায়।

প্রঃ জটিলতা বলতে?

উঃ সব অপারেশনের মতো অ্যাপেনডিক্স অপারেশনেও জটিলতা আছে। সংক্রমণ খুব বেশি থাকলে তো কথাই নেই, এমনিতেও কখনও অ্যাপেনডিক্স খুঁজে পেতে হন্যে হতে হয়।

প্রঃ ছোটবেলায় যাঁদের টনসিলাইটিস থাকে বড় হয়ে তাঁদেরই নাকি অ্যাপেনডিসাইটিস হয়?

উঃ না।

প্রঃ আর যাঁরা নিয়মিত পেটের অসুখে ভোগেন?

উঃ অ্যামিবায়োসিস বা কোলাইটিসে যাঁরা নিয়মিত ভোগেন তাঁদের ক্ষেত্রে অ্যাপেনডিসাইটিসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। অনেক সময় আবার কোলাইটিস, বিশেষ করে পেটের ডানদিকের কোলাইটিসের ব্যথার সঙ্গে অ্যাপেনডিসাইটিসের ব্যথা গুলিয়ে যায়। লাগাতার পেটের অসুখ থেকে যেমন অ্যাপেনডিসাইটিস হতে পারে, তেমনই অ্যাপেনডিক্স আক্রান্ত হলে হজমের গোলমাল, অম্বল, পেটে গ্যাস, ইত্যাদি পেটের অসুখ দেখা দিতে পারে। একে বলে অ্যাপেনডিকুলার ডিসপেপসিয়া। অপারেশন করিয়ে নিলে হজমের গণ্ডগোল ঠিক হয়ে যায়।

প্রঃ আর কী কী কারণে অ্যাপেনডিসাইটিস হতে পারে?

উঃ পেটের যে কোনও অঙ্গের প্রদাহ থেকেই অ্যাপেনডিক্সে সংক্রমণ ছড়াতে পারে।

প্রঃ অ্যাপেনডিসাইটিস কি যে কারোরই হতে পারে?

উঃ তা পারে। মাছ, মাংস, টিন ফুড বেশি খেলে, খাবারে ফাইবারের পরিমাণ কম থাকলে কোষ্ঠবদ্ধতা হবে। বাড়বে অ্যাপেনডিক্স আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা।

সর্দি কাশির ধাত থাকলেও হার্নিয়া হতে পারে

ডাঃ মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

দূরভাষ : ২৪৬ ৬৫৮০

প্র: সিজারেব পর সাবধানতা না মানলে নাকি হার্নিয়া হতে পারে?

উ: তা পারে। এবং আড়াআড়ি না কেটে পেট যদি লম্বালম্বি কাটা হয় সেই সম্ভাবনা বাড়ে

প্র. কী কী সাবধানতা মেনে চললে সমস্যা হবে না?

উ: সিজার বলে নয় যে কোনও পেটের অপারেশনের পর বেশ কিছু সাবধানতা মেনে চলা দরকার। কারণ কাটা জায়গা ওপর থেকে শুকিয়ে গেলেও, ভেতর পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে ৩ মাস মতো সময় লাগে। এই সময় কয়েকটা জিনিস না করাই ভাল যেমন

(১) কল পাম্প করা,

(২) ভাতের হাঁড়ি নামানো,

(৩) জলের বালতি বা ভারী কিছু তোলা,

(৪) হ্যাঁচকা টানে ভারী কোনও জিনিস এদিক থেকে ওদিক করা,

(৫) উবু হয়ে বসে কাপড় কাচা ইত্যাদি।

প্রথম ৪-৬ সপ্তাহ করে সমতলে চলাফেরা করা উচিত। ধীরে সুস্থে। অপারেশনের ৭ থেকে ১০ দিন পর থেকেই অ্যাবডমিনাল বেল্ট ব্যবহার করতে হবে। দেড় মাস পর ডাক্তারের পরামর্শ মত বেল্ট লাগানো অবস্থায় পেটের কিছু হালকা ব্যায়াম শুরু করতে হবে। ৩ মাস বাদে বেল্ট ব্যবহার করা বন্ধ করে দিতে হবে। কিন্তু পেটের ব্যায়াম চলবে। অন্যান্য বিধি নিষেধগুলোও ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে যাবে।

প্র: ৩ মাসের পর বেল্ট ব্যবহার করলে কি অসুবিধে আছে?

উ: হ্যাঁ, কারণ পেটের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে ঠেলে নিজের জায়গায় আটকে রাখা আমাদের পেটের মাংসপেশির কাজ। যতদিন কাটা জায়গা দুর্বল থাকে ঠেলার কাজে তাকে সাহায্য করার জন্য বেল্ট ব্যবহার করা হয়। না হলে পেটের দুর্বল জায়গা দিয়ে

ভেতরের কিছু প্রত্যঙ্গ ঠেলে বাইরে আসার চেষ্টা করতে পারে। অর্থাৎ হার্নিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু দুর্বলতা কেটে যাওয়ার পর বেল্ট সরিয়ে না নিলে মাংসপেশি পূর্ণ ক্ষমতায় ফিরে আসতে পারে না। এবং মাংসপেশি দুর্বল হওয়া মানেই যে কোনও সময় হার্নিয়া হওয়ার সম্ভাবনা।

প্র: তা বলে সবারই তো আর হার্নিয়া হয় না?

উ: না তা হয় না। তবে কিছু সমস্যা আছে যার এক বা একাধিক থাকলে সাবধান হওয়া দরকার যেমন,

(১) যাঁদের রক্তাল্পতা থাকে

(২) শরীরে প্রোটিন বা ভিটামিনের ঘাটতি থাকলে

(৩) ডায়াবেটিসের রোগী

(৪) বাত বা হাঁপানির জন্য যাঁরা নিয়মিত স্টেরয়েড খান

(৫) খুব বেশি মোটা যাঁরা

(৬) কোষ্ঠবদ্ধতা বা ঘন ঘন ডাযেবিয়ায় যাঁবা আক্রান্ত হন

(৭) সর্দি কাশির ধাত আছে

(৮) প্রস্টেট বা অন্য কোনও কারণের জন্য পেটে চাপ দিয়ে ইউরিন করতে হয়।

এই সমস্ত অসুবিধের কোনও একটি বা একাধিক যদি থাকে অপারেশনের আগে সেই অসুবিধে দুর করে নেওয়া দরকাব। অনেক সময় হয়তো সেই সময় পাওয়া যায়না, সেক্ষেত্রে অপাবেশনের পব আরও বেশি সাবধানতা দবকাব পড়ে। যেমন, হয়তো বেশি দিন বিশ্রাম নিতে হতে পারে, অ্যাবডমিনাল বেল্ট বেশি দিন পরতে হতে পারে ইত্যাদি।

প্র: কোষ্ঠবদ্ধতা থাকলে অপারেশন ছাড়া এমনিও হার্নিয়া হয় শুনেছি?

উ: হ্যাঁ, কোষ্ঠবদ্ধতা, প্রস্রাবেব অসুবিধে এবং সর্দিকাশির ধাত থাকলে এমনিও হার্নিয়া হতে পারে। আসলে পেটের কোনও নির্দিষ্ট জায়গায় বাববার চাপ পড়লে সেই অংশেব মাংসপেশি কিছুটা দুর্বল হয়ে যায়। পেটের সেই অংশে যে প্রত্যঙ্গ আছে সে ঠেলে বেরিয়ে আসতে পারে। এটাই হার্নিয়া।

প্র: তাহলে কি পেটের কোনও একটা অংশ উঁচু হযে ফুলে থাকলে বুঝব হার্নিয়া হয়েছে?

উ: শরীরের অনেক জায়গাতেই হার্নিয়া হতে পারে। তবে বেশির ভাগটাই পেটে হয়। কুচকির আশে পাশে, নাভি এবং নাভির চারধারে। ফুলে থাকার ব্যাপারটা যে সব-সময় হয় তা নয়। হাচলে, কাশলে, দাঁড়ালে হয়তো কিছু একটা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসে। ঠেললে আবার সেটা ভেতরে ঢুকে যায়।

প্র: বাইরে কী বেরিয়ে আসে?

উ: প্যানক্রিয়াস ছাড়া সব কিছুই বেরোতে পারে। তবে বেশি বেরোয় খাদ্যনালির অংশ বিশেষ বা ওমেন্টাম বলে পেটে একটি চর্বির পর্দা থাকে সেটা।

প্র: এরা যে এরকম বাইরে বেরিয়ে আসে এতে এদের কাজকর্মের কোনও ক্ষতি হয় না?

উ: স্বাভাবিকভাবে হয় না। তবে আটকে গেলে হবে।

প্র: অনেক সময় তো হার্নিয়া অপারেশন করানো যায় না।

উ: হার্ট অ্যাটাক, ক্যান্সার বা অন্য কোনও দুরারোগ্য অসুখে আক্রান্ত রোগীর ক্ষেত্রে অপারেশন অনেক সময় করানো হয় না। ট্রাস বলে এক ধরনের বেল্ট পাওয়া যায় সেটা পরিয়ে রাখা হয়।

প্র: ট্রাস যে কেউ পরে থাকতে পারেন?

উ: সেই আবার অ্যাবডমিনাল বেল্টের মতো ব্যাপার। পরে থাকা মানে মাংসপেশি দুর্বল হতে থাকা। এক্ষেত্রে তো জায়গাটা এমনিতেই দুর্বল ছিল। ফলে হার্নিয়া বাড়তে থাকে। পরে অপারেশন করালেও ভাল ফল হয় না। সুস্থ সবল মানুষের ক্ষেত্রে হার্নিয়া অপারেশন করে নেওয়াই ভাল, নয়তো পরে আটকে গিয়ে প্রাণ নিয়ে টানাটানি হতে পারে।

প্র: প্রাণ নিয়ে টানাটানি?

উ: হার্নিয়া আটকে গেলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পেট ফেঁপে ফুলতে শুরু করে। পেটে অসহ্য ব্যথা এবং বমিও শুরু হয়ে যায়। আরও খানিকক্ষণ এই অবস্থায় থাকলে আটকে যাওয়া হার্নিয়ার মধ্যে রক্ত সরবরাহ কমে যেতে যেতে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। গ্যাংগ্রিন হয়ে রোগীর মারা যাওয়াও অসম্ভব নয়। অনেকের ক্ষেত্রে খুব ছোট ফুটোর মধ্যে দিয়ে বড় হার্নিয়া বেরিয়ে আসে। তাঁদের ক্ষেত্রে সমস্যা বেশি হয়।

প্র: তাহলে কি হার্নিয়া হওয়া মাত্র অপারেশন করিয়ে নিতে হবে?

উ: সেই সিদ্ধান্ত নেবেন আপনার সার্জেন। আপনার কাজ জানতে পারা মাত্র ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করা।

প্র: অপারেশন মানে তো আবার মাংসপেশি দুর্বল হওয়া।

উ: না, হার্নিয়া অপারেশনে ব্যাপারটা একটু অন্য রকম। যে প্রত্যঙ্গটি বেরিয়ে এসেছে তাকে নিজের জায়গায় বসানোর সঙ্গে সঙ্গে সেলাই করে এবং প্রয়োজন হলে মেস নামে এক বিশেষ ধরনের তারজালি বসিয়ে দুর্বল জায়গাটাকে জোরদার করা হয়।

প্র: হার্নিয়া অপারেশনের পর আর হার্নিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না?

উ: সম্ভাবনা সবসময়ই থাকে। বিশেষ করে মানুষটি যদি অসাবধানী হন। ধরুন কারোর প্রস্টেটের সমস্যা আছে। নিয়ম, আগে প্রস্টেট অপারেশন করে তারপর হার্নিয়া অপারেশন করা। না হলে পেচ্ছাপ করার সময় পেটে যে চাপ পড়বে তা থেকে আবার হার্নিয়া হতে পারে। সর্দি কাশি এবং কোষ্ঠবদ্ধতাও আয়ত্তে রাখা দরকার। অপারেশন পরবর্তী সাবধানতা তো আছেই।

প্র: ছোট বাচ্চাদেরও যে অনেক সময় হার্নিয়া হয়।

উ: একে বলে কনজেনিটাল হার্নিয়া। অর্থাৎ জন্মগত। অপারেশনে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়।

প্র: কত ছোট বয়সে কনজেনিটাল হার্নিয়া অপারেশন করা যায়?

উ: প্রয়োজনে জন্মের পর থেকে যে কোনও সময় অপারেশন করা যেতে পারে।

প্র: এই অপারেশনের পর বাচ্চা আর পাঁচটা বাচ্চার মত স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে?

উ: পুরোপুরি।

গলব্লাডার অপারেশনের পর চর্বি জাতীয় খাবার কম করে খান

ডাঃ অজয়কুমার পাল

দূরভাষ : ২৪৭-৮০৮৩

প্রঃ ফর্সা, মোটাসোটা মহিলাদের মধ্যে গলব্লাডারে পাথর হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে?

উঃ হ্যাঁ, অবশ্য এর সঙ্গে আরও দুটো বিশেষণ যোগ করতে হবে। ফর্টি এবং ফার্টাইল। অর্থাৎ ফিমেল, ফ্যাটি, ফেয়ার, ফার্টাইল এবং ফর্টি— এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য আছে যাঁদের মধ্যে তাঁদের গলব্লাডারে পাথর হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

প্রঃ থ্যালাসেমিয়া রোগীদের মধ্যেও নাকি গলব্লাডারে পাথর হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে?

উঃ হ্যাঁ, ১৫-১৬ বছর বয়সে গলব্লাডারে পাথর হলে অনেক সময়ই দেখা যায় তাঁর থ্যালাসেমিয়া বা রক্তের অন্য কোনও অসুখ আছে।

প্রঃ কোনও সাবধানতা আছে যা মেনে চললে গলব্লাডারে পাথর হওয়ার সম্ভাবনা এড়িয়ে যাওয়া যায়?

উঃ সব সময় এড়ানো যায় না, তবে কয়েকটি সাবধানতা মেনে চলা যেতে পারে। প্রথম, পেটের যে কোনও সংক্রমণ, যেমন আমাশা বা ডায়েরিয়া যথাসম্ভব হতে না দেওয়া বা হলেও চিকিৎসা করে দ্রুত সুস্থ হয়ে যাওয়া। কারণ এ সমস্ত রোগ মেয়াদী হয়ে গেলে জীবাণুর কিছু অংশ গলব্লাডারে গিয়ে বাসা বাঁধতে পারে। সেখান থেকে পরবর্তী কালে পাথর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। টাইফয়েড জাতীয় অসুখের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার।

ডায়েরিয়া, বমি ইত্যাদি কারণে শরীরে জলশূন্যতা হলেও পাথর হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। অতএব খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে সতর্কতা দরকার।

প্রঃ কী ধরনের খাওয়া দাওয়া করতে হবে?

উঃ হাল্‌কা, সহজপাচ্য খাবার খেতে হবে যাতে হজমের গণ্ডগোল, ডায়েরিয়া, আমাশা ইত্যাদি ঘনঘন দেখা না দেয়। মোটা মানুষদের এ-রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা

বেশি। অতএব চর্বি জাতীয় খাবার, ভাজাভুজি যথা সম্ভব কম খেতে হবে।

প্র: গলব্লাডার অপারেশনের পরও তো খাদ্যতালিকা থেকে চর্বি জাতীয় খাবার বাতিল হয়ে যায়।

উ: না, বাতিল হয়ে যায় না। কম খেতে বলা হয়।

প্র: অপারেশনের পর সুস্থ হতে কতদিন সময় লাগে?

উ: ল্যাপারোস্কোপিক পদ্ধতিতে অপারেশন করালে দু'দিনে রোগী বাড়ি চলে যায়। কাজকর্ম শুরু করতে দিন দশেক সময় লাগে।

প্র: এতে নাকি অপারেশন পরবর্তী ব্যথা যন্ত্রণাও কম হয়?

উ: হ্যাঁ। ব্যথা প্রায় হয় না। পেটে দাগ থাকে না। তাড়াতাড়ি কাজে যেতে পারে।

প্র: কিন্তু সব সময় তো এই পদ্ধতিতে অপারেশন করা যায় না। অনেক সময় দেখা যায় ডাক্তার আগে বলেন ল্যাপকলি করবেন। কিন্তু পরে পেট কাটতে হয়। কেন এমন হয়?

উ: গলব্লাডার যদি পিত্তনালি বা পাকস্থলীব সঙ্গে বেশি জড়িয়ে থাকে— পেট কাটতে হতে পারে। শতকরা ২ ভাগ ক্ষেত্রে এরকম হয়।

প্র: সেটা আগে বোঝা যায় না?

উ: কতটা জড়িয়ে আছে তা সব সময় আগে থেকে বুঝতে পারা যায় না।

প্র: সেক্ষেত্রে 'মিনি ল্যাপ' সার্জারি করা যেতে পারে?

উ: না, এক্ষেত্রে পেট বড় কবে কেটেই অপারেশন করতে হবে।

প্র: 'মিনি ল্যাপ সার্জারি'তে পেট অল্প কাটতে হয়?

উ: হ্যাঁ 'মিনি ল্যাপ সার্জারিও' আসলে পেট কেটে অপারেশন। তবে এক্ষেত্রে কাটতে হয় মাত্র দেড় ইঞ্চি মতো। ফলে বোগী তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যান, এবং ব্যথা যন্ত্রণাও প্রচলিত অপারেশনের তুলনায় কম হয়।

প্র: পিত্তনালীর পাথর ল্যাপারোস্কোপিক পদ্ধতিতে অপারেশন করা যায়?

উ: অধিকাংশ সময় যায়। কিছু ক্ষেত্রে পেট কেটে বা ই আর সি পি করে করতে হয়। মিনি ল্যাপ সার্জারিও করা যেতে পারে।

প্র: গলব্লাডার আর পিত্তনালি দু'জায়গাতেই যদি পাথর থাকে?

উ: ল্যাপ কলি করে দু'জায়গার পাথরই বার করা যেতে পারে। অসুবিধে হলে পেট কেটে করা যায়। বা প্রথমে ই আর সি পি ব সাহায্যে পিত্তনালীর পাথর বার করে নেওয়া হয়। তাবপর ল্যাপকলি করে গলব্লাডারের পাথর।

প্র: ল্যাপকলি করালে পরে আবার পাথর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে?

উ: ল্যাপকলিতে পাথর সমেত পুরো গলব্লাডার কেটে বাদ দেওয়া হয়। কাজেই আবার পাথর হওয়ার কোনও প্রশ্নই আসে না।

প্র: ল্যাপকলির পর অনেক সময় কাঁধে ব্যথা হয়?

উ: ল্যাপকলি করার সময় পেটে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস ঢোকানো হয়। উদ্দেশ্য, ডায়াফ্রাম সমেত গলব্লাডারের আশপাশের প্রত্যঙ্গগুলিকে ঠেলে খানিকটা সরিয়ে

দেওয়া। অপারেশনের সুবিধে হয় এতে। গ্যাস ঢোকানো এবং বার করার কতগুলি নিয়ম আছে। নিয়ম না মানলে কাঁধে ব্যথা হতে পারে। যেমন, যথাসম্ভব কম পরিমাণে গ্যাস ব্যবহার করা উচিত। ঢোকানো উচিত খুব আস্তে আস্তে। এবং অপারেশনের শেষে পুরোটা বার করে দেওয়া দরকার।

প্র: হার্টের অসুখ থাকলে ল্যাপকলি করা যায় না?

উ: অল্প স্বল্প অসুবিধে থাকলে কিছু সাবধানতা মেনে অপারেশন করে দেওয়া হয়। কিন্তু মাঝারি থেকে বড় ধরনের হার্টের অসুখে ঝুঁকি নেওয়া হয় না।

প্র: আর হাঁপানিতে?

উ: এক্ষেত্রেও একই ব্যাপার।

প্র: কিন্তু হাঁপানি বা হার্টের অসুখ থাকলে তো প্রস্টেট অপারেশন আটকায় না।

উ: গলব্লাডার এবং প্রস্টেট দু' ক্ষেত্রেই এণ্ডোস্কোপের সাহায্যে অপারেশন করা হলেও অপারেশন পদ্ধতি এবং অজ্ঞান করার ধরন আলাদা। প্রস্টেট অপারেশনে এণ্ডোস্কোপ ঢোকানো হয় ইউরেথ্রার মধ্যে দিয়ে। ফলে রোগীকে পুরো অজ্ঞান করার দরকার হয় না। কোমর থেকে নিচের অংশ স্পাইনাল অ্যানেসথেসিয়ার সাহায্যে অবশ করে নেওয়া হয়। কিন্তু ল্যাপকলিতে অপাবেশন হয় পেটে। ফলে স্পাইনাল অ্যানেসথেসিয়ায় কাজ হয় না। পুরো অজ্ঞান করতে হয়। হাঁপানি বা হার্টের রোগীকে পুবো অজ্ঞান করা অনেক সময়ই বিপজ্জনক। তাই এই ধরনের অসুখ থাকলে আগে চিকিৎসা কবে রোগ আয়ত্বে আনা হয়। তারপর ভাবা হয় অপারেশনের কথা।

প্র: উচ্চ রক্তচাপ বা ডায়াবেটিস থাকলেও তো ল্যাপকলি করা যায় না?

উ: শুধু ল্যাপকলি নয়, সব ধরনের অপারেশনের ক্ষেত্রেই একই ব্যাপার। রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিস আয়ত্তে এনে তারপর অপারেশন কবা হয়।

প্র: এমারজেন্সি অপারেশন করার দরকার হলে?

উ: পাথর গলব্লাডারের মুখে আটকে গেলে যাবতীয় চিকিৎসা সত্ত্বেও অনেক সময় ব্যথা কমানো যায় না। তখন ঝুঁকি নিয়ে অপারেশন করতে হয়।

প্র: যাবতীয় চিকিৎসা বলতে?

উ: ব্যথা কমানোর ওষুধ এবং বেশি মাত্রায় অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে সংক্রমণ কমানো হয়। মোটামুটি ৬ সপ্তাহের মধ্যে অবস্থা পুরোপুরি আয়ত্বে আসে। তখন অপারেশনের কথা ভাবা হয়।

প্র: এই ৬ সপ্তাহ কি বিশেষ কোনও সাবধানতা মেনে চলতে হয়?

উ: সাবধানতা বলতে নিয়ম করে ওষুধপত্র খাওয়া, শরীরে নতুন করে যাতে কোনও সংক্রমণ না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা এবং পুষ্টিকর খাওয়া দাওয়া করা। তবে খাওয়া দাওয়ার কিছু নিয়ম এসময় মেনে চলতে হয়। প্রথম দিকে ব্যথা না কমা পর্যন্ত খাওয়া বন্ধ থাকে। স্যালাইনের মাধ্যমে শরীরে পুষ্টির যোগান যায়। সংক্রমণ, ব্যথা কমে এলে প্রথমে অল্প স্যুপ দেওয়া হয়। তারপর ধীরে ধীরে তেল ঝাল-মশলা কম দেওয়া প্রায় সেদ্ধ খাবার অল্প অল্প করে দেওয়া শুরু হয়।

প্র: গলব্লাডারে পাথর হলে মূল সমস্যা কি পেট ব্যথা?

উ: আরও সমস্যা থাকে। যেমন হজমের গণ্ডগোল, গ্যাস, অম্বল ইত্যাদি। কিন্তু ব্যথা হলেই মানুষ সচেতন হন বেশি। ব্যথা দু'ভাবে শুরু হতে পারে আচমকা মারাত্মক ভাবে বা অল্প অল্প করে দীর্ঘদিন ধরে। আচমকা যাঁদের ব্যথা শুরু হয় তাঁদেরও কিন্তু আগে বেশ কিছুদিন ধরে গ্যাস, অম্বল, বদ হজম, পেট খারাপ ইত্যাদি উপসর্গ থাকতে পারে। এর সঙ্গে ডানদিকের ওপর পেটে অল্প ব্যথা থাকে। ব্যথা ঘুরে পিঠে বা ডান কাঁধে যেতে পারে। এই অবস্থায় অধিকাংশ মানুষ অম্বলের ওষুধ, ব্যথা কমার ওষুধ খেয়ে উপসর্গ কমিয়ে রাখেন। ফলে রোগ ধরা পড়তে দেরি হয়। কিন্তু ব্যথা তীব্রভাবে শুরু হলে এবং সঙ্গে বমি, জ্বর ইত্যাদি থাকলে রোগ নির্ণয় হয় তৎক্ষণাৎ। কিছু ক্ষেত্রে অল্প স্বল্প হজমের গণ্ডগোল ছাড়া আর কোনও কষ্ট থাকে না। অন্য কোনও কারণে আলট্রাসনোগ্রাফি করতে গিয়ে দেখা যায় গলব্লাডারে পাথর আছে।

প্র: ব্যথা না থাকলে অপাবেশন করার দরকার হয়?

উ: স্বাস্থ্য ভাল থাকলে কষ্ট না হলেও অপারেশন করে দেওয়া হয়। কিন্তু 'হাই রিস্ক' রোগীদের ক্ষেত্রে অর্থাৎ যাঁদেব উচ্চ বক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ বা হাঁপানি আছে, আগে এ সমস্ত রোগের চিকিৎসা করে অবস্থা আয়ত্তে এনে তবে অপারেশনের কথা ভাবা হয়। গুরুতব অসুস্থ বয়স্ক রোগীদেব অপারেশন করাই হয়না।

প্র: এতে কোনও ক্ষতি হয় না?

উ: সাবধানতা মেনে চললে তেমন অসুবিধে কিছু হয় না।

প্র: সাবধানতা বলতে?

উ: খাওয়া দাওয়ার কিছু বিধি নিষেধ মেনে চলতে হয়। চর্বি জাতীয় খাবার, ভাজাভুজি, প্রোটিন হজম করাব জন্য বেশি পরিমাণ পিত্তের দবকার হয়। গলব্লাডারের সংকোচন প্রসারণের হার বাড়ে। ফলে ব্যথা হওয়ার সম্ভাবনাও বাড়ে। অতএব চর্বিজাতীয় খাবার, তেল মশলাদার খাবার, ভাজাভুজি খাওয়া একদম বন্ধ করে দেওয়া দরকার। অল্প তেলে সাঁতলানো রান্না, স্টু বা পারলে সেদ্ধ খাবার খাওয়াই ভাল। প্রোটিন খাওয়া বন্ধ করা সম্ভব নয়। অতএব সহজপাচ্য প্রোটিন যেমন, মুরগির মাংস, ছোট মাছ, ছানা ইত্যাদি খাওয়া দরকার।

প্র· গলব্লাডারের পাথর অপারেশন না করালে নাকি সেখান থেকে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে?

উ: এ বিষয়ে দ্বিমত আছে। তবে গলব্লাডার ক্যান্সার রোগীদের অপারেশন করার সময় প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় গলব্লাডারে পাথর আছে।

প্র: কী করে বোঝা যাবে গলব্লাডারে ক্যান্সার হয়েছে?

উ: হজমের গণ্ডগোল, ব্যথা ইত্যাদিতো থাকেই। জণ্ডিসও থাকতে পারে। পেটের ডানদিকে ওই বিশেষ অংশে হাত দিলে মাংসপিণ্ড বুঝতে পারা যায়।

প্র: গলব্লাডার ক্যান্সারে সাফল্যের সম্ভাবনা কী রকম?

উ: সে রকম ভাল নয়।

অপারেশনের ভুলেও জণ্ডিস হতে পারে

অধ্যাপক (ডাঃ) দীপক ঘোষ

দূরভাষ ৪৭৫-৩৮৮১

প্র : গলব্লাডার অপারেশনের পর নাকি অনেক সময় জন্ডিস হয়?

উ : হতে পারে, বিভিন্ন কারণের জন্য হতে পারে। তবে সেটা বলার আগে গলব্লাডারের অবস্থানটা একটু বলে নিই। লিভার থেকে শুরু হয়ে পিত্তনালি বা কমন বাইল ডাক্ট (সি বি ডি) শেষ হয়েছে ডিওডিনামে। এর মাঝ পথে রয়েছে গলব্লাডার বা পিত্তথলি। পিত্ত লিভার থেকে তৈরি হয়ে পিত্তনালির মাধ্যমে ডিওডিনামে যাওয়ার আগে এসে জমা হয় পিত্তথলিতে। পিত্তথলি পিত্তকে গাঢ় করে চর্বি-জাতীয় খাবার হজম করার উপযুক্ত করে তবে তাকে ডিওডিনামে পাঠায়।

গলব্লাডার অপারেশনের সময় এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটতে পারে যার ফলে পিত্তনালির পথ পুরো বা আংশিক বন্ধ হযে জন্ডিস সৃষ্টি করতে পারে।

(১) যদি এমন হয় পাথর পিত্তথলিতেও ছিল, পিত্তনালিতেও ছিল, কিন্তু অপারেশনেব সময় কোনও কারণে পিত্তনালির পাথর বার করা হয়নি। সেই পাথর পিত্তনালির পথ আংশিক বা পুরো বন্ধ করে অল্প বা বেশি জন্ডিস সৃষ্টি করতে পারে।

(২) অপারেশনের পর পিত্তনালির যে দিকে পিত্তথলি ছিল সে দিক বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে যদি ভুলবশত পিত্তনালি মাঝবরাবর বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে মারাত্মক জণ্ডিস দেখা দেয় অপারেশনের পর পরই।

(৩) অপারেশনের সময় যদি পিত্তনালি ফুটো হয়ে যায় সেখান থেকে পিত্ত সমস্ত পেটের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে পেরিটোনাইটিস নামে মারাত্মক অসুস্থতার সৃষ্টি করবে।এই অবস্থা সামলে যাওয়ার পর পিত্তনালির ফুটো বন্ধ হওয়ার সময় খানিকটা উঁচু বা শক্ত হয়ে থাকতে পারে। যার ফলে পিত্তনালির পথ সরু হয়ে গিয়ে জন্ডিস দেখা দেবে।

(৪) পিত্তনালিতে পাথর থাকলে আড়াআড়িভাবে কেটে পাথর বার করবার পর অনেক সময় প্রয়োজনে সেই জায়গাটা সেলাই করে পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়ার বদলে ইংরেজি টি-এর মতো দেখতে টিউব পরিয়ে দেওয়া হয়। টি-এর মাথাটা থাকে পিত্তনালি বরাবর। আর লেজের অংশটা ওই কাটা অংশের মধ্যে দিয়ে বার করে শরীরের বাইরে ব্যাগের মধ্যে লাগিয়ে রাখা হয়। পিত্তনালির পিত্ত এবং কিছু দূষিত পদার্থ যাতে পিত্তনালিতে চাপ না বাড়তে পারে তাই এই ব্যবস্থা। এ থেকে অনেক সময় সংক্রমণ ছড়াতে পারে এবং তা পিত্তনালির কাটা অংশ বরাবব গিয়ে রাস্তা বন্ধ করে জন্ডিস সৃষ্টি করতে পারে।

প্র: এরকম ক্ষেত্রে আবার অপারেশন করতে হয়?

উ: বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাই। কখনও আবার পাইপ পরিয়ে অবস্থা সামাল দেওয়া হয়।

প্র: অপারেশনের সঙ্গে সঙ্গে জন্ডিস কমে যাবে?

উ: ধীবে ধীরে কমতে থাকবে।

প্র: পেটে ক্যান্সার হলেও কি জন্ডিস হতে পারে?

উ: লিভার থেকে শুরু করে পিত্তনালি, পিত্তথলি, প্যানক্রিয়াস ইত্যাদি যে কোনও জায়গার ক্যান্সার থেকে পিত্তনালিব পথ বন্ধ হতে পারে। অনেক সময় পাকস্থলি, কোলন জরায়ু ইত্যাদিব ক্যান্সারও লিভার পর্যন্ত ছড়িয়ে গিয়ে বিপত্তি বাধাতে পারে। সব ক্ষেত্রে প্রাথমিক উপসর্গ হিসেবে দেখা দেবে জন্ডিস।

প্র: ক্যান্সাব হয়েছে অথচ উপসর্গ কেবল জন্ডিস? সাধাবণ জন্ডিসের সঙ্গে গুলিয়ে গিয়ে বোগ আরও জটিল হয়ে যেতে পাবে না?

উ: অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস হলে তিনটি প্রধান উপসর্গ একসঙ্গে থাকবে। (১) প্রস্রাব হলুদ হবে, (২) প্রচুর পায়খানা হবে, কাদা রংয়ের ফেনা ফেনা মতো, (৩) গায়ে চুলকুনি হবে। সাধারণ বা সংক্রামক জন্ডিসে ওবকম চুলকুনি বেশী থাকে না। চোখ হলুদ, বমি বমি ভাব, খেতে ইচ্ছে না করার সঙ্গে এক্ষেত্রে চর্বি জাতীয় খাবারও হজম হবে না এবং চর্বিতে দ্রবীভূত হয় যে সমস্ত ভিটামিন যেমন এ, ডি, ই, কে — কোনটাই শরীবে শোষিত হবে না। সব থেকে বিপদ বাধে ভিটামিন কে শোষিত না হওয়ার দরুন। জন্ডিস যদি বেড়ে যায় এবং বেশ কিছুদিন ধরে চলতে থাকে ভিটামিন কে র অভাবে শরীবে রক্তপাত হতে পাবে। বক্ত বমি, রক্ত পায়খানা শুরু হয়ে গেলে অবস্থা খুব খাবাপ হয়ে যায়। এ অবস্থায় অপারেশনও খুবই বিপজ্জনক। কাজেই প্রাথমিক উপসর্গগুলি দেখা দিলেই ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার।

প্র: জন্ডিস হলে রক্ত পবীক্ষা করে বোঝা যায় জন্ডিস কী ধরণের?

উ: সংক্রামক জন্ডিস এবং অবস্ট্রাকটিভ বা সার্জিকাল জন্ডিস আলাদা করে বোঝা খুব কঠিন কিছু নয়। বাধাটা কী ধরণের সেটা অনেক সময় বুঝতে অসুবিধে হতে পারে। কিন্তু তার জন্যও পরীক্ষা নিরীক্ষা রয়েছে।

জন্ডিস সন্দেহ হলে প্রথমে রক্তের কয়েকটি পবীক্ষা করা হয়।

রক্ত পরীক্ষায সন্দেহ হলে আলট্রাসনোগ্রাফি করতে বলা হয। পাথর হলে তো কথাই

নেই, টিউমার বা ক্যান্সার এর হদিশও পাওয়া যায় এভাবে।

অপারেশনে যাওয়ার আগে রোগ নির্ণয় নিশ্চিত করতে কিছু ক্ষেত্রে পেটের সিটি স্ক্যান অথবা ই আর সি পি বা দুটোই করতে বলা হয় কখনও কখনও।

প্র: সিটি স্ক্যান, ই আর সি পি দুইই তো খুব ব্যয়বহুল পদ্ধতি?

উ: হ্যাঁ, তবে খুব দরকার না পরলে এ সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে বলা হয় না। আলট্রাসনোগ্রাফি করে যদি জানা যায় বাধার কারণ পাথর, সিটি স্ক্যানের দরকার সাধারণত হয় না। ই আর সি পি করে একই সঙ্গে রোগ নির্ণয় এবং ছোট থেকে মাঝারি মাপের পাথর বার করে নিয়ে আসা যায়।

জন্ডিসের কারণ সঠিক ভাবে বুঝতে না পারা গেলে বা টিউমার অথবা ক্যান্সারের জন্য যদি জন্ডিস হয়, সি টি স্ক্যান করা জরুরি। বাধা কোথায় আছে, সরাসরি সেই অংশের টিউমার বা ক্যান্সারের দরুন বাধার সৃষ্টি নাকি ক্যান্সার অন্য জায়গা থেকে এসে এখানে ছড়িয়েছে, আশপাশের গ্ল্যান্ড আক্রান্ত হয়েছে কিনা বা পেটে জল জমেছে নাকি ইত্যাদি অনেক কিছু জানা যায় সিটি স্ক্যান থেকে।

অবস্থা এরকম হলে পরেব ধাপে ই আর সি পির প্রয়োজন হতে পারে। এক্ষেত্রে রোগ নির্ণয় নয, চিকিৎসাব জন্য এব প্রযোজন। বাধা ভেদ কবে শক্ত টিউব, ডাক্তাবি ভাষায় যাকে বলে স্টেণ্ট, পরিয়ে দেওয়া হয পিত্তনালিতে। পিত্তচলাচল স্বাভাবিক হয়ে গিযে জন্ডিস সাময়িকভাবে ঠিক হযে যায়।

প্র: সাময়িক বলছেন কেন?

উ: ক্যান্সার হলে টিউমাবেব আবাব বড় হওয়াব সম্ভাবনা থাকে। অবশ্য এর সঙ্গে ক্যান্সারের যথাযথ চিকিৎসাও চালানো হয়।

প্র: ই আর সি পি তো শুনেছি শবীরের পক্ষে ক্ষতিকর, প্যানক্রিয়াসে সংক্রমণ হতে পারে?

উঃ এর সম্ভাবনা খুবই কম।

প্র: ঠিকভাবে করলে নাকি এই সংক্রমণ এড়ানো যায়?

উ: প্যানক্রিয়াস আসলে একটা অন্ধগলির মতো ব্যাপার। খোলা মুখ দিয়ে সামান্যতম সংক্রমণ ঢুকলেও তা বেবোনোর পথ পায না বলে মারাত্মক রূপ ধারণ করে। যে সমস্ত যন্ত্রপাতি দিযে ই আর সি পি করা হয় তা ঠিকভাবে পরিশোধিত না হলে প্যানক্রিয়াটাইটিস হতে পাবে। পিত্তনালির পথ দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার দরুণ যদি সংক্রামিত হযে যায, যাকে কলেনজাইটিস বলে, ই আর সি পির ফলে সংক্রমণ প্যানক্রিযাসে ছড়াতে পাবে। এ সমস্ত ব্যাপার আগে থেকে বোঝা সম্ভব নয় বলে সামান্য কিছু ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ঘটে। এবং এর কোনওটাই প্রায় ডাক্তারের দোষে নয়।

প্র: অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিসের চিকিৎসা কি ই আর সি পি র সাহায্যে হয়?

উ: স্টেণ্ট পরাতে হলে বা পিত্তনালিতে ছোট থেকে মাঝারি মাপের পাথর থাকলেই কেবল ই আর সি পির সাহায্য নেওয়া হয়, বিশেষ করে জন্ডিস যদি মারাত্মক অবস্থায় থাকে। অন্যথায় অপারেশন করা হয়।

প্র: জন্ডিস মারাত্মক অবস্থায় থাকলে অপারেশন করা হয়?

উ: সাধারণ অবস্থায় করা হয় না। তবে সেরকম প্রয়োজন পড়লে করতে হয়। আসলে কখনই আর সি পি করা দরকার, কখন অপারেশন করা উচিত, এটা এত জটিল ব্যাপার যে সব সময় সেভাবে বোঝানো সম্ভব নয়। তবে খুব বেশি জন্ডিস থাকলে অপারেশন সব সময়ই বিপজ্জনক।

প্র: কী রকম বিপজ্জনক? রোগী মারা যেতে পারে?

উ: জন্ডিস বেশি দিন চললে শরীরে ভিটামিনের ঘাটতি হয়। ভিটামিন কে-র ঘাটতির ফলে অপারেশনের সময় প্রচুর রক্তপাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। দীর্ঘদিন অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস চলতে থাকলে পিত্ত পাকস্থলিতে আসতে না পেরে উল্টো পথে গিয়ে ক্রমাগত লিভারের উপর চাপ সৃষ্টি করে। এর সঙ্গে আছে বিলিরুবিনের প্রভাব। বিলিরুবিন কিডনির পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। অতএব অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিসের ফলে লিভার এবং কিডনি খানিকটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েই থাকে। এর উপর অপারেশনের ধকল পড়লে অবস্থা আরও খারাপ হয়।

প্র: এই অপারেশনের পর রোগী কোমাতে চলে যেতে পারে?

উ: সাধারণত বিলিরুবিন ২০র ওপর থাকলে অপারেশনের পর লিভার এবং কিডনির উপর চাপ পড়ে। অধিকাংশ সময়ই আগে থেকে ব্যবস্থা নেওয়ার দরুণ অবস্থাটা সামলে নেওয়া যায়। কিছু ক্ষেত্রে কখনও লিভার কখনও কিডনি কখনও বা দুইয়ের মিলিত অসুস্থতায় রোগী কোমা পর্যায়ে চলে যেতে পারেন।

প্র: এই অবস্থা এড়ানো যায় না?

উ: জন্ডিস নিজে থেকে এবং ওষুধ পত্রের দরুন একটু একটু করে কমতে শুরু করলে, বিলিরুবিন স্বাভাবিক হওয়া পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করতে পারি। যেমন পিত্তনালিতে আটকে থাকা পাথর কোনও কারণে যদি সামান্য ঢিলে হয়ে গেলে জন্ডিস কমবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু জন্ডিস কমবার বদলে বাড়তে শুরু করলে, রোগীকে খানিকটা প্রস্তুত করে নিয়ে অপারেশন করে দিতে হয়।

প্র: প্রস্তুত করে নেওয়া বলতে?

উ: রোগীর শরীরে যাতে পুষ্টির কোনও রকম ঘাটতি না হয় সেদিকে নজর দেওয়া হয়। সহজপাচ্য প্রোটিন যেমন ছোট মাছ, মুসুর ডাল, কমপ্ল্যান বা বাজারে যে সহজপাচ্য প্রোটিন যুক্ত খাবার কিনতে পাওয়া যায় যেমন রিসোর্স, রেকুপেস ইত্যাদি পরিমাণ মতো খেতে হয়। সঙ্গে শর্করা জাতীয় খাবার। কারণ লিভারের কার্যকারিতা ঠিক করতে শরীরে প্রচুর পরিমাণে গ্লুকোজ বা ডায়াবেটিস থাকলে ফ্রুকটোজের উপস্থিতি দরকার। বমি হওয়ার প্রবণতা থাকলে গ্লুকোজ বা ফ্রুকটোজ শিরার মাধ্যমে দেওয়া হয়। এরা শরীরে জল লবণের ঘাটতি পূরণ করেও কিছুটা উদবৃত্ত হিসেবে থেকে যায়। এর সঙ্গে নিয়মিত ম্যানিটল বা ল্যাসিকস দিয়ে প্রস্রাবের পরিমাণ বাড়ানো হয়। কিডনি কিছুটা সুস্থির হয়। নিয়মিত ভিটামিন কে ইনজেকশন দিলে অপারেশন চলাকালীন রক্তপাতের সম্ভাবনা কমে আসে।

প্রঃ অপারেশন, সুস্থতা সব ঠিকঠাক হয়ে গেলেও নাকি পিত্ত খুব কমজোরী হয়ে যায়? শরীরের কোনও কাজে আসে না?

উঃ ঠিক তা নয়। পিত্তথলি বাদ হয়ে যাওয়ার দরুন পিত্তর গাঢ়ত্ব কমে যায়। এবং দীর্ঘদিন অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস চললে অপারেশনের পরও লিভার কিছুদিন হালকা সবুজ বা হলুদ পিত্ত তৈরি করতে পারে না। সাদা রঙের পিত্ত চর্বি জাতীয় খাবার খুব ভালভাবে হজম করতে পারে না। সে এমনিও গলব্লাডার অপারেশনের পর চর্বি জাতীয় খাবার কম খেতে বলা হয়। এক্ষেত্রেও তাই খাওয়া যায়। তবে আর একটু কম পরিমাণে।

লাইপো সাকশনের পর নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে

অধ্যাপক (ডাঃ) সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়

দূরভাষ : ৩৫০-৯১৯১

প্র : লাইপো সাকশনের কথা আজকাল খুব শুনছি। এতে পেটের চর্বি পুরোপুরি কমে যায়?

উ : শুধু পেট নয়। শরীরের যে কোনও জায়গার চর্বি লাইপো সাকশন করে বার করা যায়। কিন্তু পুরোপুরি কমার ব্যাপারটা কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যেমন

(১) কতখানি চর্বি আছে শরীরে। ওজন খুব বেশী হলে, লাইপোসাকশনে তত ভাল ফল হয়না। কারণ একটা সিটিং এ শরীর থেকে ২০০০ সিসির বেশি চর্বি বার করা উচিত নয়।

(২) চর্বি বার করে নেওয়ার পর খাওয়া দাওয়া এবং জীবনযাত্রার কিছু নিয়ম কানুন মেনে চলা দরকার। না হলে আবার চর্বি জমে যেতে পারে।

(৩) ভুড়ি কিন্তু সবটাই চর্বির জন্যে হয়না। চামড়া-মাংসপেশি ঢিলে হয়ে গেলেও পেট বাড়তে পারে। এরকম হলে লাইপো সাকশন করার পর ঝুলে যাওয়া চামড়া কেটে বাদ দিলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে। একে বলে অ্যাবডোমেনোপ্লাস্টি।

(৪) লাইপো সাকশন করার পর নিয়মিত ব্যায়াম করা জরুরি।

প্র : বয়স হলে চোখের নীচ ফুলে যায়, মুখ, গলার চামড়া কুচকে যায়। কসমেটিক সার্জারি করে লাভ হবে?

উ : হ্যাঁ, ফেস লিফ্‌ট করে ভাল ফল পাওয়া যায়। তবে এর সঙ্গে আরও কয়েকটি জিনিস মেনে চলা দরকার। প্রথম, সুষম খাওয়া দাওয়া এবং নিযমিত কিছু ব্যায়াম শুরু করতে হবে। কিছু অসুখ যেমন উচ্চ রক্তচাপ বা ডায়াবেটিস থাকলে তাকে আয়ত্বে রাখতে হবে। এবং রজঃ নিবৃত্তির পর স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শমতো চালু করে দিতে হবে হর্মোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি।

প্র : মুখে ব্রণ, বসন্তের দাগ, বলিরেখা অথবা কাটা দাগ কসমেটিক সার্জারির সাহায্যে পুরোপুরি ঠিক করা যায়?

উ : ব্রণ, বসন্তের দাগ বা বলিরেখার ক্ষেত্রে ডার্মাব্রেশন অর্থাৎ মুখের ওপরের চামড়া বিশেষ পদ্ধতিতে ঘসে তুলে দেওয়া, খুব কাজে আসে। এই ঘসে তুলে দেওয়ার ব্যাপারটা রাসায়নিকের সাহায্যে করলে তাকে বলে ' কেমিক্যাল পিলিং'। সাদা চামড়ায় কেমিক্যাল পিলিংয়ের ফলাফল ভাল। কাটা দাগের ক্ষেত্রেও কসমেটিক সার্জারির ফলাফল খুব ভাল।

প্র : কাটা বা পোড়া দাগের ক্ষেত্রে কি আপনারা স্কিন গ্রাফটিং করেন?

উ : মুখে স্কিন গ্রাফটিং করলে পুরনো চামড়ার সঙ্গে নতুন চামড়া ভাল মেলে না। খুব বড় দাগ হলে কানের পেছনের চামড়া এনে করা হয়। মাঝারি দাগ ছোট অপারেশন করেই প্রায় মিলিয়ে দেওয়া যায়।

প্র : নাক চোখা করার অপারেশনে নাকি অনেক সময় সমস্যা হয়?

উ : আমাদের দেশে নাক বড় এবং চোখা করার অপারেশনের চাহিদা সব থেকে বেশি। একে বলে আগমেন্টেশন রাইনোপ্লাস্টি। চোখা নাক বোঁচা করা অর্থাৎ রিডাকশন রাইনোপ্লাস্টি নিয়ে কোন ঝামেলা নেই। খানিকটা হাড় বা কার্টিলেজ কেটে নিয়ে ঠিকঠাক করে দিলেই হল। কিন্তু চোখা বা বড় করার অপারেশনে নাককে ঠেলে ওপরে তোলার জন্য হাড় নয় কার্টিলেজ নয়তো প্রসথেসিসের সাহায্য দরকার পড়ে। এই প্রসথেসিস সামান্য কিছু ক্ষেত্রে অসুবিধে সৃষ্টি করতে পারে। তবে এ নিয়ে অত ভাবার কিছু নেই। অধিকাংশ সময়েই এই অপারেশনে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়। আবার অনেক সময় নাকে হাত না দিয়ে আমরা কারিগরি করি চিবুকে। চিবুক এগুনো হলেও নাক ভোতা লাগতে পারে। তখন চিবুক কেটে ছোট করে দিলে সমস্যার সমাধান হয়। উল্টোটাও হয়। প্রসথেসিস বসিয়ে চিবুক বাড়িয়ে নাকে কিছুটা ভোতা ভাব দেখানো যায়। চিবুকের ক্ষেত্রে প্রসথেসিস খুব ভাল কাজ করে।

প্র : আর মেয়েদের ব্রেস্টে? ব্রেস্টে তো আকছার প্রসথেসিস বসানো হয়।

উ : ব্রেস্টের ক্ষেত্রে প্রসথেসিস বসানোর ফল খুব ভাল। তবে একটু খরচ সাপেক্ষ। ভাল প্রসথেসিসের দাম প্রায় ২৫-৪০ হাজার টাকার কাছাকাছি।

প্র : ব্রেস্ট কেটে ছোট করা বা গঠন ঠিক করার ক্ষেত্রে খরচ কী রকম?

উ : ভাল জায়গায় করালে ২০-২৫ হাজার টাকা।

প্র : প্রসথেসিস থেকে ব্রেস্ট ক্যান্সার হতে পারে?

উ : প্রসথেসিস থেকে ক্যান্সার হয় এটা প্রমাণিত নয়। তাও কিছু সাবধানতা নেওয়া হয় আজকাল। ব্রেস্ট প্রসথেসিস আসলে সিলিকনের বেলুন যার মধ্যে আগে ভরা থাকত সিলিকন জেল। সিলিকন জেল কোনওভাবে শরীরের সংস্পর্শে এলে ক্যান্সার ঘটাতে পারে এ সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ থাকলেও আজকাল সিলিকন জেল ব্যবহার করার বদলে ব্যবহৃত হচ্ছে নর্মাল স্যালাইন। এর সম্বন্ধে এখনও কোনও অভিযোগ নেই।

প্র : কিন্তু প্রসথেসিস বসানোর কিছুদিনের মধ্যে একটা, কখনও বা দুটো ব্রেস্টই আবার আগের অবস্থায় ফিরে এসেছে —এই অভিযোগ তো আছে।

উ : ব্রেস্ট অপারেশনের সাফল্য খুব ভাল। এরকম অভিযোগের খবর আমার জানা নেই।

প্র : আজকাল খুব শুনছি হেয়ার ট্রান্সপ্লান্টের কথা। এভাবে সত্যি টাকে চুল গজানো যায়?

উ : হেয়ার ট্রান্সপ্লান্টের ফলাফল বেশ ভালই। এক জায়গা থেকে গাছের চারা তুলে যেমন অন্য জায়গায় বসানো হয়, এখানেও সেরকম মাথার পেছনের ঘন চুলের সারি থেকে একটা একটা করে তুলে এনে ফাকা জায়গায় বসানো হয়। সময় সাপেক্ষ কাজ। এক একটা সিটিং এ ৫-৬ ঘন্টা করে সময় লাগে। কমসে কম ৩ টে সিটিং এর দরকার হয়।

প্র : যেখান থেকে চুল তুলে আনা হয় সে জায়গাটা ফাঁকা হয়ে যায় না?

উ : না তা হয়না। যে সারি থেকে চুল তোলা হয় তার আগের সারির চুল একটু বড় হলেই ওই সামান্য ফাক ঢেকে দেয়।

প্র : ট্রান্সপ্লান্ট করে বসানো চুলও তো স্বাভাবিক চুলের মতো উঠে যেতে পারে। সেখানে তখন আবার নতুন চুল গজাবে?

উ : হ্যাঁ।

প্র : যত চুল পেছন থেকে এনে সামনে বসানো হয় সব কটাই ঠিকঠাক বেড়ে ওঠে?

উ : সব চারা থেকে যেমন গাছ হয়না, ঠিক তেমনই যত কটা চুল এনে বসানো হয় তার সবকটা নাও বাঁচতে পারে।

প্র : অনেক বড় টাকের বেলায়ও কি এই পদ্ধতি কাজে আসে?

উ : বড় টাক ঢাকারও পথ আছে। তবে খরচ বেশ বেশি। পদ্ধতির নাম টিস্যু এক্সপানসান। টিস্যু এক্সপানশন পদ্ধতিতে ৩-৪ টে সিলিকনের তৈরি বেলুন বা এক্সপানডার মাথার দু'পাশে এবং পেছনে, যেখানে চুল আাছে, চামড়ার নিচে বসিয়ে দেওয়া হয়। এবার রোজ খানিকটা করে স্যালাইন প্রত্যেকটা বেলুনের মধ্যে ইনজেকশন দিয়ে ঢোকানো হয়। মাস খানেকের মধ্যে বেশ বড় বড় ৩-৪টে চুলওয়ালা টিউমাব তৈবি হয়ে যায় মাথায়। সিলিকন বেলুন সরিয়ে নিয়ে এবার চুলওয়ালা বড় চামড়া কেটে নেওয়া হয়। এবার ট্রান্সপ্লান্ট। টাকের চামড়া কেটে এই চামড়া বসিয়ে দেওয়া হয়।

প্র : তার মানে মাথায় ৩-৪টে বড় বড় টিউমার নিয়ে ১ মাস ঘরে বসে থাকতে হবে?

উ : টুপি মাথায় দিয়ে বেড়নো যায়। অথবা ঘরে বসে থাকতে হবে।

প্র : খরচ কী রকম?

উ : এক একটা এক্সপানডারের দাম ৪০-৬০ হাজার টাকা। ডাক্তার, নার্সিং হোমের খরচ নিয়ে ২.৫-৩ লক্ষ টাকা।

আগুন লাগলে গায়ে জল ঢেলে দিতে হবে

অধ্যাপক (ডাঃ) জি ডি মুখোপাধ্যায়

দূরভাষ : ২৪৬-৭১৩০

প্র : গায়ে আগুন লাগলে কম্বল বা ভারী কাপড় চাপা দিয়ে দিলে উপকার হবে?

উ: না এতে ক্ষতি হয়। আগুন থেকে ক্ষতির পরিমাণ নির্ভর করে আগুনের তাপ এবং কতক্ষণ তা শরীরে রয়েছে তার উপর। আগুন লেগে যাওয়ার পর তাপ নিয়ে আমাদের আর কিছু করবার নেই। কিন্তু সময়ের পরিমাণ আমরা কমাতে পারি বেশি করে জল ঢেলে দিয়ে। কম্বল বা ওই জাতীয় কিছু দিয়ে চেপে ধরলে আগুন নিভলেও তাপ ভেতরে রয়ে যায়। পোড়া ওপর দিকে আর না ছড়ালেও তার গভীরতা বাড়তে পারে।

প্র: পুড়তে দেখলে জল ঢেলে দেওয়া তো সবথেকে সহজ কাজ। কিন্তু আমাদের ধারণা ছিল পোড়া শরীরে জল দিলে ফোস্কা পরে যায়, যা খুবই ক্ষতিকর।

উ: ফোস্কা পড়ুক আর যাই পড়ুক পুড়ে গেলে প্রাথমিক কাজ জল ঢেলে শরীর ঠাণ্ডা করা। বাকি ব্যাপার ডাক্তার বুঝবে।

প্র: কিন্তু আমরা যে শুনেছি পোড়া জায়গায় নারকোল তেল বা বার্নল লাগালে খুব উপকার।

উ: গায়ে আগুন লেগে গেলে, সে হাতে, পায়ে, মুখে, শরীরে যেখানেই হোক সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর জল ঢালতে হবে। এই কাজটা যত তাড়াতাড়ি পারবেন তত উপকার। যদি দেখেন অল্পস্বল্প পুড়েছে, সে রকম খারাপ জায়গায় পোড়েনি এবং রোগী সুস্থ, আরেক ধাপ এগোতে পারেন। পরিষ্কার কাচা কাপড়ের ওপর শুইয়ে দিন। পিঠে, কোমরে বা পায়ের পেছন দিক হলে উপুড় করে। এবার সিলভার সালফা-ডায়াজিন অথবা পভিডন-আয়োডিন মলম আলতো করে লাগিয়ে গজ চাপা দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিন। প্রতিদিনই প্রায় ব্যাণ্ডেজটা পাল্টাতে হবে। অন্তত প্রথম ৩-৪ দিন। এরপর ব্যাণ্ডেজ ভিজে গেলে পাল্টাতে হবে। সাধারণত এক দিন বাদে বাদে করা দরকার হয়। পোড়ার জায়গাটা শুকনো রাখতে হবে। তেল, জল কিছু যেন না লাগে। এর সঙ্গে কখনও অ্যান্টিবায়োটিক খেতে দিতে হয়। বেশি দেওয়া হয় পেনিসিলিন, সেফালোস্পোরিন অথবা সালফার ড্রাগ।

প্র: আপনি বললেন, যদি দেখেন অল্পস্বল্প পুড়েছে এবং খারাপ জায়গায় পোড়েনি এটা আমরা কী করে বুঝব?

উ: পোড়ার অনেক রকম হিসেব নিকেশ আছে। তার উপর নির্ভর করে পোড়া মৃদু, মাঝারি না মারাত্মক।

প্রথম হল, কতটা জায়গা পুড়েছে। পোড়া যদি শরীরের ৫-৭ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তবে পোড়ার গভীরতার উপর নির্ভর করে তাকে মৃদু বা মাঝারি বলা হবে। একটা ধারণা দিচ্ছি। একটি হাত সম্পূর্ণ শরীরের ৯ শতাংশ। কাজেই হাতের অর্ধেকটা যদি হাল্‌কা ভাবে পুড়ে যায়— মাঝারি পোড়া বলা যাবে। কিন্তু শরীরের বেশ কয়েকটি জায়গা যেমন মুখ, গলা, বগল, কনুইয়ের ভেতর দিক, আঙুল, বুক, কুচকির এলাকা, হাঁটুর পিছন দিক, পায়ের তলা ইত্যাদি পুড়লে শতাংশের হিসেবে কম জায়গা হলেও, অনেক সময় পোড়ার গভীরতার উপর নির্ভর করে তা মারাত্মক রূপ নিতে পারে।

প্র: কতখানি গভীর হয়ে পুড়েছে সেটা কীভাবে বোঝা যাবে?

উ: এর তিন রকম ভাগ—

(১) হাল্‌কা ছ্যাকা লাগলে অনেক সময় জায়গাটা লাল হয়ে যায়, এক্ষেত্রে পোড়ে চামড়ার একদম ওপরের আস্তরন এপিডার্মিস, যেখান থেকে নুন ছাল ওঠে। এর গভীরতা সব থেকে কম বলে একে বলে ফার্স্ট ডিগ্রি বার্ন।

(২) চামড়ার ওপরের স্তর এপিডার্মিসের নীচে চামড়ার যে সাদা অংশ আছে তার নাম ডার্মিস। সেকেন্ড ডিগ্রি বার্ন-এ পুরো এপিডার্মিস এবং ডার্মিসের কিছু অংশ পুড়ে যায়।

(৩) থার্ড ডিগ্রি বার্ন মানে অতি সাঙ্ঘাতিক অবস্থা, এপিডার্মিস, ডার্মিস সব পুড়ে গেছে।

কোনটা সেকেন্ড ডিগ্রি কোনটা থার্ড ডিগ্রি বার্ন সাধারণ মানুষের পক্ষে তা বোঝা সম্ভব নয়। এসব হচ্ছে এমারজেন্সি অবস্থা। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ডেকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত।

প্র: কী থেকে পুড়লে পোড়া সবথেকে গভীর হয়?

উ: সব কিছু থেকে হতে পারে। আগে যে জল ঢেলে দেওয়ার কথা বলেছি, এই গভীরতা রুখতেই। আগুন যত কম সময়ের জন্য শরীরে থাকবে পোড়ার গভীরতা তত কম হবে। কোট বা কম্বল দিয়ে চেপে ধরলে পোড়ার গভীরতা বেড়ে যায় বলে ৫-৭ শতাংশ পোড়াও বিপজ্জনক হয়ে যায়।

প্র: অ্যাসিড ছুড়ে দিলে মুখ যে বিকৃত হয়ে যায়— তা রোখবার কোনও পথ নেই?

উ: অন্য সব পোড়াতে জল দিলে তাপমাত্রা নেমে যায়। কিন্তু অ্যাসিডের ক্ষেত্রে জল ঢালা মাত্রা তাপমাত্রা এক লাফে বেড়ে যায় অনেকখানি। তারপর প্রচুর জল দিতে দিতে যখন অ্যাসিড পুরোপুরি ধুয়ে যায় তখন তাপমাত্রা কমে। আচমকা তাপ বেড়ে যাওয়ার দরুণ পোড়ার গভীরতা বেশি হয় এবং মুখের চামড়া নরম বেশি বলে বিকৃতি আসতে পারে। অ্যাসিডে পুড়লে খুব লঘু সোডিয়াম বাইকার্বনেটের দ্রবণ দিয়ে ধোয়ার নিয়ম। কিন্তু হাতের কাছে পাওয়া মুশকিল। তাই প্রচুর জল দিয়ে বারবার করে ধুয়ে দিলেও কিছুটা ফল পাওয়া যাবে।

প্রঃ ইলেকট্রিকে পুড়লেও কি জল দেওয়া যায়?

উঃ প্রথমে বাঁশ বা লগির সাহায্যে মানুষটিকে ঠেলে সরিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন করতে হবে। তারপর জল ঢালা এবং পোড়ার পরিমাণের উপর নির্ভর করে পরবর্তী ব্যবস্থা।

প্রঃ বেশি পুড়ে গেলে কলাপাতায় শুইয়ে রাখতে হয়?

উঃ না, বেশি পুড়ে গেলে পরপর কয়েকটি জিনিস করবেন।

(১) বেশি করে জল ঢেলে শরীর ঠাণ্ডা করে সব কাপড় জামা খুলে অল্প হাওয়ায় ভেজা শরীর শুকিয়ে নিন

(২) অ্যাম্বুলেন্সের জন্য ফোন করুন

(৩) ডাক্তার বাড়িতে ডেকে পাঠান

(৪) পরিষ্কার করে কাচা চাদর বা কাপড় ঘরে ভাল করে ইস্তিরি করে নিন।

(৫) ওই চাদর বা কাপড়ের ভেতরের অংশ প্রায় জীবাণু মুক্ত হয়ে যায়। রোগীকে ওটা দিয়ে মুড়ে নিন।

এই পর্যন্ত আপনার কাজ। বাকি ব্যবস্থা ডাক্তার এসে করবেন।

প্রঃ হাসপাতাল বা নার্সিং হোমেই যদি নিয়ে যেতে হয়, বাড়িতে আর ডাক্তার ডাকার কি দরকার?

উঃ ডাক্তার ডাকা দরকার প্রাথমিক কয়েকটি ব্যাপার সামলানোর জন্য।

(১) খুব বেশি পুড়ে গেলে অর্থাৎ পোড়ার পরিমাণ যদি ১৫ শতাংশের বেশি হয়। রক্তের জলীয় অংশ, পুড়ে যাওয়া অংশগুলির মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসতে শুরু করে। পোড়ার ওপর ব্যান্ডেজ করে রাখলে তাই বারবার ব্যান্ডেজ ভিজে যেতে থাকে। প্লাজমা বেশি পরিমাণে বেরিয়ে গেলে প্রোটিন ঘাটতি হয়। এবং তাৎক্ষণিক ভাবে শরীরে জলশূন্যতা দেখা দিতে পারে। জলশূন্যতা মাত্রা ছাড়ানোর আগেই স্যালাইন লাগিয়ে দিতে পারলে বিপদ কমে।

(২) প্লাজমা বেরিয়ে যাওয়ার জন্য খুব দ্রুত আরও কয়েকটি অসুবিধে দেখা দিতে পারে। • হৃৎস্পন্দন খুব বেড়ে যাওয়া, • জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়তে থাকা, • প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ পরিপূর্ণ জলশূন্যতার উপসর্গ। এই তিনটি ঘটনা একসঙ্গে ঘটলে রোগী আচমকা মারাও যেতে পারেন। এসময় ডাক্তার থাকলে তিনি দরকার মতো ব্যবস্থা নিতে পারবেন।

(৩) অবস্থা বেশি খারাপ হলে শুরুতেই ক্যাথিটার পরিয়ে দিতে পারলে ভাল, তাহলে কতটুকু প্রস্রাব হচ্ছে সেটা মাপতে পারা যাবে। ঘণ্টায় যদি ৫০ সি সি-র মতো প্রস্রাব হয়, তাৎক্ষণিক বিপদের ভয় কমে।

হাসপাতাল কাছে পিঠে হলে এত কিছু না করেও নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু দূরত্ব বেশি হলে, যদি ২-৩ ঘণ্টা লেগে যায়, পৌঁছতে তবে আগেই ব্যবস্থা করে নেওয়া দরকার।

প্রঃ আর ড্রেসিং?

উঃ রোগীর জীবন মরণের সমস্যা মিটে গেলে তারপর ড্রেসিং এবং অন্যান্য চিকিৎসা শুরু হয়।

প্রঃ অন্যান্য চিকিৎসা বলতে?

উঃ জল-লবণের ঘাটতি পূরণের কাজ স্যালাইনের মাধ্যমে চলতে থাকে। প্রোটিন এবং প্লাজমার ঘাটতি মেটাতে কখনও প্লাজমা দিতে হয়, কখনও রক্ত দেওয়ার দরকার পড়ে। চালু হয় নানা রকম অ্যান্টিবায়োটিক এবং অন্যান্য ওষুধপত্র। আর প্রতিদিন নিয়ম করে ড্রেসিং।

প্রঃ ড্রেসিংয়ের সময় যন্ত্রণা কমানোর কোনও পথ নেই?

উঃ বড় ড্রেসিং হলে এবং কিছু ক্ষেত্রে ছোট ড্রেসিংয়ের বেলাতেও অজ্ঞান করে করা হয়। তবে পোড়ার ক্ষত খুব গভীর হলে অনেক সময় কিছু কিছু স্নায়ুর অংশ বিশেষও পুড়ে যায় বলে ব্যথা বোধ থাকে না।

প্রঃ কিন্তু জ্বালা তো থাকে?

উঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জ্বালা এবং ব্যথা দুইই খুব থাকে। ওষুধপত্র দিয়ে কিছু কমিয়ে রাখা হয়। কখনও ঘুমের ওষুধ দিতে হয়।

প্রঃ অনেক সময় দেখা যায় চিকিৎসার ফলে রোগী ভাল হয়ে উঠছেন। সকালে ভাল, বিকেলে আচমকা মারা গেল। এটা কি নার্সিংহোম বা হাসপাতালের গাফিলতির জন্য হয়?

উঃ বেশি পুড়ে গেলে চারটি কারণে রোগী মারা যেতে পারে।

(১) প্রথম ২-৪ দিনের মধ্যে শরীরে মারাত্মক জলশূন্যতার জন্য

(২) প্রথম ৩ সপ্তাহের মধ্যে যদি সংক্রমণ আয়ত্বে না আনা যায়

(৩) ৩ সপ্তাহ পরে রোগী মারা যেতে পারে শরীরে প্রোটিনের ঘাটতি, দুর্বলতা বা সংক্রমণের দরুণ

(৪) অপুষ্টি, শ্বাসকষ্টের দরুনও মারা যেতে পারে

মাবাত্মক ভাবে পুড়ে যাওয়া রোগীর ক্ষেত্রে সব সাবধানতা নেওয়া সত্ত্বেও যে কোনও ধাপে অঘটন ঘটতে পারে।

প্রঃ অনেক পুড়ে গেলে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু অনেকসময় দেখা যায় যে পোড়া তেমন বেশি কিছু নয়, কিন্তু রোগী আচমকা মারা গেল। এরকম কেন হয়?

উঃ শরীরের কতটা অংশ পুড়ল, কত গভীর পর্যন্ত পুড়ল সেটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক ততখানিই গুরুত্বপূর্ণ কোন জায়গা পুড়েছে এবং কীভাবে পুড়েছে। কয়েকটি উদাহরণ দিই।

ধরুন, অ্যাসিড ঢেলে দিল মুখের উপর। খানিকটা অ্যাসিড গলা দিয়ে পেটে বা শ্বাসনালিতে চলে গেল। উপরে দেখা গেল সামান্য অংশই পুড়েছে। কিন্তু শ্বাসনালির অংশবিশেষ পুড়ে গুটিয়ে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। আচমকা মৃত্যু হতে পারে। খাদ্যনালির পথ বন্ধ হয়েও সাঙঘাতিক বিপদের সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে। ইনহেলেশন বার্নের দরুণও আচমকা মারা যেতে পারে রোগী। গরম ধোয়ার মধ্যে আটকে পড়লে শ্বাসপ্রশ্বাসের মাধ্যমে ওই উত্তপ্ত ধোয়া শ্বাসনালির ভেতরের দেওয়ালের নরম আবরণ পুড়িয়ে, নষ্ট করে শ্বাসপ্রশ্বাস যাওয়ার পথ বন্ধ করে দিতে পারে। অথচ এসব ক্ষেত্রে উপরে দেখে বিশেষ পুড়েছে বলে মনে হবে না।

হাঁপানি রোগীর গলা বা বুক যদি গভীর ভাবে পুড়ে যায় আচমকা বিপন্ন হতে পারে। অতএব অল্প পুড়ুক বা বেশি পুড়ুক ডাক্তার ডাকা জরুরি। বিশেষ করে শিশু এবং বৃদ্ধদের বেলায়।

প্র: রান্না বান্না করতে গিয়ে তো অহরহ পোড়ে। সে সবের জন্যও ডাক্তার দেখাতে হবে?

উ: সামান্য ছ্যাঁকা লাগলে সমস্যা নেই। কিন্তু বড় ব্যাপার হলে নারকোল তেলের উপর নির্ভর করলে বিপদ হতে পারে।

প্র: বড় ফোস্কা গেলে দিলে ক্ষতি হবে?

উ: প্রথমে দেখতে হবে ফোস্কা কোথায় পড়েছে। পিঠে, কোমরের নীচে, হাতের চেটো বা ভেতরের দিকে, পায়ের নীচে ফোস্কা পড়লে বেশি সাবধান হতে হবে। প্রথমে পভিডন-আয়োডিন বা স্যাভলন জাতীয় অ্যান্টিসেপটিক লোশনের সাহায্যে জায়গাটা একটু মুছে নিয়ে পরিশুদ্ধ সিরিঞ্জ দিয়ে ফোস্কার জল টেনে নিতে হবে। ফোঁস্কার চামড়া যথাস্থানে রেখে পভিডন-আয়োডিন বা সিলভার সালফা ডায়াজিন জাতীয় মলম লাগিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিতে হবে। এক দু'দিন বাদে বাদে ব্যান্ডেজ পাল্টাতে হবে। এবং দরকাব হলে অ্যান্টিবায়োটিক খেতে হতে পারে।

প্র: ডায়াবেটিস থাকলে পোড়ার ঘা সহজে শুকোয় না?

উ: হ্যাঁ ডায়াবেটিস থাকলে ঘা শুকোতে দেরি হয়।

প্র: ঘা শুকোনোর ব্যাপারে কি খাওয়া দাওয়ার কোনও ভূমিকা আছে?

উ: ঘা শুকোনোর জন্য নয় পুড়ে গেলে খাওয়া দাওয়ার নিয়ন্ত্রণ দরকার শরীরের নানান ঘাটতি পূরণের জন্য। খুব বেশি পুড়ে গেলে প্রথম ২-৩ দিন খেতে দেওয়া হয় না। শরীরে পুষ্টি আসে স্যালাইনের মাধ্যমে। এরপর শরীরের অবস্থা বুঝে হালকা তরল খাবার থেকে ধীরে ধীরে শক্ত খাবার দেওয়া শুরু হয়। শরীরে প্রোটিনের ঘাটতি মেটাতে প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবারও খাওয়ানো হয়।

অল্প পুড়ে গেলে প্রথম দিন তরল খাবার দেওয়া হয়। পরে বমি না হলে স্বাভাবিক খাবার।

প্র: ঘা সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাওয়ার পর স্কিন গ্রাফ্‌টিং করা উচিত?

উ: হ্যাঁ।

রোগীর খাবার হওয়া উচিত সুস্বাদু

ববি হালদার

দূরভাষ : ২৪৪-২৮৬৮

প্র : জণ্ডিস হলে পেঁপে সেদ্ধ খেতে হবে?

উ : আগে বলা হত জণ্ডিস হলে সেদ্ধ খাবাব খেতে হবে। পেঁপে সেদ্ধ, সবজি সেদ্ধ, মাছ সেদ্ধ। আজকাল এই অত্যাচার বন্ধ হয়েছে। জটিল থেকে সাধারণ, প্রায় সব ধরনের জণ্ডিসেই, অল্প তেলে সাঁতলে রান্না করা খাবার দেওয়া হচ্ছে রোগীদের। পেঁপে খেতে হবে এমন বাধ্যবাধকতা নেই। তবে নিষেধাজ্ঞা আছে চর্বি জাতীয় খাবার এবং অতিরিক্ত প্রাণিজ প্রোটিনে।

প্র : চর্বি জাতীয় খাবার কি গলব্লাডারের অসুখেও খাওয়া বারণ?

উ : গলব্লাডার কার্যকারিতা হারালে চর্বি জাতীয় খাবার সহজে হজম হতে চায় না। তাই যথাসম্ভব কম খাওয়া উচিত। গলব্লাডারের অসুখে আক্রান্ত রোগীদের সকালে না খাওয়ার প্রবণতা থাকে। এটা কিন্তু খুবই খারাপ অভ্যেস। এঁদের কখনওই খালি পেটে থাকা উচিত নয়।

প্র : পেটের অসুখে যাঁরা ভোগেন তাঁদেরও তো খালিপেটে বেশিক্ষণ থাকা উচিত নয়?

উ : না উচিত নয়। আবার যাঁরা সুস্থ তাদেরও যদি এই বদভ্যেসটি থাকে, কিছুদিন পরে পেটের অসুখে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাবে।

প্র : পেপটিক আলসারে আগে ঠাণ্ডা দুধ খেতে বলা হত। আজকাল বারণ করা হয়?

উ : গ্যাসট্রাইটিস, ডিওডিনাইটিস থেকে পেপটিক আলসার, অর্থাৎ অ্যাসিড পেপটিক ডিজিজের প্রায় সব রোগেই আজকাল দুধ এবং দুধ থেকে তৈরি যে কোনও খাবারই বারণ করা হয়। কারণ সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, দুধের ক্যালসিয়াম পাকস্থলীর অ্যাসিড ক্ষরণ বাড়ায়। দুধ পেটে যাওয়ার ৩/৪ ঘণ্টা পর নতুন করে সমস্যা দেখা দিতে থাকে।

প্র : এঁরা তবে কী খাবেন?

উ : সকালে কর্নফ্লেক্স বা পরিজ অল্প স্কিমড বা ডাবল টোনড দুধের সঙ্গে খেতে পারেন। দুপুরে শাকসবজি, ডাল, ভাত, মাছ, মাংস অর্থাৎ যে কোনও হালকা ভাবে রান্না করা খাবার খাবেন। বিকেলে বাজারের কেনা খাবার না খেয়ে ঘরেই কিছু বানিয়ে খাওয়া যেতে পারে। রাত্রে দুপুরের মতোই খাবার। তবে খাওয়া এবং ঘুমের সময় যেন ঠিক থাকে। পেটের রোগে এটা খুব জরুরি।

প্র : এঁদের হাতে গড়া রুটি খাওয়া বারণ?

উ : হ্যাঁ, শুধু রুটি নয় অনেক কিছুই বারণ। যেমন ঝাল ঝোল মশলাদার খাবার, চা, কফি বা যে কোনও গরম পানীয়, কোল্ড ড্রিঙ্কস, তেলে ভাজা, চানাচুর, ফুচকা ইত্যাদি।

প্র : যাঁদের ঘনঘন পেট খারাপ হয়?

উ : খাওয়ার অনিয়মে পেট খারাপ হলে সেই বিশেষ খাবারটি বা খাবারগুলি বাদ দিলেই সুস্থতা আসবে। কোলনের কিছু অসুস্থতার দরুন পেট খারাপ হলে, যেমন আলসারেটিভ কোলাইটিস বা ক্রোনস ডিজিজ থাকলে, ফাইবার জাতীয় খাবার বর্জন করতে হবে। আমাশার রোগীর শাক সবজি, রুটি ইত্যাদি ফাইবার জাতীয় খাবার না খাওয়াই ভাল। দু'বেলা ভাত, হালকা মাছের বা মুরগির ঝোল। সঙ্গে অল্প পরিমাণে সবজি। সকাল বিকেল চিঁড়ে, মুড়ি, হালকা করে বানানো চাউমিন বা টোস্ট চলতে পারে। সঙ্গে জল ফুটিয়ে বা জিওলিন দিয়ে খাওয়া।

প্র : কোষ্ঠবদ্ধতায়?

উ : কোষ্ঠবদ্ধতায় ফাইবার জাতীয় খাবার বেশি খেতে হবে। ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোমে কোষ্ঠবদ্ধতা এবং ডায়েরিয়া পর পর চলতে থাকে। সেক্ষেত্রে রুটি, শাকসবজি বেশি না খেয়ে সাধারণ হাল্কা খাবার খাওয়াই ভাল। এবং দিনে ২বার ২চামচ করে ইসবগুলের ভুষি খেলে উপকার পাওয়া যাবে।

প্র : পেটের অসুখে ডাবের জল খাওয়া উচিত?

উ : ডাবের জলে পটাসিয়াম আছে। বারবার ডায়েরিয়া হলে বা গরমের দিনে বেশি ঘাম হতে থাকলে শরীরে লবণের ঘাটতি পূরণ করতে ডাব খাওয়া যেতে পারে। তবে ডাবের জল খেলে পেট ঠাণ্ডা থাকার কিন্তু কোনও ব্যাপার নেই। ডাবের জলের বদলে নুন চিনির সরবত খেলেও প্রায় একই উপকার।

প্র : কিডনির অসুখে ডাবের জল বারণ?

উ : কিডনির কার্যকারিতা কমে যেতে থাকলে রক্তে সোডিয়াম, পটাসিয়ামের পরিমাণ বাড়ে। তখন খুব কড়া হাতে খাবারে লবণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ডাবের জল, কাঁচা নুন, অধিকাংশ ফল, স্যুপ, সস, আচার, মাখন ইত্যাদি খাবার বাদ দিতে হয়। সোডিয়াম পটাসিয়াম যেহেতু জলে দ্রবণীয়, সবজি বেশ খানিকক্ষণ জলে ডুবিয়ে রেখে তবে রান্নার কাজে ব্যবহার করা উচিত। কোনও রকম ডাল এবং বীজ জাতীয় খাবার যেমন বিন, ঘুঘনি, মটর, রাজমা, ইত্যাদি খাওয়া একদম বন্ধ করা দরকার।

প্র : কিডনি স্টোনের প্রবণতা থাকলেও তো নানা রকম বিধি নিষেধ মেনে চলতে হয়?

উ : কিডনিতে পাথর হলে বা যাঁর পাথর অপারেশন হয়েছে—দুইয়েরই খাদ্য তালিকা থেকে বাদ হয়ে যায় ইউরিক অ্যাসিড, অ'লেট এবং সাইট্রেট সমৃদ্ধ খাবার। যেমন, টমেটো, বেগুন, পালং শাক, কচু, ওল, লেবু, পাঁঠা বা খাসির মাংস, মেটে, মাছের ডিম, মাছের মাথা, ওয়াইন, বড় মাছ ইত্যাদি।

প্র : হাঁপানিতেও শুনছি আজকাল খাবারে বিধি নিষেধ মেনে চলতে হচ্ছে?

উ : হাঁপানি এবং ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজের রোগীদের অসুস্থ হওয়ার ঠিক পরপর অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট সমৃদ্ধ খাবার খেতে নিষেধ করা হয়। যেমন ভাত, রুটি, আলু, ইডলি, দোসা ইত্যাদি। আক্রান্ত হওয়ার সময়গুলিতে বা ঠিক তার পরপর প্রয়োজনীয় ক্যালরি আসা উচিত চর্বি জাতীয় খাবার, মাখন, চিজ ইত্যাদি থেকে।

প্র : আর হৃদরোগ এড়াতে?

উ : রক্তে যদি ক্ষতিকর কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ে বা ডায়াবেটিস দেখা দেয় অথবা উচ্চ রক্তচাপ, ওষুধ পত্রের সঙ্গে সঙ্গে খাওয়া দাওয়ার নিয়ম কানুনও মানতে হবে। নয়তো হৃদরোগের প্রকোপ এড়াতে পারবেন না।

রক্তচাপ বেড়ে গেলে সকাল থেকে রাত অবধি কী কী খাবেন আর কী খাবেন না তাব একটা হিসেব দেওয়া যাক।

ভোরে চা বিস্কুট। ব্রেকফাস্টে পরিজ, হাতে গড়া রুটি তরকারি বা টোস্ট সামান্য কিছু ফল, দুধ বা ছানা খেতে পারেন। খাওয়া যেতে পাবে চিকেন বা সবজির স্টু। ঘি, মাখন, ডিম বাদই দেবেন। দুপুরে খাবেন কম তেলে রান্না খাবার। বিকেলে ভাজাভুজি খাওয়ার অভ্যেস থাকলে বাদ দিতে হবে। লেট নাইট পার্টি, মদ্যপান, ধূমপান ধীরে ধীরে ছাড়ার চেষ্টা করুন। রাত্রে মোটামুটি হালকা খাবার এবং ঘুম দরকার। পাতে নুন খাওয়ার অভ্যেস ত্যাগ করুন।

এবার ডায়াবেটিস। ডায়াবেটিসে আগে কড়াকড়ি ছিল খুব বেশি। চিনি এবং মিষ্টি জাতীয় যে কোনও খাবার অর্থাৎ রিফাইন্‌ড কার্বোহাইড্রেট, সহজে হজম হয় এমন কার্বোহাইড্রেট অর্থাৎ আলু, ভাত ইত্যাদির ওপর ছিল কড়া নিষেধাজ্ঞা। আজকাল ব্যাপারটা সহজ হয়েছে খানিকটা। ডায়েট রেসট্রিকশন নয়, চালু হয়েছে ডায়াটারি এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম। উঠে গেছে ডায়েট কন্ট্রোল, এসেছে সামান্য ক্যালরি কন্ট্রোলের ধাক্কা। মাঝবয়সে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হলে সীমিত ক্যালরি খাওয়া একান্ত জরুরি। এই বয়সে সাধারণত ওজনও খানিকটা বাড়তে শুরু করে। কাজেই ক্যালরি কন্ট্রোল করে, শুধু যে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে আসবে তা নয়, ওজনও কমবে। পরোক্ষ ভাবে ডায়াবেটিস কমাতে এরও প্রয়োজন আছে।

কম বয়সী ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে ক্যালরির হিসেব নিকেশে বেশি কড়াকড়ি হলে পুষ্টির ঘাটতি দেখা দিতে পারে। কাজেই ডায়াবেটিস রোগীর খাদ্যতালিকা বানাতে গেলে ডাক্তার অথবা অভিজ্ঞ ডায়াটিশিয়ানের পরামর্শ বাঞ্ছনীয়। কমপ্লেক্স

কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার যেমন, নানা ধরনের ফল, ভাত, রুটি, ডাল, তরিতরকারি, মাছ, মুরগি, ইত্যাদি পরিমাণ মতোই খেতে হবে। আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট জাতীয় খাবার যেমন, ডালডা, চর্বি, সরষের তেল প্রায় বর্জন করতে হবে। সরাসরি চিনি বা যে কোনও মিষ্টি খাবার যথাসম্ভব বাদ দেওয়া ভাল। তবে কখনও যদি একটা মিষ্টি বা পায়েস বা কাস্টার্ড খেয়ে ফেলেন পরের খাবারে খানিকটা ক্যালরি কমিয়ে দিলেই চলবে।

রক্তে ক্ষতিকর কোলেস্টেরলের পরিমাণ বেশি থাকলে ডালডা, ঘি, সরষের তেল, ডিমের কুসুম বাদ দিতে হবে।

প্র : এ তো কেবলই বাদ বাদ।

উ : একদম নয়। পুরনো দিনের দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখুন। জ্বরজারিতে বার্লি, পেটের অসুখে পেঁপে কাঁচকলার ঝোল আর উচ্চ রক্তচাপে কেবল দুধভাত। ভাল ভাল ওষুধ বেরিয়ে যাওয়ার ফলে আজকের দিনে খাবারের বিধি-নিষেধ অনেক কমে গেছে। আগে ছিল ডায়াটারি-রেসট্রিকশন অর্থাৎ অসুখে বিসুখে খাওয়ার বিধি নিষেধ। আজ তার নাম 'নিউট্রিশনাল ইনটারভেনশন প্রোগ্রাম' অর্থাৎ সঠিক পুষ্টির মাধ্যমে সুস্থতার দিকে এগোনো।

ওয়াকম্যানে গান শুনলে শ্রবণশক্তি কমে যেতে পারে

অধ্যাপক (ডাঃ) শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়

দূরভাষ : ২৪৭-০৫১১

প্র: ম্যালেরিয়ার ওষুধ থেকে বধিরতা দেখা দিতে পারে?

উ: হ্যাঁ। ওষুধ চলাকালীন যদি কারোর কান ভোঁ ভোঁ কবে, তালা লাগে বা কম শুনছেন বলে মনে হয়, বুঝতে হবে বধিবতা দেখা দিতে চলেছে। এসময় দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। অর্থাৎ যে ওষুধ থেকে এই অবস্থা দেখা দিয়েছে সেটা বন্ধ করে, বিকল্প কোনও ম্যালেরিয়ার ওষুধ খাওয়া এবং কানের চিকিৎসা চালু করা। নাহলে বধিরতা স্থায়ী হয়ে যেতে পারে।

প্র: আর কোনও ওষুধ থেকে কি এরকম হয়?

উ: প্রচুর ওষুধ থেকে এরকম হতে পারে। এদের বলে 'ওটোটক্সিক ড্রাগ'। যেমন অ্যাসপিরিন, অ্যামিনোগ্লাইকোসাইড গোত্রের কিছু ওষুধ যেমন জেন্টামাইসিন, কিছু ক্যান্সার প্রতিরোধী ওষুধ, ল্যাসিক্স ইত্যাদি। তবে ডাক্তারের পরামর্শ মতো সঠিক মাত্রায় ওষুধ খেলে তত অসুবিধে কিছু হয় না।

প্র: সর্দি কাশি হলেও তো অনেক সময় কানে কম শুনছি বলে মনে হয়?

উ: শুধু সর্দি কাশি কেন, নাক এবং গলার অন্য অনেক অসুখ যেমন টনসিলাইটিস, অ্যাডেনোডাইটিস, সাইনোসাইটিস ইত্যাদি থেকেও এরকম হতে পারে। এমনকি এসব থেকে কিছু ক্ষেত্রে বধিরতা পর্যন্ত দেখা দিতে পারে। বিশেষ করে রোগগুলি যদি পুষে রাখা হয়। বাচ্চাদের বেলায় এরকম হওয়ার সম্ভাবনা আবও বেশি।

প্র: অর্থাৎ টনসিল, অ্যাডেনয়েড বা সাইনাসের সমস্যা থেকেও বধিরতা হতে পারে?

উ: টনসিল, অ্যাডেনয়েড, নাকে পলিপ, টিউমার ইত্যাদি পুষে রাখলে কানে নানান সমস্যা দেখা দিতে পারে। কানে পুঁজ হয়। এবং সেই পুঁজ কানের পর্দা ফাটিয়ে বাইরে

বেরিয়ে আসতে শুরু করে। যার প্রকোপে বধির হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়।

প্রঃ কানে পুঁজ হলে তার মানে বুঝতে হবে কানের পর্দা ফেটে গেছে?

উঃ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাই। কারণ অধিকাংশ সময় পুঁজ তৈরি হয় মাঝের কানে। বাইরের কানেও পুঁজ হতে পারে। তবে সে পুঁজের ধরনধারণ মাঝের কানের পুঁজের ধরনধারনের থেকে আলাদা।

প্রঃ কী করে বুঝব পুঁজ মাঝের কানে হয়েছে না বাইরের কানে?

উঃ বাইরের কানের পুঁজের তুলনায় মাঝের কানের পুঁজ গাঢ় এবং আঠালো হয় বেশি।

প্রঃ দু'ক্ষেত্রেই কি বধিরতা দেখা দিতে পারে?

উঃ চিকিৎসা না হলে পারে। তবে মাঝের কানের পুঁজের ক্ষেত্রেই সে সম্ভাবনা বেশি।

প্রঃ কানে পুঁজ হলে কী করব?

উঃ সমস্যা দেখা দেওয়ামাত্র ই এন টি বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। শুরুতে চিকিৎসা হলে অধিকাংশ সময় ওষুধেই রোগ সেরে যায়। কারোর কারোর ক্ষেত্রে টনসিল, অ্যাডেনয়েড বা সাইনাস অপারেশন করার দরকার পড়ে। কিছুক্ষেত্রে কানের মাইক্রোসার্জারিও করতে হতে পারে।

প্রঃ অনেকে বলেন সাঁতার কাটলে কানের পুঁজ সেরে যায়। এ ধারণা কি ঠিক?

উঃ কখনই না। কানে পুঁজ নিয়ে সাঁতার কাটলে বিপদ বাড়ে।

প্রঃ কী বিপদ?

উঃ জল ঢুকে কানের পুঁজ আরও বাড়ে। ফলে প্রথমে বাড়ে বধিরতা। কিছুক্ষেত্রে এর পর পুঁজ মাথায় চলে গিয়ে আরও নানান রোগ যেমন ম্যানিনজাইটিস, ব্রেন অ্যাবসেস ইত্যাদির সূচনা করতে পারে। পরিণামে মৃত্যুও হওয়া সম্ভব।

প্রঃ কানের পুঁজ থেকে মৃত্যু!

উঃ হ্যাঁ, কিছু ক্ষেত্রে মৃত্যু হওয়া সম্ভব। কারণ মাঝের কানে দু' ধরনের পুঁজ হতে পারে। এক, কম বিপজ্জনক, দুই, বেশি বিপজ্জনক। বেশি বিপজ্জনক পুঁজের সৃষ্টি মাঝের কানে জটিল প্রদাহের দরুণ। যা থেকে অনেক সময় এই ধরনের অঘটন ঘটা সম্ভব।

প্রঃ ভোগান্তির রকম দেখে কি বোঝা সম্ভব কার ক্ষেত্রে কী ধরণের পুঁজ সৃষ্টি হয়েছে?

উঃ বিপজ্জনক পুঁজ তৈরি হলে বধিরতার মাত্রা বেশি হবে। পুঁজের সঙ্গে রক্ত বেরোতে পারে, দুর্গন্ধ থাকে। মাথা ঘোরা বা মাথাব্যথাও থাকতে পারে।

প্রঃ এক্ষেত্রে চিকিৎসা করে বধিরতা আটকানো যায়?

উঃ আজকাল মাইক্রোসার্জারি করে অনেক সময়ই সামলানো যায় ব্যাপারটা। তবে এক্ষেত্রে জীবনের প্রশ্ন যেহেতু প্রথম তাই বধিরতা মিটবে না জেনেও অনেক সময় কানকে প্রদাহ মুক্ত করার জন্য অপারেশন করতে হয়।

প্রঃ কানে পুঁজ হলে কী কী নিষেধাজ্ঞা মেনে চলতে হবে?

উঃ (১) কানে জল ঢোকা চলবে না। প্রয়োজনে সাঁতার কাটা বা পুকুরে ডুব দিয়ে স্নান করা বন্ধ করতে হবে।

(২) বিষহরি তেল, কানচটা তেল বা গরম সর্ষের তেল কিছুই কানে দেওয়া চলবে উচিত নয়।

(৩) গ্রামে গঞ্জে অনেকে পেঁপের ফাপা ডালের একদিকটা পুঁজযুক্ত কানে ঢুকিয়ে অন্যদিকে আগুন ধরিয়ে দেয়। এসব করা চলবে না।

(৪) কানের পুঁজ পরিষ্কার করতে ময়লা কাপড় কি তুলো দিয়ে খোঁচানোও নিষিদ্ধ। বস্তুত সুস্থ অবস্থাতেও যদি এই অভ্যেস বন্ধ করা যায় কানের সমস্যা অনেক কম থাকবে।

প্র: কানে ময়লা জমলে কী করব? খোল থেকেও তো বধিরতা হতে পারে?

উ: কানে প্রচুর খোল জমে গেলে বধিরতা হতে পারে। কিন্তু খোল নিজে নিজে পরিষ্কার করা উচিত নয়। বিশেষজ্ঞের কাছে গেলে তিনি কানে ড্রপ দিয়ে খোল নরম করে নিয়ে তারপর পিচকিরির সাহায্যে কানটিকে ধুয়ে পরিষ্কার করে দেবেন। কিছু ক্ষেত্রে অপারেশনের প্রয়োজন পড়তে পারে।

প্র: তার মানে কানের খোল পরিষ্কার করার জন্য ডাক্তারের কাছে যেতে হবে?

উ: অবশ্যই। পর্দাকে বাঁচিয়ে অল্প জায়গার মধ্যে দিয়ে খোঁচাখুঁচি করে ময়লা বার করে আনা সহজ নয়। পর্দা বা পর্দার পেছনের হাড়ে আঘাত লাগলে বড় ধরনের ক্ষতি হতে পারে।

প্র: খোল জমলে অনেক সময় কানে দমধরা ভাব হয়। কানে দমধরার এছাড়া আর কোনও কারণ আছে কি?

উ: দমধরা মানে কানে ভারী ভাব, কমশোনা। কানে খোল হওয়া ছাড়াও এর পেছনে আরও নানান কারণ থাকতে পারে। যেমন বাইরের কানে পোকামাকড়, তুলো, কাগজ ইত্যাদি কিছু ঢুকে যাওয়া, ফোঁড়া হওয়া, মাঝের কানের প্রদাহজনিত অসুখ যেমন ওটাইটিস মিডিয়া, ওটোস্ক্লেরোসিস ইত্যাদি, ভেতরের কানে নার্ভের দুর্বলতা ইত্যাদি। এমনকি কানের রোগ ছাড়া অন্য রোগেও এরকম হতে পারে। যেমন, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হার্টের অসুখ, স্পন্ডিলাইটিস ইত্যাদি।

প্র: ওয়াকম্যানে গান শুনলে কি শ্রবণশক্তির ঘাটতি দেখা দিতে পারে?

উ: শুধু ঘাটতি নয়, একটানা ব্যবহার করলে শ্রবণশক্তি ভাল রকমই কমে যেতে পারে।

প্র: আর অনেকটা সময় যাঁরা ডিস্কোতে কাটান?

উ: এদের মধ্যেও শ্রবণশক্তির ঘাটতি দেখা দিতে পারে।

প্র: কলকারখানায় চড়া শব্দের মধ্যে যাঁদের কাজ করতে হয় তাঁদেরও তো একই সমস্যা দেখা দিতে পারে।

উ: হ্যাঁ। তবে কানে প্লাগ, মাস্ক বা ভেজলিন লাগানো তুলো লাগিয়ে ব্যাপারটা কিছুটা সামলানো যেতে পারে।

প্র: কানের কাছে আচমকা বোম বা পটকা ফাটলে কানের পর্দা ফেটে যেতে পারে?

উ: পর্দা ফেটে যেতে পারে অথবা নার্ভের ক্ষতি হয়ে বধিরতা দেখা দিতে পারে।

প্রঃ নার্ভের ক্ষতি তো বয়সের সঙ্গেও হয়। একে ঠেকিয়ে রাখার কোনও পথ নেই?

উ: বয়সের সঙ্গে অল্প বিস্তর কানে কম শোনার ব্যাপারটা প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রেই আসে। একে এড়িয়ে যাওয়ার কোনও পথ নেই। তবে জীবন যাপনের কিছু নিয়ম কানুন মেনে চললে ক্ষতির হার কমানো যায়। যেমন, ধূমপান, মদ্যপান না করা, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ আয়ত্তে রাখা, যে সব ওষুধ শ্রবণশক্তির হানি করতে পারে বলে জানা আছে, সেগুলি বেশি দিন ধরে ব্যবহার না করা ইত্যাদি।

ঠাণ্ডার ধাত থাকলে রোজ এক কোয়া রসুন খান

ডাঃ শ্যামাপদ দে

দূরভাষ : ৪৬৪-১১৯৩

প্র: ঘন ঘন সর্দি কাশি হলে কী করব?

উ: ঋতু পরিবর্তনের সময় ঠাণ্ডা গরমের ফলে অনেক সময় সর্দি, কাশি, নাক বন্ধ, মাথা ব্যথা ইত্যাদি নানারকম উপসর্গ দেখা দেয়। নিজে থেকেই আবার ঠিক হয়ে যায় দু'চার দিনে। ১০-১৫ শতাংশ মানুষের সমস্যা সহজে মিটতে চায় না। এঁরা বাজার চলতি যে কোনও নাকের ড্রপ ৩-৪ ফোঁটা করে দু'নাকে দিনে দু বার করে দেবেন। সঙ্গে অ্যান্টি হিস্টামিনিক কোনও ট্যাবলেট রাত্রে খাবার খাওয়ার আধঘন্টা আগে খাবেন। অধিকাংশ সময় ৫-৭ দিনে সমস্যা মিটে যাবে।

প্র: ফুটন্ত জলে কর্পূর দিয়ে তার ভাপ নিলে তো আরাম পাওয়া যায়?

উ: তা পাওয়া যায়। তবে এক চিমটি কর্পূরের সঙ্গে সম পরিমান মেনথল মিশিয়ে নিলে আরও উপকার পাওয়া যায়।

প্র: পা গরম জলে ডুবিয়ে রাখলে?

উ: এতেও আরাম পাবেন।

প্র: বার বার ঠাণ্ডা লাগা প্রতিরোধ করা যায় না।

উ: ঠাণ্ডার ধাত থাকলে কয়েকটি নিয়ম মেনে চলুন।

(১) সকালে ঘুম থেকে উঠে খালিপায়ে হাঁটবেন না। স্লিপার ব্যবহার করুন।

(২) শীতকালে ভোরে বিছানা থেকে নেমেই দরজা, জানালা খুলে দেবেন না।

(৩) শীতকালে মুখ হাত ধোওয়ার পর চোখে মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দেবেন না। ঈষদোষ্ণ জল ব্যবহার করুন।

(৪) খালিপেটে এক কোয়া রসুন খান রোজ।

(৫) গরম থেকে এসেই কুলার চালিয়ে দেওয়া বা ঠাণ্ডা জল খাওয়া চলবে না। শরীরকে ধীরে ধীরে তাপমাত্রার পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হবে। যাঁদের চট করে ঠাণ্ডা লেগে যায় তাঁদের এ ব্যাপারে আরও সতর্ক থাকা দরকার।

প্রঃ অনেক সময় সমস্ত সাবধানতা মেনেও তো সমস্যা মেটেনা। শেষ পর্যন্ত অ্যান্টিবায়োটিক খেতে হয়।

উঃ বারবার সর্দি কাশি হতে থাকলে দেরি না করে ই এন টি বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত। কারণ সাধারণ হাঁচি কাশির পেছনে অন্য কোনও বড় কারণ থাকতে পারে।

প্রঃ কী কী কারণে এরকম হতে পারে?

উঃ ঘন ঘন সর্দি কাশি হওয়ার বড় কারণ অ্যালার্জি। একে বলে অ্যালার্জিক রাইনাইটিস, নাকের হাড় বাঁকা থাকলে, নাকে পলিপ থাকলে বা ক্রনিক সাইনোসাইটিস থাকলেও এরকম হতে পারে।

প্রঃ ক্রনিক সাইনোসাইটিস নাকি কখনও সারে না?

উঃ সাইনোসাইটিস নিয়ে প্রচুর ভুল ধারণা আছে। আর আছে অহেতুক ভয়। যত মানুষ সাইনোসাইটিস হয়েছে ভেবে ডাক্তারের কাছে আসেন সঠিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা যায় তাঁদের মধ্যে ৩০—৪০ শতাংশই কেবল এতে আক্রান্ত। রোগের কারণ জেনে সেই অনুযায়ী চিকিৎসা করলে অধিকাংশ সময় রোগ ভাল হয়ে যায়।

প্রঃ কী কী কারণে সাইনোসাইটিস হতে পারে?

উঃ সাইনোসাইটিস দু'ধরনের। তাৎক্ষণিক ও মেয়াদি। তাৎক্ষণিক সাইনোসাইটিস যথাযথ চিকিৎসার অভাবে মেয়াদি হয়ে পড়ে। সাইনোসাইটিসের সূত্রপাত হওয়ার পেছনে কয়েকটি ব্যাপারের বিশেষ ভূমিকা আছে। যেমন ধুলো ধোঁয়া বা স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশে থাকা, পানাপুকুরে স্নান করা, নস্যি নেওয়ার অভ্যেস বা ধূমপান থেকেও সাইনোসাইটিসের প্রকোপ বাড়তে পারে। দাঁতের কিছু অসুখ পুষে রাখলে, নাকের হাড় বাঁকা হলে (ডি এন এস) সাইনোসাইটিস হওয়ার আশঙ্কা থাকে। লিউকিমিয়া বা থ্যালাসিমিয়া রোগীদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে বলে অনেক সময় সাইনোসাইটিসে আক্রান্ত হন।

প্রঃ নাকের যে কোনও অসুখ থেকেই নাকি সাইনোসাইটিস হতে পারে?

উঃ সাইনাস অর্থাৎ বাতাসে ভর্তি ছোট ছোট ফাঁকা জায়গা ছড়িয়ে রয়েছে মুখের বিভিন্ন জায়গায়। নাকের দু'পাশে, পিছনে, কপালে, ভ্রূর মাঝখানে। নাকের মাধ্যমেই এদের মধ্যে বাতাস এলে পৌঁছয়। কাজেই নাকের যে কোনও অসুখ বিসুখ যেমন সংক্রমণ, টিউমার বা আঘাতে সাইনাসের উপর তার প্রভাব পড়ে। সাধারণভাবে সাইনোসাইটিস বলতে অবশ্য সংক্রমণজনিত কষ্টকেই বোঝায়।

প্রঃ কী করে বুঝব সাইনোসাইটিস হয়েছে?

উঃ নাক বন্ধ হয়ে থাকা, মাথা ব্যথা, নাক দিয়ে পাকা সর্দি বা কখনও রক্ত পড়া, গন্ধ কম পাওয়া ইত্যাদি নানান উপসর্গের এক বা একাধিক থাকতে পারে সাইনোসাইটিস হলে।

প্রঃ সাইনোসাইটিসের মাথা ব্যথা কি বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে?

উঃ ঘুম থেকে উঠেই মাথা ব্যথা শুরু হয়। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে। বিকেলের পর থেকে আবার কমতে শুরু করে।

প্রঃ স্টিম বাথ বা সনা বাথ নিলে সাইনোসাইটিসে উপকার হয়?

উঃ অবশ্যই আরাম হয়।

প্রঃ আর নাসাপান?

উঃ অর্থাৎ নাক দিয়ে জল টেনে গলা দিয়ে বার করা? কিছু ক্ষেত্রে করতে বলা হয়। তবে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া করা উচিত নয়। মূল কথা সাইনোসাইটিস হয়েছে জানতে পারলে প্রথমেই ই এন টি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া দরকার। এবং তিনি যেমন বলবেন তেমন ভাবে চলা উচিত। না হলে বিপদ হতে পারে।

প্রঃ কী বিপদ?

উঃ হঠাৎ করে নাক দিয়ে রক্ত পড়া শুরু হতে পারে। টনসিলাইটিস, কানে প্রদাহ, বুকে সংক্রমণ, এমনকি চোখে, মাথায় সংক্রমণ হয়ে অন্ধ হয়ে যাওয়া বা ব্রেন অ্যাবসেস থেকে মৃত্যুও হওয়া সম্ভব। যদিও আজকালকার দিনে এতটা বিপদ সচরাচর ঘটে না।

প্রঃ চিকিৎসা মানে সাইনাসগুলি ধুয়ে পরিষ্কার করা? সে তো একবার করলে বার বার করতে হয়।

উঃ সাইনোসাইটিস ধরা পড়লে প্রথমে কিছু ওষুধপত্র দেওয়া হয় এবং রোগের কারণ খুঁজে তার চিকিৎসা শুরু করা হয়। এর সঙ্গে মেনে চলতে হয় কিছু বিধি নিষেধও। এতে কাজ না হলে বা রোগ জটিল অবস্থায় থাকলে এন্ডোস্কোপিক সাইনাস সার্জারি দরকার পড়ে। এক্ষেত্রে নাকের মধ্যে দিয়ে ঢোকানো হয় টেলিস্কোপ লাগানো নল, তার পাশ দিয়ে অপারেশনের যন্ত্রপাতি। সাইনাসে জমা সর্দি, পুঁজ টেনে বার করার সঙ্গে সঙ্গে সাইনাসে ছোটখাটো মেরামতির কাজ এবং নাকের সঙ্গে সাইনাসের যোগাযোগকারী পথগুলিও ঠিক করা হয়। এই পদ্ধতিতে সাইনাস ধুয়ে দিলে ভবিষ্যতে আর অসুবিধে হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তবে নিয়মিত ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলা দরকার। ডি এন এস বা পলিপ থাকার জন্য যদি সাইনোসাইটিস হয় তার চিকিৎসাও কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে চলবে।

প্রঃ ডি এন এস আছে বোঝা যাবে কীভাবে?

উঃ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শ্বাস প্রশ্বাসের অসুবিধে দেখা দেয়। নাকের বদলে মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে হয়। ফ্যারিনজাইটিস, ল্যারিনজাইটিস, ব্রংকাইটিস ইত্যাদি নানান রোগের সূত্রপাত হতে পাবে। সাইনাস আক্রান্ত হয়ে সাইনোসাইটিসের যাবতীয় উপসর্গ দেখা দিতে শুরু করতে পারে। কণ্ঠস্বরে পরিবর্তন, গান গাইতে বা খেলতে গিয়ে দমের অভাব, ঘ্রাণশক্তি কমে যাওয়া ইত্যাদিও দেখা দেওয়া সম্ভব।

প্রঃ চিকিৎসা কী? অপারেশন?

উঃ হ্যাঁ। এই অপারেশনে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়।

প্রঃ আর পলিপ হলে? পলিপ নাকি কোনও চিকিৎসাতেই সারে না?

উঃ পলিপ দু'ধরনের হয়। অ্যান্ট্রোকোয়ানাল পলিপ এবং এথময়ডাল পলিপ। অ্যান্ট্রোকোয়ানাল পলিপ অপারেশন করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। কিছুটা অসুবিধে হয় এথময়ডাল পলিপের ক্ষেত্রে। এই পলিপ সংখ্যায় অনেক থাকে। ফলে অপারেশন

তুলনামূলকভাবে কঠিন। এবং অধিকাংশ সময় অ্যালার্জির দরূণ এই ধরনের পলিপের সৃষ্টি ফলে অপারেশনের পরেও অ্যালার্জির চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হয়। তবে অপারেশন অর্থাৎ এন্ডোস্কোপিক সার্জারি এবং অ্যালার্জির চিকিৎসা দুইয়েরই আজকাল প্রচুর উন্নতি হয়েছে।

প্র: নাক দিয়ে রক্ত পড়া মানে কি ডি এন এস বা সাইনোসাইটিস?

উ: আরও অনেক কারণে নাক দিয়ে রক্ত পড়তে পারে। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বেশির ভাগ সময় নাক খোটার ফলে রক্তবাহী শিরা উপশিরায় চোট লেগে রক্তপাত হয়। বড়দের বেলায় উচ্চ রক্তচাপ, বিভিন্ন রাসায়নিক কারখানায় অস্বাস্থ্যকর ধোয়ার প্রভাব, এমন কি ক্যান্সারের জন্যও রক্তপাত হওয়া সম্ভব। নাকের মাঝের হাড়ে চোট লেগেও অনেক সময় রক্তপাত হতে পারে।

প্র: আচমকা রক্ত পড়তে শুরু করলে কী করব?

উ: নাক দিয়ে রক্ত পড়তে শুরু করলে ভুলেও যেন শুয়ে পড়বেন না। দু'আঙুলে নাক চেপে ধরে মাথা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে বসতে হবে, নাকের ওপর বরফ চেপে ধরলেও উপকার প্াওয়া যাবে। বাচ্চাদের বেলায় অধিকাংশ সময় এতেই রক্তপড়া বন্ধ হয়ে যায়। না হলে ই এন টি বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

বাঁধানো দাঁত আলগা হয়ে গেলে সাবধান হবেন

ডাঃ সাধন চন্দ্র রায়

দূরভাষ : ২৪৪-৭৪৩৮

প্র: কইমাছ খেলেই গলায় কাঁটা বিঁধে যায়। কী করতে হবে?

উ: কইমাছ খাওয়া বন্ধ করে দিন।

প্র: কাঁটা লাগার ভয়ে মাছ খাওয়া বন্ধ করে দেব?

উ: ঠিকমতো বেছে যদি খেতে না পারেন তাহলে বন্ধ করা ছাড়া আর পথ কী? রোজ রোজ কাঁটা বেঁধা তো ভাল কথা নয়।

প্র: গলায় কাঁটা লাগলে বিপদ হতে পারে?

উ: হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে ভর্তি হওয়ার দরকার হতে পারে। অজ্ঞান করে বা ঘুম পাড়িয়ে জি আই এন্ডোস্কোপ বা ইসোফেগোস্কোপের সাহায্যে কাঁটা বার করতে হতে পারে। খাদ্যনালির দু'পাশে রয়েছে ফুসফুস। সেখানে আঘাত লাগলে বড়সড় ভোগান্তি হবে। আর শ্বাসনালিতে আটকালে তো গুরুতর পরিণতি।

প্র: কিন্তু অনেক সময় চেম্বারেই তো ই এন টি সার্জেন ফরসেপ দিয়ে কাঁটা বার করে দেন।

উ: হ্যাঁ, ছোট কাঁটা একদম গলার সামনে আটকে থাকলে সেটা সম্ভব।

প্র: কাঁটা তো অনেক সময় জল খেলেও নেমে যায়।

উ: বেশি আটকে না গেলে যেতে পারে। দু' এক গ্রাস শুকনো ভাত খেয়ে চেষ্টা করা যায়। তবে না গেলে আর চেষ্টা বা খোঁচাখুঁচি নয়। এতে কাঁটা আরও গভীরভাবে গেঁথে যেতে পারে বা ভেতরে গিয়ে আটকে যেতে পারে। আবার অনেক সময় কাঁটা নেমে গেলেও কাটাছেঁড়ার জন্য দু'এক দিন ব্যথা থাকতে পারে। যার ফলে মনে হতে পারে কাঁটা আটকে আছে।

প্র: বাঁধানো দাঁত থেকেও তো বিপদ হয় নানারকম।

উ: খুবই বিপদ হয়। একটা বা দুটো দাঁতের বাঁধানো সেট যদি একটু আলগা হয়ে যায় বা কোনও কোনা ক্ষয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে বদলে ফেলতে হবে নয়তো খাবারের সঙ্গে

বিশেষ করে আলগোছে জল খাওয়ার সময় গলায় চলে যেতে পারে। বাঁধানো দাঁত বার করবার সময় কেটেছড়ে বিপদ হতে পারে। ঢোকার সময়ও কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

প্র: ক'দিন আগে কাগজে পড়লাম ১০ মাসের বাচ্চার পেট থেকে খোলা সেফটিপিন বের করা হয়েছে। সেটাও তো তবে বেশ বিপজ্জনক ব্যাপার?

উ: বিপজ্জনক তো বটেই। খাওয়ার সময়, বের করবার সময়— যে কোনও সময় বিপদ ঘটতে পারত।

প্র: বাচ্চার ভাগ্য তবে খুব ভাল। তাই না?

উ: বাচ্চা, ডাক্তার সবারই ভাগ্য ভাল। ঘটনাটা যতদূর মনে পড়ছে সেফটিপিন খাদ্যনালি, পাকস্থলী পার হয়ে অন্ত্রে ঢোকার মুখে ডিওডেনামের প্রথম অংশে আটকে গিয়েছিল। আর একটু নেমে গেলে পেট কেটে বার করতে হত। অথবা খোলা পিনের আঘাতে পেটের বিভিন্ন অংশে কাটাছেঁড়া হতে পারত। যার ফল খুবই মারাত্মক।

প্র: কী রকম মারাত্মক?

উ: একটি মেয়ে একবার একটি সুচ গিলে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার বদলে ও চুপচাপ বসে ছিল ৩ দিন। যদি সুচ মলের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে যায়। শেষপর্যন্ত ও উপস্থিত হয় অ্যাকিউট পেরিটোনাইটিস অর্থাৎ জ্বর, পেট ফুলে যাওয়া, ব্যথা, বমি ইত্যাদি উপসর্গ নিয়ে। এক্সরে করে দেখা গেল সুচ পেটে আছে। কিন্তু পেরিটোনাইটিস থাকার দরুন ধরে নেওয়া হল সুচ রয়েছে পেরিটোনিয়ামে। সেইমতো অপারেশন করে বার করা হল সুচ। আর দু'চার দিন বসে থাকলে মেয়েটি কিন্তু মারাও যেতে পারত।

প্র: কেন এমন হল? পেটের মধ্যে কাটাছেঁড়া হওয়ার ফলে?

উ: খুলে বলি। পেরিটোনিয়াম হচ্ছে খুব পাতলা চামড়ার একটি থলে। তার ভেতরে রয়েছে পেটের যাবতীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। সুচ খাদ্যনালি পার হয়ে পাকস্থলীতে আসার পর হয়তো পাকস্থলীর কোনও অংশে বিঁধে যায়। বিঁধে আটকে থাকলে তক্ষুনি তক্ষুনি বিপদের সম্ভাবনা অত মারাত্মক ছিল না । কিন্তু এক আধদিন পার হয়ে যাওয়ার ফলে ওই অংশে সংক্রমণ দেখা দেয়। ফলে ফুটো বড় হতে থাকে। এই অবস্থায় সুচ পাকস্থলী বা পেরিটোনিয়াম যেখানেই থাকুক পেরিটোনাইটিস দেখা দেবে। কারণ ওই ফুটোর মধ্য দিয়ে গ্যাস্ট্রিক জুস, খাবার-দাবার সবই পৌঁছে যায় পেরিটোনিয়ামে। এক্ষেত্রে সুচটাও চলে গিয়েছিল।

প্র: তাহলে তো যে কোনও ধারালো জিনিসই পেটে গেলে ভয়ানক বিপদ।

উ: মুখে দেওয়া থেকে বিপদ শুরু। কাজেই সেফটিপিন, ব্লেড, সুচ, কানের দুল, নাকছাবি, বা এর থেকে কিছুটা কম বিপজ্জনক ছোট পয়সা, মার্বেল, ন্যাপথলিন ইত্যাদি বাচ্চাদের আয়ত্তের বাইরে রাখুন।

প্র: ছোট পয়সা বা মার্বেল কম বিপজ্জনক বলছেন কেন?

উ: ধারালো নয় বলে। তবে বিপদ তো আছেই। পেটে গেলে অনেক সময় স্টুলের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসে। শ্বাসনালিতে চলে গেলে প্রাণঘাতী।

প্রঃ কেন?

উঃ আমাদের শ্বাসনালি গলা থেকে সোজা নেমে বুকের কাছে এসে দু'ভাগে ভাগ হয়ে দুটো ফুসফুসে ঢুকে গেছে। মূল শ্বাসনালি অর্থাৎ গলা থেকে বুক পর্যন্ত শ্বাসনালির যে অংশ এর কোথাও যদি জিনিসটি খাপে খাপে আটকে যায় শ্বাস বন্ধ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হবে।

প্রঃ কী করে বোঝা যাবে জিনিসটি শ্বাসনালিতে গেছে না পাকস্থলীতে?

উঃ জিনিসটি যদি শ্বাসনালিতে আটকায় বাচ্চা খুব কাশতে থাকবে। কাশতে কাশতে বমিও করে দিতে পারে। শ্বাসকষ্ট হতে পারে। খাদ্যনালিতে আটকালে এরকম উপসর্গ হবে না। তবে কান্নাকাটি অস্থিরতা ইত্যাদি দেখে বোঝা যাবে, কোথাও একটা আটকে আছে। আর সরাসরি পাকস্থলীতে চলে গেলে, যদি সুচ বা পিনের খোঁচায় বেশি কেটে ছিঁড়ে না যায়, বাচ্চা মোটামুটি ঠাণ্ডাই থাকবে।

প্রঃ সে সময় মা বাবার কী করণীয়?

উঃ খোলা সেফটিপিন, আলপিন, সুচ বা অন্য কোনও ধারালো জিনিস খেয়ে ফেললে কিছু না করে সোজা নার্সিংহোম বা হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। অন্য কিছু খেলে প্রথমে বাচ্চার পা ধরে উল্টো করে ঝুলিয়ে দেবেন। বাচ্চাকে হাঁ করিয়ে টর্চ জ্বেলে দেখবেন গলায় কিছু আটকে আছে কিনা। যদি দেখেন বের করা যাবে আস্তে করে ধরে বের করে নেবেন। না পারলে দেরি না করে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। অনেকে নুন জল খাইয়ে বমি করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। এতে বিপদ হতে পারে। বিপদ হতে পারে পায়খানা হওয়ার ওষুধ খাওয়ালেও।

নাকে নস্যি দিয়ে যে নাকে জিনিসটা ঢুকেছে তার উল্টোদিকের নাক টিপে হাঁচান অনেকে। খুব সামনে থাকলে অনেক সময় বেরিয়ে যায়। বাচ্চার যদি শ্বাসকষ্ট হতে থাকে উল্টো করে পা ধরে ঝুলিয়ে দিয়ে পিঠে জোরে জোরে থাপ্পড় মারতে হবে। এতে অনেক সময় গলা দিয়ে জিনিসটা বেরিয়ে আসতে পারে। অথবা মুখে মুখ লাগিয়ে খুব জোরে বারবার ফুঁ দিলে কিছু উপকার হয়। তবে অবস্থা খারাপ দেখলে খুব তাড়াতাড়ি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার।

প্রঃ রাত্রে যদি ডাক্তার পাওয়া না যায় আর বাচ্চা যদি খুব ছটফট করে ঘুমের ওষুধ দেওয়া যাবে?

উঃ এক্সরে না করিয়ে কোনও ওষুধই দেওয়া যাবে না বাচ্চাকে। ঘুমের ওষুধ তো নয়ই। রাত্রে যদি ডাক্তার না পাওয়া যায় যে কোনও হাসপাতাল বা নার্সিংহোমের এমারজেন্সি বিভাগে নিয়ে যাবেন। এ কিন্তু জীবন মরণের প্রশ্ন।

প্রঃ ঘুমের ওষুধে কি আরও বিপদ বাড়বে?

উঃ নিশ্চয়ই। আগেই বলেছি শ্বাসনালিতে কোনও কিছু ঢুকলে সঙ্গে সঙ্গে কাশি শুরু হয়। কারণ শরীর চায় কেশে কেশে বিজাতীয় জিনিসটি শরীর থেকে বের করে দিতে। তা না পারলেও কাশি কিন্তু জিনিসটিকে বিপজ্জনক জায়গায় পৌঁছতে দেয় না। বাচ্চা ছটফট করছে দেখে ঘুমের ওষুধ দিলে এই 'কাফ-রিফ্লেক্স' বন্ধ হয়ে গিয়ে বাচ্চার

মৃত্যুও সম্ভব। খাদ্যনালিতে কিছু ঢুকলে অত বিপদ নেই। তবে এক্সরে না করে তো নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয় জিনিসটা ঠিক কোথায় আটকে আছে। তাই এক্সরে করার আগে ঘুমের ওষুধ দেওয়াই বারণ।

প্রঃ সব বিজাতীয় বস্তুই কি এক্সরেতে ধরা পড়ে?

উঃ না, বাদাম, মাছের কাঁটা, কাঠ বা প্লাস্টিকের খেলনার অংশ ইত্যাদি এক্সরেতে ধরা পড়ে না।

প্রঃ আপনি তো বললেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাসপাতাল বা নার্সিংহোমের এমারজেন্সিতে নিয়ে যেতে। কিন্তু সেখানেও তো অনেক সময় ফেলে রেখে দেওয়া হয়।

উঃ দেখুন ডাক্তারি শাস্ত্রে এমন অনেক নিয়ম আছে যা যিনি ডাক্তার নন তাঁর পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। কোন্ বিজাতীয় বস্তু বের করতে হবে, কোন্‌টা আপনা আপনি বেরিয়ে যাবে বা কখন কোন্ বিজাতীয় বস্তু কীভাবে বার করতে হবে, কখন অপেক্ষা করা যায়, কখন যায় না এসবই নির্ভর করে পরিস্থিতির ওপর। এবং যিনি চিকিৎসা করছেন তাঁর ওপর। সাধারণত এক্সরে করে যদি দেখা যায় সে রকম খারাপ জায়গায় নেই জিনিসটি বা এক্সরেতে দেখাই গেল না এবং বেশ কয়েকটি উপসর্গ রোগীর নেই, যেমন—

(১) পেটে কোনও ব্যথা নেই

(২) বমি হচ্ছে না

(৩) জ্বর নেই

(৪) কাশি বা শ্বাসকষ্ট নেই

(৫) পেট ফুলে যাচ্ছে না

(৬) কোনওরকম রক্তপাত অর্থাৎ কালো পায়খানা বা রক্তবমি অথবা থুথুর সঙ্গে রক্ত পড়ছে না, সে ক্ষেত্রে খানিকটা অপেক্ষা করলে বাচ্চার ক্ষতি হবে না।

ছানি পাকার আগেই অপারেশন করান

ডাঃ পার্থ বিশ্বাস

দূরভাষ : ২৪৭-৮০৮৩

প্রঃ আজকাল তো 'চক্ষু অপারেশন শিবিরে'র হিড়িক পড়ে গেছে। এরকম জায়গায় ছানি অপারেশন করানো কতটা নিরাপদ?

উ· যথেষ্ট নিরাপদ। এ সমস্ত ক্ষেত্রে যে খরচে এবং যে পরিবেশে অপারেশন করা হয় তার তুলনায় সাফল্যের হার যথেষ্ট ভাল।

প্রঃ কিন্তু কাগজে যে পড়ি ক্যাম্পে অপারেশন করিয়ে চোখ অন্ধ হয়ে গেছে?

উঃ হাজার জনের অপারেশন হলে তার মধ্যে একজনের এরকম হতে পারে। সে শুধু ক্যাম্প বলে নয়, যে কোনও জায়গাতেই হওয়া সম্ভব।

প্রঃ ক্যাম্পে তো বিভিন্ন পরিস্থিতির সঙ্গে আপস করতে হয়। তার কোনও প্রভাব পড়েনা?

উঃ প্রভাব বলতে সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা তো? দেখুন, কোন অপারেশনে সংক্রমণ হবে আর কোন অপারেশনে হবে না তা বহু বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যার অধিকাংশটাই আমাদের অজানা। জানা বিষয়গুলির কথা বলছি। প্রথম হল জীবাণুমুক্ত পরিবেশ, দ্বিতীয় সঠিক ওষুধপত্রেরর ব্যবহার। তৃতীয় এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ—যাঁর অপারেশন হচ্ছে তাঁর রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা। দেখা গেছে যাঁরা সহজ সরল ভাবে জীবন কাটান তাঁদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি থাকে। ক্যাম্পে এদের অপারেশনই বেশি হয়। ফলে সংক্রমণের সম্ভাবনা কম থাকে, অবশ্য যদি অপারেশন পরবর্তী সাবধানতা ঠিকভাবে মেনে চল' হয়।

প্রঃ অপারেশনের পর কী ধরনের সাবধানতা মেনে চলতে হবে?

উঃ চোখ না রগড়ানো, ঘুমনোর সময় চোখের উপর প্লাসটিকের ঢাকনা ব্যবহার করা, ভারী ওজন না তোলা, বেশি পরিশ্রমের কাজ বা সাঁতার এড়িয়ে চলা, ধূমপান না করা, অন্তত ৫ সপ্তাহ চোখের সব ধরনের মেক আপ বন্ধ রাখা, দু'এক সপ্তাহ যৌন জীবন যাপন না করা ইত্যাদি।

প্রঃ কী করে বোঝা যাবে চোখে ছানি পড়েছে?

উঃ রোগী চোখে কম দেখতে শুরু করবেন। চোখের সামনে কালো দাগ বা আলোর চারপাশে রামধনু রংয়ের দুটো তিনটে রেখাও দেখা যেতে পারে।

প্রঃ ছানি কখন অপারেশন করা দরকার? ছানি পাকা বলে কোনও কথা আছে কি?

উঃ চোখের মধ্যেকার স্বচ্ছ লেন্স অস্বচ্ছ হয়ে গেলে বলা হয় ছানি পেকেছে। আজকাল ছানি পাকা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় না। রোগীর সুবিধানুযায়ী সে কোনও সময়ই মাইক্রোসার্জারি করে ইন্ট্রা অকুলার লেন্স বা আই ও এল বসিয়ে দেওয়া হয়।

প্রঃ চোখের মাইক্রোসার্জারি ব্যাপারটা কী?

উঃ মাইক্রোস্কোপে দেখে লেন্সের অস্বচ্ছ অংশ কেটে বার করে নিয়ে তার পরিবর্তে কৃত্রিম লেন্স বা আই ও এল চোখের মধ্যে বসানো। আই ও এল এর সুবিধে হল এক্ষেত্রে রোগীকে মোটা কাচের চশমা পরতে অথবা কন্ট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার করতে হয় না। কখনও কখনও সামান্য পাওয়ারের চশমা ব্যবহার করতে হতে পারে।

প্রঃ কিন্তু আগে তো ছানি অপারেশনের পর মোটা কাচের চশমা পরতে হত।

উঃ মাইক্রোসার্জারি আসার আগে ছানি অপারেশনের পদ্ধতি ছিল আলাদা। চোখে লেন্স বসানো হতনা। ফলে অপারেশনের পর মোটা কাচের চশমা পরতে হত।

প্রঃ আগে ছানি অপারেশনের জন্য ছানি পাকা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হত কেন?

উঃ আগে আমরা খালি চোখে অপারেশন করতাম। বার করে আনতাম পুরো লেন্সটাকে। লেন্সকে চোখের মধ্যে ওপরে নীচে আটকে রাখে দুটি বিশেষ ধরনের তন্তু। ছানি পেকে গেলে সেগুলো কিছুটা আলগা হয়ে যায়। ফলে অপারেশন করতে সুবিধে হত।

প্রঃ মাইক্রোসার্জারিতে পুরো লেন্স বার করা হয় না?

উঃ না, লেন্সের বহিরাবরণ ঠিক রেখে ভেতরের অস্বচ্ছ অংশটুকু কেটে বার করা হয়।

প্রঃ সম্পূর্ণ লেন্স বার না করার ফলে পরবর্তী কালে কোনও অসুবিধে দেখা দিতে পারে কি ?

উঃ লেন্সের ক্যাপসুলটা রেখে দেওয়া হয় বলে কিছু ক্ষেত্রে সেখান থেকে নতুন কোষ জন্ম নিয়ে আই ও এল কে অস্বচ্ছ করে দিতে পারে। তবে তার সম্ভাবনা খুব কম। শতকরা ৫-১০ ভাগ ক্ষেত্রে এরকম হতে পারে। সেক্ষেত্রেও চিকিৎসা খুব কঠিন কিছু নয়। লেসার দিয়ে বেড়ে যাওয়া অংশটি কেটে বাদ দেওয়া যায়।

প্রঃ এর খরচ কী রকম?

উঃ ৬০০ টাকার মতো।

প্রঃ লেসারের সাহায্যে ছানি অপারেশন করা যায়?

উঃ এখনও পর্যন্ত যায় না।

প্রঃ ফ্যাকো ইমালসিফিকেশন পদ্ধতিতে ছানি অপারেশন করলে দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠা যায়?

উঃ হ্যাঁ, ৩-৭ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাওয়া যায়। কারণ ফ্যাকো তে কাটতে

হয়ে খুব কম। ৩-৫.৫ মিলিমিটারের মতো কেটে বিশেষ ধরনের শব্দ তরঙ্গের সাহায্যে ছানি কেটে সাকশন করে বার করে নেওয়া হয়। তারপর *সেখান দিয়েই ঢোকানো* হয় সাধারণ অথবা ফোল্ডেবল লেন্স।

প্রঃ এর খরচ কী রকম?

উঃ দু'চোখের জন্য প্রায় ১৬ থেকে ২০-২৫ হাজার টাকার মতো। সাধারণ লেন্স ব্যবহার করলে খরচ একটু কম হয়।

প্রঃ সাধারণ লেন্স বলতে?

উঃ আগেই বলেছি ফ্যাকোতে দু'ধরনের লেন্স ব্যবহার করা হয়। ফোল্ডেবল এবং সাধারণ। ফোল্ডেবল লেন্স আকারে বড় তবে প্রয়োজন মতো মুড়িয়ে ছোট করা যায়। সাধারণ ইন্ট্রাঅকুলার লেন্সকে এভাবে ভাঁজ করা যায় না।

প্রঃ ফোল্ডেবল লেন্সে কি বিশেষ কিছু সুবিধে পাওয়া যায়?

উঃ ফোল্ডেবল লেন্স ব্যবহার করলে কাটতে হয় খুব কম। ফলে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠা যায়।

প্রঃ কাটা বলতে তো ৩ বা ৫.৫ মিলিমিটার। এটুকু কম বেশিতে খুব অসুবিধে হয়?

উঃ মাইক্রোসার্জারির ক্ষেত্রে ৩ এবং ৫.৫ মিলিমিটারের মধ্যেও অনেক পার্থক্য।

প্রঃ ফ্যাকো পদ্ধতিতে ছানি অপারেশন করলে নাকি সেলাই করার দরকার পড়ে না?

উঃ না। এবং সেলাই পড়ে না বলে কতগুলো বিশেষ সুবিধে পাওয়া যায়। যেমন সাধারণ মাইক্রোসার্জারির পর চোখে সিলিনড্রিকাল পাওয়ার দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ডাক্তারি পরিভাষায় যাকে বলে অ্যাস্টিগম্যাটিজম। অনেকে এজন্য চোখে যে সেলাই পড়ে তাকে দায়ী করেন। ফ্যাকোতে যেহেতু সেলাই হয় না, এ সম্ভাবনা প্রায় নেইই।

প্রঃ ছানি অপারেশনের পর অনেক সময় গাড়ি চালাতে বা কম আলোয় চলাফেরা করতে গেলে চোখের সামনে আলোর বৃত্ত তৈরি হয়। ফ্যাকো করলে এই সমস্যার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে?

উঃ ফোল্ডেবল লেন্স ব্যবহার করে ফ্যাকো করলে এই অসুবিধে হয় না।

প্রঃ কিন্তু ফোল্ডেবল লেন্সের দাম তো অনেক বেশি?

উঃ হ্যাঁ, সাধারণ লেন্সের দাম যেখানে ৩০০-২০০০ টাকার মধ্যে, ফোল্ডেবল লেন্সের দাম শুরু হয় ২৫০০ টাকা থেকে। বিদেশি হলে ৪০০০-৫০০০ টাকার মতো।

প্রঃ মাইক্রোসার্জারিতে কী রকম খরচ?

উঃ ১৫০০-৫০০০ টাকার মধ্যে।

প্রঃ দামের এতখানি তারতম্য হওয়ার কারণ কী?

উঃ অপারেশন কোথায় হচ্ছে, কে করছেন এবং লেন্স দেশি না বিদেশি তার উপর খরচ নির্ভর করে।

প্রঃ দামি লেন্স ব্যবহার করে কি বিশেষ কিছু সুবিধে পাওয়া যায়?

উঃ তেমন কিছু নয়। তবে যাঁদের পয়সা আছে তাঁরা চান দামি এবং বিদেশি জিনিস ব্যবহার করতে।

প্রঃ আজকাল নাকি নতুন পদ্ধতির মাইক্রোসার্জারি বেড়িয়েছে যাতে খুব কম খরচে অপারেশন করা যায়?

উঃ স্মল ইনসিশন ক্যাটারাক্ট সার্জারি বা এস আই সি এসে খরচ বেশ কম এবং কিছুক্ষেত্রে এ প্রায় ফ্যাকোর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। যেমন এক্ষেত্রে চোখে লেন্স ঢোকানোর জন্য ৬-৭ মিলিমিটার কাটতে হলেও এমন পদ্ধতিতে কাটা হয় যে সেলাই করার দরকার হয় না। অতএব সিলিনড্রিকাল পাওয়ার দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

প্রঃ কোথায় কোথায় এই অপারেশনটি হয়?

উঃ যে কোনও জায়গায় করা যেতে পারে।

লিভারের সঙ্গে শ্বেতীর কোনও সম্পর্ক নেই

ডাঃ সুব্রত মালাকার

দূরভাষ : ৩৩৪-০৩০৮

প্র: প্লাস্টিকের চপ্পল পরলে অনেকেরই পায়ের যেই অংশটা সাদা হয়ে যায়। সেখান থেকে কি শ্বেতী হতে পারে?

উ: কিছু ক্ষেত্রে হতে পারে।

প্র: সিঁদুর, বিন্দি বা লিপস্টিক থেকে?

উ: সাধারণত হয় না। তবে এই সমস্ত জিনিস ব্যবহারের ফলে জায়গাটা সাদা হতে শুরু করলে সাবধান হওয়া দরকার। জিনিসগুলি ব্যবহার করা বন্ধ করতে হবে। এবং দাগ মিলিয়ে না গেলে চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

প্র: শ্বেতী কি বংশগত রোগ?

উ: অনেক সময় একই পরিবারে একাধিক জনের মধ্যে শ্বেতী দেখা যায়। এছাড়া পরিবারের কারোর যদি সোরিয়াসিস নামের চর্মরোগ, অ্যালোপেসিয়া এরিয়াটা অর্থাৎ বিশেষ ধরনের টাক বা থাইরয়েডের অসুখ থাকে শতকরা ২৫-৩০ ভাগ ক্ষেত্রে অন্যদের মধ্যে শ্বেতী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কাজেই কিছুক্ষেত্রে অন্তত শ্বেতী বংশানুক্রমে বাহিত।

প্র: শ্বেতী কি যে কোনও বয়সে হতে পারে?

উ: হ্যাঁ, তবে শ্বেতী নিয়ে কেউ জন্মায় না।

প্র: মানসিক অশান্তিতে ভুগলে শ্বেতীর প্রকোপ বাড়ে?

উ: অনেক সময় শ্বেতীর প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পায় মানসিক অশান্তি বা উদ্বেগ চলাকালীন। তবে অশান্তি উদ্বেগে ভুগলেই শ্বেতী হবে এমন নয়।

প্রঃ আর লিভার খারাপ হলে?

উঃ না, লিভারের সঙ্গে শ্বেতীর কোনও সম্পর্ক নেই।

প্রঃ শ্বেতী তবে হয় কেন?

উঃ শ্বেতী কেন হয় তা নিয়ে এখনও গবেষণা চলছে। নানান জনের নানান মত। তবে সবথেকে বেশি সংখ্যক গবেষক মনে করেন শ্বেতী একটি অটোইমিউন রোগ। অর্থাৎ যার মূল লুকিয়ে আছে নির্দিষ্ট মানুষটির মধ্যেই। খুলে বলি। প্রতিটি মানুষের শরীরে রয়েছে ইমিউন সিস্টেম বা রোগ প্রতিরোধী ব্যবস্থা। যার কাজ শরীরে এসে ঢোকা বিভিন্ন রোগ জীবাণুকে ধ্বংস করে শরীরকে সুস্থ রাখা। প্রতিরোধী ব্যবস্থা ভুলপথে চলে গেলে অটোইমিউন ডিজিজের সূত্রপাত হয়। এক্ষেত্রে সে রোগ জীবাণুর সঙ্গে সঙ্গে শরীরে দরকারি কিছু কোষকেও মারতে শুরু করে। মেলানোসাইট অর্থাৎ চামড়ায় রং তৈরি করা যে সমস্ত কোষের কাজ, তারা আক্রান্ত হলে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় রং তৈরি হওয়া বন্ধ হয়ে যায়। শ্বেতী দেখা দেয়।

প্রঃ শরীরে সাদা দাগ দেখা দেওয়া মানেই কি শ্বেতী?

উঃ না, শ্বেতীর কিছু বিশেষত্ব আছে। শ্বেতী হলে শরীরের সেই অংশের চামড়া দুধের মতো সাদা এবং মসৃণ হয়ে যায়। চুলও সাদা হয়ে যায় সেই অংশের। এর সঙ্গে চুলকুনি বা অন্য কোনও উপসর্গ থাকেনা।

প্রঃ শ্বেতী কি নানারকমের হয়? কারোর শরীরে দু'চারটে সাদা দাগ দেখা যায়, কারোর সম্পূর্ণ শরীর সাদা?

উঃ হ্যাঁ, শ্বেতীর রকমফের আছে। কখনও শরীরের বিভিন্ন অংশে এক বা একাধিক ছোট সাদা দাগের মাধ্যমে রোগের সূত্রপাত হয়। দাগগুলি আকারে বাড়তে থাকে। কখনও ধীরে। কখনও দ্রুত। কিছু ক্ষেত্রে এক সঙ্গে অনেকটা জায়গা আক্রান্ত হতে পারে। একে বলে এক্সটেনসিভ ভিটিলিগো। এই ধরনের শ্বেতী খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। লিপ-টিপ ভিটিলিগোতে আক্রান্ত হয় ঠোঁট এবং আঙুলের ডগা। কোনও নির্দিষ্ট স্নায়ুর গতিপথ বরাবরও শ্বেতী দেখা দিতে পারে। নাম সেগমেন্টাল ভিটিলিগো।

প্রঃ টক খেলে শ্বেতী বাড়ে?

উঃ শ্বেতীর সঙ্গে খাবার দাবারের কোনও সম্পর্ক নেই।

প্রঃ শ্বেতী হলে যে তবে সাদা জিনিস খেতে বারণ করা হয়?

উঃ বারণ করার কোনও কারণ নেই।

প্রঃ শ্বেতী সারে?

উঃ *এক্সটেনসিভ ভিটিলিগো ছাড়া অন্য সব ধরনের শ্বেতীর চিকিৎসায় খুব ভাল ফল পাওয়া যায়। সঠিকভাবে চিকিৎসা করালে অধিকাংশ সময় রোগ সম্পূর্ণ ভাল হয়ে* যায়। কিছু ক্ষেত্রে সারে না। তবে রোগের বাড়াবাড়ি ঠেকিয়ে রাখা যায়।

প্র: স্টেরয়েড দিয়ে?

উ: হ্যাঁ, কিছু ক্ষেত্রে স্টেরয়েড দিতে হয়।

প্র: এতে কোনও ক্ষতি হয় না শরীরের?

উ: স্টেরয়েড দেওয়া হয় রোগ খুব বেড়ে গেলে। তার আগে লাভ ক্ষতির হিসেব নিকেশ করে নেওয়া হয়।

প্র: শ্বেতী হলে রোদে বেরোনো নিষেধ?

উ: রোগ খুব বেড়ে গেলে অনেক সময় রোদ থেকে চামড়ায় অ্যালার্জি দেখা দিতে পারে। তখন ছাতা বা সানব্লক ক্রিম ব্যবহার করতে বলা হয়। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় শ্বেতীর চিকিৎসায় রোদের একটা ভূমিকা আছে। বিশেষ করে রোদের অতি বেগুনি রশ্মির। সোরালেন জাতীয় ওষুধ খাওয়ার দু'ঘণ্টা বাদে ১০-১৫ মিনিটের জন্য রোদে বসলে দ্রুত ভাল ফল পাওয়া যায়।

প্র: আজকাল নাকি অপারেশন করেও শ্বেতী ঠিক করে দেওয়া যাচ্ছে?

উ: বেশ কিছুদিন চিকিৎসা করার পর যদি দেখা যায় রোগ এক জায়গায় আটকে আছে, অন্তত ৬ মাস আর ছড়ায়নি, অপারেশনের কথা ভাবা হয়। তবে শ্বেতী অনেক ছড়িয়ে গেলে কিন্তু অপারেশন করে আর তেমন ভাল ফল পাওয়া যায় না।

প্র: অপারেশন মানে কি স্কিন গ্রাফটিং?

উ: নানারকম পদ্ধতি আছে। পাঞ্চ গ্রাফটিংয়ে প্রথমে শ্বেতীর উপর থেকে ছোট গোলাকার চামড়া কেটে ফেলে দেওয়া হয়। তারপর উরু বা হিপ থেকে কেটে নেওয়া ওই একই মাপের স্বাভাবিক চামড়া বসানো হয় সেখানে। পাশাপাশি বেশ কয়েকটি এরকম গ্রাফ্ট বসানো হয়। গ্রাফ্টগুলোকে ঘিরে ধীরে ধীরে রংয়ের বলয় তৈরি হতে শুরু করে। ৩-৬ মাসের মধ্যে জায়গাটা প্রায় স্বাভাবিক রংয়ে ছেয়ে যায়। থিন থিয়ারস গ্রাফটিংয়ে ডার্মাব্রেশনের সাহায্যে শ্বেতীর জায়গাটা প্রথমে ভাল করে ঘসে নেওয়া হয়। তারপর উরুর উপরের অংশ থেকে আলুর খোসার মতো করে পাতলা চামড়া তুলে শ্বেতীর জায়গায় টানটান করে বসিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া আছে ব্লিস্টার গ্রাফটিং। ব্লিস্টার গ্রাফটিংয়ে যে জায়গা থেকে চামড়া নেওয়া হবে সেখানে একটি বড়ইঞ্জেকশন সিরিঞ্জের পিছনের বৃত্তাকার দিকটি চেপে বসানো হয়। সিরিঞ্জের অন্য দিকটি জুড়ে দেওয়া হয় একটি সাকশন মেশিনের সঙ্গে। সাকশন মেশিনের চাপে চামড়ার উপরের অংশ বেলুনের মতো ফুলে ওঠে। সিরিঞ্জের পরিধির মাপে চামড়ার পাতলা অংশ কেটে রেখে দেওয়া হয়। তারপর ডার্মাব্রেশন করে শ্বেতীর উপরের চামড়া ঘসে তুলে ফেলে সেখানে কেটে রাখা চামড়া জুড়ে দেওয়া হয়।

প্র: স্কিন গ্রাফটিংয়ে তো অনেক সময় শরীর নতুন বসানো চামড়াকে মেনে নিতে পারে না। এখানে সেরকম কিছু হয় না?

উ: থিন থিয়ারস গ্রাফটের বেলায় কিছু ক্ষেত্রে এরকম হতে পারে।

প্রঃ ঠোঁটে শ্বেতী হলে দাগ মেলানোর জন্য নানারকম রং ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়?

উ: শুধু ঠোঁটে নয় যে কোনও ছোট শ্বেতীর দাগেই এভাবে রং ইঞ্জেকশন দেওয়ার পদ্ধতি চালু আছে। একে বলে মাইক্রোপিগমেণ্টেশন। গায়ের রং যাঁদের কালো তাঁদের ক্ষেত্রে এতে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়।

প্রঃ রং থেকে শরীরে কোনও ক্ষতি হয় না?

উ: না।

প্রঃ এই সমস্ত অপারেশন বা পদ্ধতি করাতে গেলে কি হাসপাতালে ভর্তি থাকতে হয়?

উ: না, অপারেশনের পরই রোগী বাড়ি চলে যেতে পারেন।

মুখ দিয়ে শ্বাস নিলেও দাঁতের গঠন খারাপ হতে পারে

ডাঃ অশোক সুরানা

দূরভাষ : ২৪৭-৮০৮৩

প্র: আপনারা নাকি হাসি সুন্দর করে দিতে পারেন?

উ: শুধু সুন্দর কেন, অপূর্ব সুন্দর করে দিতে পারি। সংজ্ঞানুযায়ী যেমন হওয়া উচিত ঠিক তেমনই।

প্র: হাসির আবার সংজ্ঞা আছে?

উ: নিশ্চয়ই।

প্র: কী রকম?

উ: এক এক করে বলি।

(১) হাসি হবে চওড়া। যত বেশি দাঁত দেখা যাবে হাসি হবে তত সুন্দর।

(২) মাড়ি দেখা যাবে না।

(৩) সুতোর মধ্যে মুক্তো গেঁথে দিলে যেমন হয়, দাঁতের সারি হবে ঠিক সেরকম।

(৪) পুরো চওড়া হাসি হাসলে অনেকের হাসির দু'প্রান্তে ঠোঁট এবং মুখের সংযোগে একটা করে কালো ত্রিভুজ তৈরি হয়— নেগেটিভ এরিয়া। এটা থাকা মানে হাসির দর পড়ে গেল।

প্র: যেমন মুখই হোক আপনারা এরকম হাসি করে দিতে পারেন?

উ: হাসিটা এরকম হয়ে যাওয়ার পর কিন্তু আর 'যেমন মুখ' ব্যাপারটা থাকবে না। কারণ নাক, দাঁত, চিবুক—এদের সৌন্দর্য একের অপরের ওপর নির্ভরশীল। হাসি মুক্তোর মতো হওয়া মানে নাকের নীচ থেকে চিবুক পর্যন্ত পুরোটাই সুন্দর হয়ে যাওয়া।

প্র: কারোর চিবুক উঁচু বা হাসলে মাড়ি বেরিয়ে যায়? কীভাবে সব ঠিক করবেন? কেটেছেঁটে?

উ: ১৮ বছর বয়স হয়ে গেলে কিছু ক্ষেত্রে কাটতে ছাঁটতে হবে। কিন্তু যখন ত্রুটিগুলো চোখে পড়ে অর্থাৎ ৭-৮ বছর বয়সে এলে কিছু পদ্ধতি করেই ঠিক করে দেওয়া যায়।

প্র: ৭-৮ বছর বয়স মানে তো দুধের দাঁতও পড়েনি। পরবর্তী কালে দাঁতের গঠন কীরকম হবে সেটা এই বয়সে বোঝা যায়।

উ: দুধের দাঁতের ওপর নজর না দেওয়াতেই পরবর্তী কালে অনেক সময় দাঁতের গঠন খারাপ হয়ে যায়। ডাক্তারের কাছে না গিয়ে নিজে নিজেই দাঁত ঠিক করতে চাইলে এই সময় থেকে সাবধান হওয়া দরকার।

প্র: কী রকম?

উ: খেয়াল রাখতে হবে দাঁত যেন অসময়ে পড়ে না যায়। দাঁত কোন্‌টা কখন পড়বে তার মোটামুটি একটা নিয়ম আছে। ৭ বছর বয়সে শুরু হয় দাঁত পড়া। প্রথমে পড়ে মুখের সামনের নীচেরটা। তারপর সামনের ওপরটা। নীচের ধারের দাঁতগুলো ৯ বছর নাগাদ পড়তে শুরু করে। সবচেয়ে শেষে পড়ে ওপরের ধারের দাঁতগুলি। ৯-১১ বছর বয়সের মধ্যে সব শেষ। ১২-১৮র মধ্যে সম্পূর্ণ হয় মোলার থেকে আক্কেল দাঁত ওঠা। সময়ের আগে যদি দাঁত পড়ে, প্রকৃতি সেই ফাঁকা জায়গাটা ভরাট করে দেওয়ার চেষ্টা করবে। ফলে নতুন দাঁত ওঠার সময় জায়গা না পেয়ে এঁকে বেঁকে উঠবে। আবার যদি সময়ের পরে পড়ে, ফাঁকা জায়গা নেই কিন্তু দাঁত উঠে আসছে। অতএব তাকেও আসতে হবে বাঁকা পথে। গজ দাঁতের সৃষ্টি এভাবেই হয়। দাঁত ওঠা পড়া ছাড়াও আরও কয়েকটি জিনিস খেয়াল রাখতে হবে। যেমন

(১) বাচ্চা আঙুল চোষে কিনা,

(২) মুখ দিয়ে শ্বাস নেয় কিনা,

(৩) নীচের চোয়াল মুখের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাড়ছে কিনা,

(৪) সাধারণ ভাবে মুখ বন্ধ করলে ওপরের দাঁতের পাটি নিচের দাঁতের ওপরে থাকে। যদি উল্টো হয় বা ওপরের অন্য অভ্যেসগুলির কোনও একটা বাচ্চার ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

প্র: অনেক সময় তো দুধের দাঁতে পোকা লাগে। তখন উঠিয়ে ফেলা ছাড়া আর কী রাস্তা আছে?

উ: বাচ্চা খুব কষ্ট পেলে ওঠাতে হতে পারে। তবে ফাঁকা জায়গায় পরবর্তী দাঁত যাতে সুষ্ঠুভাবে আসতে পারে সে জন্য স্পেস মেনটেনান্স ডিভাইস ব্যবহার করতে হবে।

প্র: ডিভাইস যদি বাচ্চার পেটে চলে যায়?

উ: পেটে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে ঝামেলা এড়াতে চাইলে বাচ্চাকে ঠিকভাবে দেখভাল করুন। এবং পেস্ট দিয়ে দিনে দু'বার সঠিক পদ্ধতিতে দাঁত মাজান। কোনও কিছু খাওয়ার পরই কুলকুচো করিয়ে মুখ ধুইয়ে দিন। বছরে একবার দাঁতের ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

প্র: না পড়লে কী করব?

উ: দাঁতের ডাক্তারের কাছে যাবেন। পাশ দিয়ে দাঁত উঠছে অথচ ওই দাঁতটা পড়ছে না এরকম হলে উনি দাঁতটা তুলে দেবেন।

প্র: আঙুল চুষলে কি মুখ সুঁচলো হয়ে যায়?

উ: ৫ বছর বয়স পর্যন্ত আঙুল চোষার অভ্যেসে কোনও ক্ষতি হয় না। তারপরও চুষলে

ক্ষতি শুরু হয়। ৭ বছর বয়সের পরও যারা চোষে তাদের ওপরের দাঁতের পাটির গঠন U এর বদলে V এর মতো হতে থাকে। ফলে মুখ সুঁচলো হতে শুরু করে।

প্র: আঙুল চোষার অভ্যেস বন্ধ করার জন্য আমরা আঙুলে লংকা বা তেতো লাগিয়ে দিই, এক্ষেত্রেও কি সেটাই করব?

উ: সে তো একদম কচি বাচ্চার ক্ষেত্রে কাজে আসে। ৬-৭ বছরের বাচ্চাকে এভাবে মানানো যাবে না। তাকে বোঝান প্রথমে। দেখতে খারাপ হয়ে যাবে, 'স' এর উচ্চারণ করতে গেলে সোজাসুজি উচ্চারণ না হয়ে 'শিস' আওয়াজের সঙ্গে হবে ইত্যাদি। কাজে না এলে অভ্যেস নষ্ট করার জন্য কিছু যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে।
প্রথম যন্ত্রটি ঘুমোনোর সময় মুখে পরিয়ে দেওয়া হয়। ঘুমের ঘোরে আঙুল ঢোকাতে গেলে কাঁটা বেঁধে হাতে। দ্বিতীয়টা আরও একটু কঠিন। দু'দিকের চোয়ালের সঙ্গে আটকে পুরো সেট করে দেওয়া হয়। মুখ বন্ধ করলেই পর্দা এসে পড়ে দাঁতের সামনে। আঙুল ঢোকানোই যায় না।

প্র: মুখ দিয়ে শ্বাস নিলেও দাঁতের গঠন খারাপ হয়ে যায়?

উ: হ্যাঁ, মুখ দিয়ে শ্বাস নেওয়ার অভ্যেস থাকলে মুখ হাঁ হয়ে থাকে। ফলে নীচের চোয়াল ধীরে ধীরে নীচের দিকে ঝুলতে থাকে। নাক থেকে চিবুকের দূরত্ব যে রকম থাকলে সুন্দর দেখায় দূরত্ব তার থেকে বেড়ে যায়।

প্র: এই অভ্যেস কী করে বন্ধ করা যাবে?

উ: দু'টো কারণে মানুষ মুখ দিয়ে শ্বাস নেয়—
(১) শ্বাস প্রশ্বাসের পথে কোনও বাঁধা থাকলে, যেমন অ্যাডেনয়েড গ্ল্যাণ্ড বড় থাকলে, নাকের মাঝখানের পর্দা বাঁকা হলে (ডি এন এস) ইত্যাদি।
(২) অভ্যেসের ফলে।
যদি দেখা যায় কোনও সমস্যা নেই, শুধুই বদভ্যাস, মুখে একটা পর্দা পরিয়ে দেওয়া হয়। তাহলে নাক দিয়ে শ্বাস নেওয়া ছাড়া আর পথ থাকে না।

প্র: নীচের চোয়াল কম বা বেশি বাড়লে শুনেছি 'গ্রোথ গাইডেন্স পদ্ধতি' খুব কাজে আসে।

উ: ঠিক সময়ে ধরতে পারলে অর্থাৎ ৮-৯ বছর বয়সে, খুব কাজে আসে গ্রোথ গাইডেন্স পদ্ধতিটি। কীভাবে করা হয় বলি একটু—

প্র: কিভাবে করা হয়?

উ: নীচের ঠোঁট আর চোয়াল যদি এগিয়ে থাকে ব্যবহার করা হয় ফেস মাস্ক। কপাল কান ঘিরে চিবুক বরাবর থাকে মুখোশের বেল্ট, কপালের অংশের নাম হেড গিয়ার। সেখান থেকে উপরের চোয়ালকে সামনের দিকে টেনে বাঁধা হয়। মাসে একবার ক্লিপ, তারের বাঁধন পরীক্ষা করে তাকে জোরদার করা হয়। বছর দুয়েক লাগে চিকিৎসার পর্যায় শেষ হতে।
কাজ করে বায়োনেটর। বায়োনেটর এমন ভাবে জিভের জায়গায় বসে থাকে যে কথা বলতে গেলে বা খাবার খাওয়ার সময় এগিয়ে আসে নীচের চোয়াল। অনবরত এরকম হওয়ার ফলে চোয়ালের বৃদ্ধির হার হয় দ্রুত। অবস্থা আয়ত্তে আসে মাস ৬-৭ মাসের মধ্যে।

উপরের চোয়াল এগোনো হলে হেড গিয়ারের সঙ্গে লাগানো ক্লিপ উপরের চোয়ালকে টানে পিছনে। আর সমস্যা নীচের চোয়ালে হলে, পরতে হয় চিন ক্যাপ।

প্রঃ মুখে দাঁত বেশি থাকলেও তো দেখতে খারাপ লাগে।

উঃ এক্ষেত্রে প্রথমে প্রয়োজনমতো দু'চারটে দাঁত তুলে নিয়ে বাকি গুলোকে ঠেলে ঠেলে জায়গামতো সাজানো হয়। ঠেলা এবং উঁচু নিচু দাঁতকে সমতলে আনার কাজটি করে কিছু বিশেষ ধরনের তারের ক্লিপ। দু'বছর ধরে চলে দেখাশোনার পর্ব। মাঝে মাঝে সেরে ওঠার রকম বুঝে বাঁধনের ধরন পাল্টাতে হয়। পদ্ধতির নাম লেবিয়াল টেকনিক। আজকাল এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এসেছে লিঙ্গুয়াল টেকনিক। এখানে বাঁধন থাকে দাঁতের নিচ বরাবর। উপর থেকে কিছু বোঝা যায় না। কিছুটা ব্যয়বহুল হলেও পদ্ধতিটি তাই জনপ্রিয় হয়েছে।